আশ্বিন, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রার্থনা

পরশুরাম

ওহে অনন্ত
বিশ্বে তোমার
মহাজগতের
অতি ছোট হয়ে
ভেবেছ এ ঘর
হায় হায় প্রভু,
অন্তর্যামী
কোনো মতে ঠাট
এই যে দেখিছ
দারুণ দৈন্য
কবে কোন্ যুগে
হজম হইয়া
হাজার বছর
নিজে হতে তুমি
ওহে হৃদিস্থ
জবরদস্তি

বিশাল বিপুল
না পাই নাগাল
বিরাট ধান্দা
ধরা দাও আজ
বেশ ত স্বাজানো
বুঝিলে না এ যে
আঁতের খবর
বজায় রেখেছি,
রোগা রোগা যত
লজ্জার চাপে
খেয়েছিনু মোরা
গেছে কোন্ কালে,
সবুর করিয়া
নাহি দিবে কভু
হৃষীকেশ, তাই
করিব আদায়

নিখিলের অধিপতি,
মোরা অতি মূঢ়মতি।
ছেড়ে বারেকের তরে
মোদের ক্ষুদ্র ঘরে।
কিসের অসদ্‌ভাব,
ভাড়া করা আস্‌বাব।
কিছুই জানিলে না কি ?
ভিতরে সকলি ফাঁকি।
অমৃতের সন্তান,
কণ্ঠে আগত প্রাণ।
দুই চার ফোঁটা সুধা,
পেয়েছে বিষম ক্ষুধা।
লভিয়াছি এই জ্ঞান—
ছাপ্পর-ফোঁড়া দান।
সকলে তোমার কাছে
যা কিছু অভাব আছে।

দশ বিশ কোটি নাছোড়বান্দা মোরা ছাড়িব না কভু,
তুমি যে একলা পড়িয়াছ ধরা, কোথায় পালাবে প্রভু ?
ওঠো নারায়ণ, জাগো জাগো ওহে অচেতন শালগ্রাম,
এ নয় তোমার ক্ষীরোদ-সিন্ধু, এ যে গরীবের ধাম।
ওহে দামোদর দশ বিশ কোটি টানিছে তোমার রশি,
ওঠো নারায়ণ, আজি যে তোমার উত্থান-একাদশী।

অল্পে তুষ্ট দস্যু আমরা, বেশি কিছু নাহি চাই,
অর্দ্ধরাজ্য, রাজার কন্যা— এ সবেতে রুচি নাই।
ইন্দ্রের পদ, কুবেরের ধন, স্বর্গের ভোগ যত
মুক্তি মোক্ষ নির্ব্বাণ আদি তোলা থাক আপাতত।
দেশে দেশে যাহা দিয়েছ দেদার তাই দাও আমাদের—
একটি কেবল ছোট খাটো বর, তাতেই হইবে ঢের।

খোলো হে শীঘ্র খোলো হে তোমার শক্তির ভাণ্ডার,
দাও হে মাথায় হৃদয়ে শক্তি বাহুতে শক্তি আর।
কর হে কোমল কুসুমের মত, তাতে আপত্তি নাই,
দরকার হলে বজ্রের মত কঠোরতা যেন পাই।
তৃণের চেয়েও কর হে সুনীচ, তরুর চেয়েও ধীর,
শত্রুর কাছে উঁচু যেন হয় হিমালয়-সম শির।
যত খুশি দাও ক্ষমা অহিংসা অন্তরে মোর ভরি,
একটি কেবল মনের বাসনা বলে রাখি হে শ্রীহরি—
দুর্জ্জন অরি এক চড় যদি লাগায় আমারে কভু,
তিন চড় তারে কসাইয়া দিব, মাপ কর মোরে প্রভু!
একটি কাণের বদলে তাহার দিব দুই কাণ কাটি,
একটি দাঁতের বদলে তাহার উপাড়িব দুই পাটি।
ইষ্টানিষ্ট না ভাবিব কভু, শত্রু করিব টীট—
ক্ষম অপরাধ ওহে গদাধর, আমি নরকের কীট।

এইটুকু বর লইয়া তোমায় আপাতত দিব ছুটি,
নিজ নিজ ঘর লব গোছাইয়া যত পারি মোটামুটি।
তার পরে যদি আসে হে সুদিন, আর যদি বেঁচে থাকি,
ভাল ভাল বর করিব আদায় যা কিছু রহিল বাকি—
মান-সম্ভ্রম, মোটা রোজগার, চারতলা পাকা বাড়ি,
লোক-লস্কর, রূপসী বণিতা, আট-সিলিণ্ডার গাড়ি।

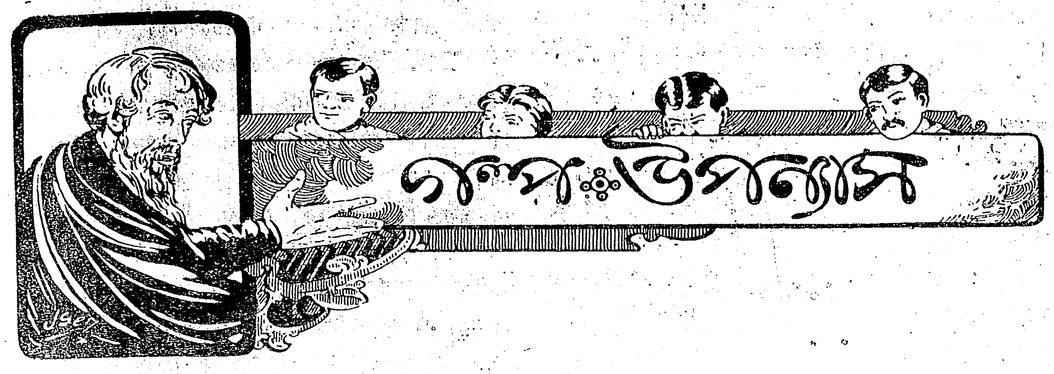

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২৪)

ময়মনসিংহ হইতে বিদায় হইয়া সৌরীন ঢাকা জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সেবাকার্য্য করিয়া বেড়াইল। তিন বৎসর এমনি করিয়া ঘুরিয়া সে এই সত্য নিবিড় ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল যে প্রচুর অর্থবল না থাকিলে কেবল নিষ্ঠার দ্বারা বিশেষ কিছুই কাজ করিতে পারিবে না। অর্থের জন্য সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিল—যাহা পাইল সে কিছুই নয়।

নিদারুণ হতাশায় সে স্থির করিল—এ ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সে আর জীবন ক্ষয় করিবে না। অবশিষ্ট জীবন সে লেখা-পড়া করিয়া কাটাইবে। বিদ্যার অনুশীলনে জীবনে যেটুকু সার্থকতা লাভ করা যায় তাই সে করিবে।

তাই সে ঢাকায় ফিরিল। চেষ্টা করিয়া গোটা দুই প্রাইভেট টুইশন জোগাড় করিল।

এমনি করিয়া সে ছয়মাস কাটাইয়া দিল। তার জীবনের দারুণ নৈরাশ্য তাহার দেহ ও মনে এমন একটা অবসন্নতা আনিয়া দিয়াছিল যে, সে কেবল চুপচাপ করিয়া দিন কাটাইয়াই গেল। তার যে বৃহৎ চিন্তা ও কল্পনার শক্তি ছিল, তার চিত্তের যে অসীম সহানুভূতি ও পরদুঃখ-কাতরতা ছিল তাহা যেন হঠাৎ শীতে-জমিয়া-যাওয়া পার্ব্বত্য প্রস্রবণের মত নিষ্ক্রিয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া রহিল। সে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ও নিরুপদ্রব ভাবে তার প্রাইভেট টিউটার-জীবন কাটাইয়া চলিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি লইয়া সে সেখানকার লাইব্রেরীতে পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে তার চিত্তের জড়তা কাটিয়া গেল, তার ভিতরকার চিরদিনের জ্ঞান-বুভুক্ষা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল। নানা বিষয়ের আলোচনায় সে তার প্রদীপ্ত কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

একদিন আমেরিকা হইতে প্রকাশিত একখানা ত্রৈ-মাসিক পত্র তার হাতে পড়িল। পত্রিকাখানি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক। তাহাতে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ ছিল—তাহা সে অনন্যমনা হইয়া পড়িয়া গেল। সে প্রবন্ধে লেখক সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ ও সমাজের অভ্যুদয়ে ব্যক্তির ও ব্যক্তির অভ্যুদয়ে সমাজের সহায়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি গোড়ায় বলিয়া লইয়াছেন যে, সমাজের এমন কোনও অনুষ্ঠানই নাই, যাহা চিরদিন অচল আছে বা অচল থাকিবে। সমাজের ও ব্যক্তির অভ্যুদয় সাধনই সকল অনুষ্ঠানের একমাত্র প্রয়োজন, এবং সেই মানদণ্ডে পরিমাণ

করিয়া নিয়ত সামাজিক অনুষ্ঠানের সংস্কার বা পরিবর্জ্জন করাটাই সামাজিক স্বাস্থ্যের নিদর্শন। এই মূল সূত্র ধরিয়া তিনি অর্থ, ভূস্বামিত্ব, শ্রেণী-বিভাগ, শাসন-প্রণালী প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য এই, সমাজের প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর সর্ব্ববিধ শক্তি বৃদ্ধি, এবং সুনিয়ন্ত্রিত সংযোগ দ্বারা তাহাদের সমবেত শক্তি বৃদ্ধি। যাহাতে ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে সমাজের সর্ব্ববিধ শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হয়, সেই ব্যবস্থাই একমাত্র অনুসরণীয়। যাহা সেই শক্তি সমবায়ের পক্ষে কম অনুকূল তাহা বর্জ্জনীয়।

এই প্রবন্ধে আমেরিকার সমাজ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছিল। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে সৌরীনের মনে হইল তার নিজের দেশের ও সমাজের কথা—মনে হইল আমরা কত দূরে কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি এই আদর্শ হইতে। আমাদের সমগ্র সমাজ-বন্ধন ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তির প্রতিকূল—শক্তি বৃদ্ধি নয়, শক্তি দমনই ইহার একমাত্র ফল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে তার কত কথা মনে হইল। কত দিক দিয়া সমাজের কত সংস্কার, কত অনুষ্ঠানের আমূল উৎপাটনের প্রয়োজন আছে; মানুষকে প্রথমে মানুষ করিবার জন্য একটা কত বড়-বিপুল চেষ্টার প্রয়োজন আছে, সে কথা মনে হইল।

তার পর তার এতদিনকার লুপ্ত জীবন ও চিন্তার ধারা আবার তার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। কি অসীম স্পর্দ্ধার সহিত সে তার জীবন নিবেদন করিয়াছিল সমাজের এই সেবায়, সে কথা মনে হইল। সে যে কত বড় ঘা খাইয়াছে, কত দুঃখে সে পথ ছাড়িয়াছে সে কথা তার এখন মনে হইল—মনে হইল, সে ভীরুর মত তার কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

মনে পড়িল কত বড় স্পর্দ্ধা, কি বিপুল শক্তি ছিল তার সেই পরিত্যক্ত স্বপ্নের ভিতর। তার জোরে সে সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিয়াছে। আপনার শক্তিতে অসীম শ্রদ্ধা লইয়া সে কোনও বাধাই গ্রাহ্য করে নাই, কোনও ত্যাগই ত্যাগ বলিয়া মনে করে নাই। মস্ত বড় চাকরী পাইয়া ছাড়িয়া আসিয়াছে—রেখাকে ছাড়িয়াছে!

রেখা!—রেখাকে হারাইয়া সৌরীন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়াছে। আর—বঞ্চিত রেখার সারা জীবন সে ছারখার করিয়া দিয়াছে। সে এতটা করিয়াছিল তার যে শক্তির স্পর্দ্ধায়, রেখাকে হারাইয়াও যে সেবাধর্ম্মের উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল—সে স্পর্দ্ধা এখন কোথায়, সে সেবাধর্ম্ম সে অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছে। ব্যথিত রেখা ভগ্ন হৃদয় লইয়া চলিয়া গিয়াছে—তার পর সে আর দেশে ফিরে নাই, সে সংবাদ সৌরীন জানিত। না জানি কি নিদারুণ পরিণতি তার হইয়াছে—কেবল সৌরীনের এই মিথ্যা স্পর্দ্ধার ফলে! আর সৌরীন কি না আজ তার সেই স্পর্দ্ধিত ধর্ম্ম অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া লাইব্রেরীর বই পড়িতেছে। ভাবিতে তার হৃদয় জ্বালায় পুড়িয়া গেল! অনুশোচনায় তার অন্তর ভরিয়া গেল। সে বার বার আপনাকে বলিল, "কোনও অধিকার নাই তোমার জীবনে একটু আরাম পাইবার। রেখার জীবনে যে অভিশাপ দিয়া তাকে বিদায় করিয়াছ, সে অভিশাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তোমার সেই বড়-স্পর্দ্ধার সেবা-ধর্ম্মের অনুশীলনে জীবন ত্যাগ করিয়া।"

এক মুহূর্ত্তও আর সে স্থির হইতে পারিল না। তক্তপোষের উপর শুইয়া সে ভাবিতেছিল—তার সে সুখ-শয্যা তার গায়ে যেন কাঁটা বিঁধাইয়া দিল। সে উঠিল। অবিলম্বে গিয়া তার চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া ছুটিল। ঢাকা সহর ত্যাগ করিয়া সে গেল একটা ক্ষুদ্র দীন পল্লীতে—সেইখানে একখানা পরিত্যক্ত চালায় সে আশ্রয় লইল। স্থির করিল, এইখানে বসিয়া, ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, ইহাদের মঙ্গল-চেষ্টায় সে জীবন ক্ষয় করিবে।

এ গ্রামটি ছোট্ট—ইহার বাসিন্দা সকলেই ঋষি বা মুচি। প্রায় ত্রিশ ঘর লোকের বাস এ গ্রামে। চার-পাঁচ ঘর অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, তাদের ভাল ঘর-বাড়ী আছে, দুই একখানা জমিও আছে, তা ছাড়া তারা চটি জুতা তৈয়ার করিয়া মহাজনদের কাছে জলের দরে বেচিয়া কথঞ্চিৎ উপায় করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সবাই নিতান্ত হীন দরিদ্র। ইহাদের পুরুষেরা মরসুমের সময় সস্তা চটি জুতা তৈয়ার করে, পূজা পার্ব্বণে বাজনা বাজায়, আর অবশিষ্ট সময় ভিক্ষা করে। মেয়েরা সবাই ভিক্ষা করে—কেউ বা তার উপর বন-জঙ্গল হইতে শাক-পাতা কুড়াইয়া বেচিয়া দুই পয়সা রোজগার করে। ইহাদের যে ঘর তার ভিতর

কোনও মতে কায়-ক্লেশে মাথা গুঁজিয়া থাকা যায়—কিন্তু ঝড়জলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় না।

সৌরীন দেখিল, সেবার যদি কারও প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাদের। ইহাদের সেবার জন্য কি প্রয়োজন, তাহা তাহার জানা ছিল,—তার অভাব ছিল শুধু সম্বলের। এ ছয় মাস প্রাইভেট টুইশন করিয়া তার হাতে প্রায় দুইশত টাকা জমিয়াছিল—সেই টাকা দিয়া সে কাজ আরম্ভ করিবে স্থির করিল।

গ্রামের ভিতর ঘুরিয়া সে সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিল। তার পর সে ছেলেদের লইয়া পাঠশালা করিয়া বসিল। পরের দিন গিয়া সে কিছু টাকার চামড়া কিনিয়া আনিল; এবং নিজের সামনে বসাইয়া, কতকটা নিজে শিখাইয়া, সে অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকদের দিয়া জুতা তৈয়ার করাইল। জুতা লইয়া সে নিজে ঢাকার বাজারে বেচিয়া কর্ম্মীদিগকে সমস্ত লাভের পয়সা দিয়া দিল। তারা অবাক্ হইয়া গেল। মহাজনের কাজ করিয়া তারা সারাদিনে বড় জোর তিন আনা পারিশ্রমিক পায়। সৌরীনের কাছে দুই দিনের পরিশ্রম করিয়া তারা পাইল প্রত্যেকে দেড় টাকা।

তখন সৌরীনের কাছে কাজ করিবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। কিন্তু এতগুলি লোককে চামড়া হাতিয়ার প্রভৃতি জোগাইয়া কাজ করান তার পক্ষে সম্ভব হইল না। তাই সে যে কয়জনকে পারিল কাজে লাগাইল, বাকী লোককে আশা দিয়া রাখিল; ছয় মাসের মধ্যে সে তাহাদিগকে কাজে ভর্ত্তি করিয়া লইবে। সেজন্য সে লাভের টাকা হইতে কিছু কিছু টাকা কাটিয়া মজুত করিতে লাগিল, এবং ক্রমে কারখানা প্রসারিত করিতে লাগিল।

গ্রামের মেয়েদের জন্য সে একটা কাজ স্থির করিল, ধান ভানা ও ডাল ভাঙ্গা। সে কিছু ধান ও ছোলামটর কিনিয়া মজুত করিল; এবং বহু কষ্টে অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়া মেয়েদের সেই কাজ করিতে নিযুক্ত করিল। এ কাজ তত সহজ হইল না; কেন না, ভিক্ষা করিয়া করিয়া ইহাদের স্বভাব বিগড়াইয়া গিয়াছিল—খাটিয়া খাইতে ইহারা বড় নারাজ। দশ বাড়ী ঘুরিয়া তারা যতই ঝাঁটা-লাথি খাক, খাবারটা মোটের উপর সংগ্রহ করে। আর তার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘোরা ছাড়া অন্য পরিশ্রম তাদের করিতে হয় না। তাই তারা কাজে পরাঙ্মুখ। তবু অনেক ধরিয়া পাড়িয়া সৌরীন তাদের দিয়া কাজ করাইতে লাগিল—কিন্তু এ কাজে সে বেশী লাভ পাইল না।

তবু জুতার কাজে এমন প্রচুর লাভ হইতে লাগিল যে, ছয় মাসের মধ্যে গ্রামের চেহারা ফিরিয়া গেল। তখন সৌরীন ইহাদিগকে চামড়া পাকাইবার বিলাতী প্রণালী (Chrome tanning) শিখাইবার উদ্যোগ করিয়া লইল। তার পাঠশালার তিন চারিটি ছাত্রকে সে এ কাজ শিখাইল। ভেড়ীর চামড়া পাকাইয়া তারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল।

সৌরীনের কার্য্যের এই সফলতায় মহাজনের দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ গ্রামের কারিগরদের মহাজনেরা ছিল জুতার কারবারী। তাহারা ইহাদের দিয়া সস্তা বাজে চটীজুতা জলের দরে তৈয়ারী করাইয়া লইত। সেজন্য তারা টাকা অগ্রিম দিত। কথা থাকিত এই যে, ক্রমে ক্রমে কাজ করিয়া মুচিরা টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু কাজের পারিশ্রমিক তারা এত কম পায় যে, তাতে উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া আর তাদের ধার শোধ করিবার উপায় থাকে না। তাই মহাজনের দেনা যেমন তেমনি থাকে—তারা কেবল খাটিয়া খাটিয়া বড় জোর সুদ পরিশোধ করে। ইহাতে মহাজনদের তাদের উপর আধিপত্যের অন্ত নাই—তারা জলের দরে মাল নেয় এবং লাভ করে।

সৌরীনের কাছে সব কারিগর কাজ করিতে আসিলে এই মহাজনদের সমূহ ক্ষতি। তাই তারা কারিগরদের উপর ধমকাধমকি ও নানারকম অত্যাচার করিতে লাগিল। যে দেনা পরিশোধের জন্য তারা কোনও দিন কোনও চেষ্টা করে নাই এবং যার কোনও হিসাব কিতাব এ গরীব মূর্খ খাতকের কাছে ছিল না, সেই দেনা পরিশোধের জন্য তারা জোর তাগাদা লাগাইতে লাগিল; এবং আইন-আদালতের কোনও উপদ্রব না করিয়া, নিজের ইচ্ছামত যার কাছে যাহা পাইল, ঋণের ওজুহাতে কাড়িয়া লইতে লাগিল।

সৌরীনের এইবার কারখানা ফেলিয়া এই লোকগুলির সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করিতে হইল। সে ইহাদের পক্ষে আদালতে কয়েকটা নালিশ করাইল, এবং তার তদ্বির করিতে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল। মহাজনেরা তাহাকে

খুন করিবার ভয় দেখাইল, সে পুলিশে এতেলা দিয়া দুই চার নম্বর ফৌজদারী মামলা করিল। তাহাতে মহাজনেরা কতকটা কাবু হইয়া তাহাকে ঘাঁটান ছাড়িয়া দিল।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে সৌরীন কাজ করিতে লাগিল। নিজে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে থাকিয়া সে ইহাদের পেটে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিল। আর দিন রাত সে আপনাকে ইহাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিল।

তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সৌরীন যখন তার কাজকর্ম্ম প্রায় অনেকটা গুছাইয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোকের ভিতর কয়েকটি কাজের লোক গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই সময় সে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। গ্রামবাসিগণ তাহাকে হাঁসপাতালে পৌঁছাইয়া আসিল।

(২৫)

দীর্ঘকাল কষ্ট সহিয়া সৌরীনের শরীর একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, জীবনী-শক্তি একেবারে নিভিবার মত হইয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল সে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে হাঁসপাতালে পড়িয়া রহিল। তাহার সৌভাগ্যক্রমে তার ব্যাধি ছিল উৎকট এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। একটা নূতন এবং বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক রোগী বলিয়া হাঁসপাতালের একাধিক চিকিৎসক বিশেষ যত্ন ও একাগ্রতার সহিত তার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ছয়মাস চিকিৎসার পর সে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ সাব্যস্ত হইল, কিন্তু তখনও তার উঠিয়া যাইবার শক্তি ছিল না বলিয়া তাহাকে হাঁসপাতালেই রাখা হইল।

ডাক্তারেরা তাহাকে পড়িবার জন্য বই ও সংবাদপত্র দিতেন; সৌরীন শুইয়া শুইয়া তাই পড়িত। এক দিন পড়িতে পড়িতে সে ময়মনসিংহ সৌরীন্দ্র আশ্রমের বার্ষিক সভার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িল। যাহা পড়িল, তাহাতে ব্যাপারটা সম্যক বুঝা গেল না; কিন্তু ইহা যে একটা লোকসেবার অনুষ্ঠান এবং ইহার প্রধান কার্য্য যে গ্রামের শ্রমজীবীদের দ্বারা কুটীর-শিল্পের সমৃদ্ধি-সাধন, তাহা সে বুঝিতে পারিল। ইহার নামটাই তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিল। "সৌরীন্দ্র আশ্রম!" সে তো তার নিজের আশ্রম বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পর কি তার কোনও শিষ্য তার নামে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কাজ করিতেছে? সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে তার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ও সার্থকতার ভাব জাগিয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যখন সৌরীন হাঁসপাতাল হইতে ছুটি পাইল, সে তখন তার কর্ম্মস্থানে না ফিরিয়া একেবারে ময়মনসিংহে গিয়া উপস্থিত হইল। এই সৌরীন্দ্র-আশ্রম দেখিবার উৎসাহে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

পথে রেলে ময়মনসিংহবাসী একটি লোকের কাছে সৌরীন্দ্র আশ্রমের সম্বন্ধে সে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাইল। এ আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সদুত্তর সে পাইল না। কিন্তু আশ্রমের প্রধান কর্ম্মীদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কয়েকটি পুরুষ কর্ম্মীর নাম শুনিল; আরও শুনিল, ময়মনসিংহ বালিকা-বিদ্যালয়ের কয়েকটি শিক্ষয়িত্রীও ইহার মধ্যে আছেন। সৌরীন্দ্র-আশ্রম নাম কেন হইল, তাহাও সে লোকটি বলিতে পারিল না। এই লোকটির কাছে সৌরীন আশ্রমের আফিসের ঠিকানা জানিয়া, সোজা সেখানে উপস্থিত হইল।

আফিসে প্রবেশ করিয়া সে একজন কর্ম্মীর কাছে অনুরোধ করিয়া আশ্রমের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী সংগ্রহ করিল। তার ভিতর দেখিতে পাইল এ আশ্রমের ইতিহাস, —দেখিল, তার নিজের কীর্ত্তির কথা বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। আর দেখিল, এ আশ্রম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় একজনের উদ্যোগে ও অর্থে—সে রেখা সান্যাল। এবং রেখাই ইহার প্রধান কর্ম্মী।

আনন্দে সৌরীন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রেখা—তার রেখা আসিয়া তার জীবনের সব নিষ্ফলতা ধুইয়া ফেলিয়া তার কার্য্য এমন গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে! এ "সৌরীন্দ্র আশ্রম" রেখার অলোকসামান্য প্রেমের মূর্ত্তি—তার লোকাতীত প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষমতার পরিচয়! সৌরীনের মনে হইল, এই রেখাকেই সে তার সেবা-কার্য্যের অন্তরায় বলিয়া—একটা বোঝা বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল! দর্পহারী ভগবান তার সে বিপুল স্পর্দ্ধার কি মনোরম শাস্তি দিয়াছেন! সে তার স্পর্দ্ধা ও শক্তি লইয়া যে কাজে পাইয়াছিল সুধু নিষ্ফলতা ও লাঞ্ছনা, রেখা তার প্রেম, নিষ্ঠা ও পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তির দ্বারা সেখানে লাভ করিয়াছে অশেষ গৌরব, অসামান্য সফলতা। এ যেন সৌরীনের স্পর্দ্ধার মুখে খাড়া চাবুক! কিন্তু কি মিষ্টি এ চাবুক—কি

সুমধুর করুণাময় এ শাস্তি! এ শাস্তি পাইয়া ও ইহার স্বরূপ অনুভব করিয়া সৌরীনের হৃদয় অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও পুলকে ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণ সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্গদ ভাবে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। চিরদিনকার তার প্রেমসাগর তার অন্তরের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল;—রেখার গৌরব, রেখার মাধুর্য্য, রেখার প্রেম সে তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতে লাগিল।

তার বড় ইচ্ছা হইল, রেখার সঙ্গে সে দেখা করিবে। কিন্তু ভয়ানক সঙ্কোচ আসিয়া তার হাত-পা চাপিয়া ধরিল। সে তার দীন বেশের দিকে চাহিল,—স্মরণ করিল যে, সে এখন রেখাকে লাভ করিবার যোগ্য নয়; কোনও দিনই হয় তো ছিল না—আজ ত মোটেই নয়। এক-দিন মোহে অন্ধ হইয়া সে আপনাকে রেখার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া রেখাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও করিয়াছিল! কিন্তু আজ তার সে স্পর্দ্ধা একেবারে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে,—সে আজ বুঝিয়াছে রেখা দেবী, রেখা মহীয়সী—তার পদনখের যোগ্য সে নয়। তাই তার কাছে যাইতে তার সাহস হইল না। তবু তাকে একবার দেখিবার —তার পায়ে একবার লুটাইয়া পড়িয়া তার পূজা নিবেদন করিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার হইল। যে সৌরীনকে রেখা ভালবাসিয়াছিল সে নাই—আছে এক দীন ভিখারী —অকর্ম্মণ্য নিষ্ফলতামণ্ডিত এক দরিদ্র, নিঃসম্বল, আশাহীন, উৎসাহহীন সামান্য ব্যক্তি। রেখা কি তাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে,—চিনিতে পারিলেও কি তার দিকে ফিরিয়া চাহিবে, কথা কহিবে?

অনেকক্ষণ দ্বিধার পর সৌরীন রেখার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা স্থির করিল। আফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিল রেখার সঙ্গে সাক্ষাতে কারও বাধা নাই,—উপরে তার বসিবার ঘরে সকলের অবারিত-দ্বার—বিশেষতঃ দীন দরিদ্রের।

সে উঠিয়া গেল। দ্বারের সামনে আসিয়া দ্বিধায় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল "আমি আস্‌তে পারি?"

যখন রেখা ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তখন সৌরীনের চিত্ত দারুণ আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। রেখা এখন তাকে দেখিয়া ঘৃণা করিবে কি? অবহেলার সঙ্গে তাকে দুয়ার হইতে ফিরাইয়া দিবে;—ভক্ত সেবক দেবীর পদপ্রান্তে আসিয়াও কি পূজা নিবেদন করিতে পারিবে না?

হৃদয়ের সমুদায় শক্তি সংহত করিয়া সৌরীন সুধু একবার ডাকিল "রেখা।"

এক মুহূর্ত্তমাত্র রেখা সংশয়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রথম ডাক শুনিয়াই সে সৌরীনের কণ্ঠ বলিয়া চিনিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল;—কিন্তু এ মূর্ত্তি দেখিয়া সংশয়-স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ ডাকের পর আর সংশয় রহিল না।

উত্তেজিত কণ্ঠে রেখা বলিল; "এসেছ! তুমি এসেছ!"

সে ছুটিয়া সৌরীনের কাছে অগ্রসর হইয়া তার পদপ্রান্তে অচেতন হইয়া পড়িল।

* * * *

রাত্রে রেখার জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তাকে বিছানায় শোয়াইয়া সৌরীন তার শুশ্রূষা করিতেছিল। ডাক্তার পাশের ঘরে বসিয়া ছিলেন।

জানালা দিয়া শারদ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রেখার পাণ্ডুর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

রেখা চক্ষু মেলিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিল। সৌরীন তার মুখের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল।

রেখা ধীরে ধীরে হাত তুলিয়া সৌরীনের একখানা হাত লইয়া বুকের উপর রাখিল। অনেকক্ষণ সে চক্ষু বুজিয়া হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া রহিল, ক্রমে তার দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল।

সৌরীনের চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। সে পরম স্নেহে তার দুই চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "কেঁদ না রেখা, লক্ষ্মী আমার, আমাকে ক্ষমা কর।"

রেখা বলিল, "বল তুমি আর যাবে না?"

সৌরীন বলিল, "কোথায় যাব রেখা? অনেক বিপথে ঘুরে পথভ্রান্ত পথিক তার শাশ্বত আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। কোথায় যাব?"

"দেখ, আমি বাঁচবো তো? আমার বড় বাঁচবার সাধ হচ্ছে এখন।"

"কোনও চিন্তা নেই রেখা। তোমার কিছুই হয় নি; হয়েছে সুধু অবসাদ। তুমি কালই সেরে উঠবে।"

রেখা সৌরীনের হাতখান আরও চাপিয়া বুকের ভিতর ধরিয়া সুধু বলিল "আঃ!"

তার পর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। না? ঠিক চকোর-চকোরীর মিলনের দিন।"

সৌরীন বলিল, "তফাৎ এই যে, এ মিলন আমাদের আর ভাঙ্গবে না। আজ আরম্ভ হ'ল আমার জীবনের চিরপূর্ণিমা, তুমি তাঁর ক্ষয়হীন পূর্ণচন্দ্র—রেখা!"

সৌরীন রেখাকে চুম্বন করিল, অপূর্ব্ব সার্থকতার আনন্দে রেখার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সৌরীনের মাথাটা বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল।

* * *

নিত্যরঞ্জন সেই দিন সন্ধ্যায়ই ময়মনসিংহ ছাড়িয়া গেল।

সমাপ্ত

উড়ো চিঠি

শ্রীঅনুরূপা দেবী

১

অমিয়াবালা রায় ইন্দ্রনাথ রায়ের বড় মেয়ে—এবৎসর আই-এ পরীক্ষায় ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করায় ছাত্রমহলে বেশ একটুখানি আন্দোলন চলিতেছিল। মেয়েটী কোন স্কুলের ছাত্রী নয়, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া দুই দুই বারই শত সহস্র ছাত্রদলকে পরাভব করিতে পারিয়াছে,—এজন্য কেহ কেহ তাহার বাহাদুরীকে তারিফ দিতেছিল, আবার অনেক অপমানিত-চিত্ত এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করিয়া মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছিল যে, প্রাইভেট পড়ান হইলে তাহারাও অমন সাতবার করিয়া ফার্ষ্ট হইতে পারিত। স্কুলে কলেজে কি আর ভাল করিয়া পড়ান হয়? আর মেয়েরা যখন বিদ্যা শিক্ষা করে, তখন তাহারা পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ককে ঘুচাইয়া ফেলে; ছেলেদের বেলায় তো আর সেটী হয় না! মায়ের 'সেড' মিলাইয়া উল কেনা, বাবার টেবিল ঝাড়িয়া রাখা, ছোট ভাইয়ের পেন্‌সিল কাটিয়া দেওয়া, এমনধারা কত কাজই তাদের ঘাড়ে পড়ে। মেয়েদের কেহ কিছু বলুক দেখি, অম্‌নি তারা ফোঁস করিয়া উঠিবে, কারণ তারা নতুন কিছু করিবে, পাশ দিবে—ছেলেদের মতন তো আর মেয়েদের পাশ দেওয়াটা পুরাতন হইয়া যায় নাই!

কিন্তু আসলে অমিয়ার পড়া-শোনা অত নির্ব্বিবাদে ঘটিতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ রায় পূর্ব্ববঙ্গের লোক। পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা পশ্চিমবঙ্গীয়দিগের অপেক্ষা অনেকখানি বেশি আধুনিক হইলেও ইন্দ্রনাথের মধ্যে একালত্বের গণ্ডী খুব বেশি শিথিল ছিল না। মেয়েরা গায়ে সেমিজ ব্লাউস পরিবে, কতকটা লেখা পড়া শিখিবে, আর হাড় ভাঙ্গিয়া ঘর-সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিবে, এই রকমই তাঁর মতটা ছিল। লেখা পড়া যেটা শিখিবে, সেটার সবটুকু সুযোগই কিন্তু তার সংসারকে দেওয়া চাই। অর্থাৎ বাজারের, দুধের ও ধোপার হিসাবের জন্য অঙ্ক শেখা, ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট মাষ্টারের পয়সা বাঁচানোর জন্য পড়াশুনা। বই বা খবরের কাগজ বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকা বুকে তুলিয়া চার-চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া থাকা তাঁর দুটী চক্ষের বিষ! স্ত্রী উমাশশীকে এজন্য অনেকবারই তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। অবশেষে বাংলা সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতির প্রবেশ নিষেধ করিয়া প্রকাশ্য কলহটা বন্ধ হইয়াছে, তবে প্রতিবেশীর ঘর হইতে গোপনে গোপনে ওসব জিনিষের আমদানী একেবারেই ছিল না তা অবশ্য বলা যায় না।—তবে কথা এই যে, চোরাই মাল লোকে চুরি করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে।

মেয়ে যখন বড় হইতে লাগিল, মায়ের কাছেই তার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। যোগ-বিয়োগ গুণ শিখিয়া মেয়ে ভাগ শিখিতে চাহিলে মা বলিলেন "ভাগ শিখে কি করবি? ও কোন কাজে লাগে না, আমি জানতুম ভুলে গেছি। তার চেয়ে এইবার শেলাই শেখ যে টেঁপি, মিনু, খুকি এদের ছেঁড়া-খোঁড়াগুলো জুড়ে-তেড়ে দিবি, ফ্রকগুলো সেমিজগুলো করতে পারবি—আমার একটু উপকার হবে।"

অমিয়া বলিল—"তা আমি শিখ্‌ছি, কিন্তু অঙ্ক আমায় আরও শেখাতে হবে। আমায় বড় ভাল লাগে।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"অঙ্ক ভাল লাগে! বলিস কি রে! ভালা পড়া-পাগলা মেয়ে তুই!"

কর্ত্তাকে বলিলেন—"অমাই আরও বেশি পড়তে চায়, ওকে ইস্কুলে দাও না।"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ইস্কুল! ইস্কুলে দিলে মেয়েটার কাঁচা মাথাটী যে কামড়িয়ে খাওয়া হয়ে যাবে, তার কি? ইস্কুলে দিয়েছ কি মেয়েটী গ্যাছে!"

উমাশশী কহিলেন—"কেন গা! এই যে রাজ্যি-শুদ্ধ লোকের মেয়ে ইস্কুলে যাচ্চে, এরা সবাই কি বিগড়ে গ্যাছে? না তোমারই মেয়ে এত মন্দ যে সে ইস্কুলে গেলে অম্‌নি খারাপ হয়ে যাবে!"

ইন্দ্রনাথ রায় পৃথিবীতে যে সকল বিষয়কে অসহ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তাহার ভিতর প্রধানতম অসহনীয় ব্যাপার মেয়েমানুষের মুখের তর্ক! তিনি ঈষৎ বিরক্তির স্বরে উত্তর করিলেন—"তার্কিক তো খুব হয়ে পড়েছ দেখছি! ওসব মেয়ে যে বেপ্‌ড়াবে না, নিজেদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করে স্ফূর্ত্তির জীবনকে আদর্শ করবে না, সাফ্রিগেট হবে না—তার কিছু গ্যারাণ্টি পেয়েছ বলতে পার?"

বাস্তবিকই তো আর উমাশশী সে বিষয়ে কোন গ্যারাণ্টি পান নাই, কাজেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

কিন্তু যেটা ঘটিয়া উঠিবার সেটা যেমন করিয়াই হউক কোথা দিয়া না কোথা দিয়া ঘটিয়া উঠে।

ইন্দ্রনাথ ঘোড়া হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিলেন ও সেই পায়ের খাতিরে পূরা ছয় মাসের ছুটী লইতে হইল। দিন রাত বিছানায় পড়িয়া সবারই সঙ্গে খিটিমিটি করিতে করিতে যখন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, সেই সময় এক দিন অমিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া একখানা শ্লেট হাতে তাঁর সাম্‌নে বসিয়া পড়িয়া মিনতিভরা চোখে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"বাবা! আমায় একটু অঙ্ক শেখাবেন?"

ইন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন—"অঙ্ক শিখে কি করবি? তোদের মাথায় কি অঙ্ক ঢোকে যে অঙ্ক শিখবি!"

অমিয়া সবিনয়ে প্রশ্ন করিল—"কেন ঢোকে না বাবা? আমরা কি?"

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর ঔদাস্যে উত্তর দিলেন—"তোরা যে মেয়ে মানুষ রে! মেয়ে মানুষদের যে ব্রেণ নেই!"

অমিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল—"একেবারেই নেই? কারুরই থাকে না? তবে যে কোন কোন মেয়ে বি-এ, এম-এ পাশ করেচে? তাদের?"

ইন্দ্রনাথ আরও গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন—"তারা হচ্চে মেয়েমানুষের ব্যতিক্রম! সে আর ক'জন? নে' আচ্ছা আয় দেখি—কি অঙ্ক শিখতে চাস্?"

মেয়েকে অঙ্ক কষাইতে বসিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, মেয়েজাতির মস্তিষ্ক যতই ঘৃতশূন্য হউক না কেন, বুদ্ধি বড় মন্দও নাই; অনায়াসেই তাহাকে অঙ্কটা শেখান গেল। নিজের মতের বিরুদ্ধ প্রমাণে মন কাহারও খুব খুসী হয় ত হয় না, ইন্দ্রনাথেরও হইল না, তথাপি একটু কৌতূহল জাগ্রত হইল। মেয়েকে বলিয়া দিলেন, "রোজ এই সময়ে আসিস—অঙ্ক শেখাবো।"

এম্‌নি করিয়া পা ভাঙ্গার শনি ঘাড়ে চাপিয়া অমিয়ার অঙ্ক শিক্ষা, তাঁর সঙ্গে ইংরাজীটাও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া গেল এবং মেয়ের বুদ্ধির ধার দেখিয়া বাবার ভোঁতা তর্ক পরাভব স্বীকার করিল। পায়ের বেদনা সারিয়া গিয়া চাকরীতে যোগ দিলেও ইন্দ্রনাথ আর অমিয়ার পড়ার ভার একেবারেই ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিতে পারিলেন না, অবসর কালটুকুকে সে এমন করিয়া গণ্ডী দিয়া লইল, যে, ইচ্ছা না থাকিলেও সেটুকুকে আর কোন কাজে লাগাইয়া ফেলিবার যেন কোনই উপায় রহিল না।

এম্‌নি করিয়া নিজের প্রবল চেষ্টায় ও বাপের অল্প সাহায্যে সে পরীক্ষা দিয়া পাশও করিল এবং সকলকে বিস্মিত করিয়া সোনার মেডেল ও স্কলারশিপও আয়ত্ত করিল।

তা বলিয়া ঘর-সংসারের কাজের বোঝা ও ভাই-বোনদের মাষ্টারী করার হাত হইতে সে এক দিনের জন্যও নিষ্কৃতি পায় নাই। ইন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া উহাকে দিয়াই

নিজের কাজগুলি করাইয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা খবর রাখিতেন যে রান্না, বাটনাবাটা, শেলাই—এ সকল সে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে কি না; অবসর মত নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে তিনি ত্রুটী করিতেন না।

২

পাশের বাড়ীতে যোগীন মল্লিক সপরিবারে বাস করিত। যোগীন এক সময় বড়-লোকের ছেলে ছিল, সেই ওজুহাতে সে লেখাপড়া বিশেষ শেখে নাই, কাজকর্ম্ম কিছুই করে না; পরন্তু ধনী-সন্তানরূপে মর্ত্তভূমিতে আগত হওয়ার দাবীতে ভাল খাওয়া পরা থাকা এবং ইচ্ছামত মদ্যপানের সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্যের অধিকারটাকে সে সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করিয়া থাকে এবং নিজের সেই স্বত্ব সকলের উপরেই সাব্যস্ত করিতে চায়। এই লইয়া তাদের পারিবারিক অশান্তির আর সীমা ছিল না। ভাইয়ে ভাইয়ে সর্ব্বদা কলহ চলিতেছিল। মা কখন এ-ছেলের সপক্ষে, কখনও ও-ছেলের বিপক্ষে দুর্ব্বল যুক্তি দেখাইতে গিয়া লাঞ্ছিত ও এমন কি প্রহৃতও হইতেন। আর সব চেয়ে দুঃখ ছিল সেই যোগীন মল্লিকের সুন্দরী ও তরুণী পত্নীর। মেয়েটী কোন ভাল ঘরেরই মেয়ে। দেখিতে ফুটফুটে—যেন ছবিখানি! যৌবনের জোয়ারে সর্ব্বদেহ তার ভরা নদীর মতন যেন টলটল করিতেছে। মনে সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই সেই সঙ্গে ভরপুর। কিন্তু কপালটাই শুধু শূন্য! স্বামী-রত্নটী কখনও মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন, আবার কখনও পা দিয়া মড় মড় করিয়া মাড়াইয়া ভাঙ্গিতেছেন! সোহাগ এবং নির্য্যাতন যেন একত্র হাত-ধরাধরি করিয়া তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছে। এই দেখ—শৈলবালা এলো খোঁপায় মল্লিকা ফুলের মালা জড়াইয়া শ্যাওলা রংয়ের সাড়ী পরিয়া স্বামীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে; তখনি শোন—কানের ইয়ারিং দুটী কান হইতে খুলিয়া দিতে বিশেষ আপত্তি করার দোষে পতিদেবতা তাহাকে নির্দ্দয় হস্তে প্রহার করিতেছেন ও সেও করুণ চীৎকারে প্রতিবেশী-দের অস্থির করিয়া তুলিতেছে। স্বামী যখন স্ত্রীকে প্রহার করে, সে সময়ে বাধা দিবার কোন অধিকারই তো আর অন্য প্রতিবেশীদিগের নাই। বরং জোর করিয়া বাড়ী ঢুকিতে গেলে ট্রেস্‌পাসের নালিশ চলে। কাজেই পাঁঠা-বলি দেখার মত করিয়াই তাঁদের উহা সহ্য করিতে হয় এবং কালে ক্রমশঃ সহিয়াও আইসে।

অমিয়া মাকে বলিয়া বলিয়া কোন উপায় করিতে পারে নাই; সেদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া বাপকে গিয়া বলিল—"রোজ রোজ মেয়েমানুষকে ওম্‌নি করে মারবে, আর আপনারা কোন কিছুই আপত্তি করবেন না?"

ইন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—"ওর বউকে ও মারবে,—তোমার মা-মাসীকে ত আর মারতে আসেনি, যে, আমি তার বাড়ী চড়াও হয়ে আপত্তি করতে যাব? আর করলেই বা সে শুনবে কেন?"

"তার স্ত্রী বলে সে কি মানুষ নয়! বিপন্নকে রক্ষা করা তো সকল মানুষেরই কর্ত্তব্য।"

পিতা কহিলেন—"ও তো নিজেকে তত বিপন্ন বোধ করচে না, তুমি যত তাকে বিপন্ন বোধ করচো? মার তো সর্ব্বদাই খায়,—প্রতিকারের কোন্ চেষ্টা কবে করেছে?"

অমিয়া বাপের এই কড়া যুক্তিতে একটু থতমত খাইয়া গেল,—ভাবিয়া দেখিল, কথাটা খুব হাল্কাও নয়। বাস্তবিকই তো সে কই কোন দিন তার এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাও করে নাই! আবার সময় সময় দুজনে বেশ হাসিখুশী করিতেও দেখা গিয়া থাকে!

এমন কি করিয়া হয়? এই নির্য্যাতন অপমান সহিয়া আবার সেই স্বামীরই সহিত হাসিতে, কথা কহিতে, ঘর করিতে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়? সে যেন এ কথাটা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারিল না। তার পর তার যেটা মনে পড়িল, সেইটাই সে বলিয়া ফেলিল—"কিন্তু মার খেতে খেতে যদি ও মরে যায়? তাতে আমাদেরও তো পাপ হয়?"

ইন্দ্রনাথ রাগ করিয়া বলিলেন—"তাই বা কেন হতে গেল? ওর স্বামীর ওকে মারবার, কাটবার, সব করবার অধিকার আছে। ওর ঘরে ওর স্ত্রীকে ও মারবে, আমি আইনতঃ ওর বাড়ী গিয়ে তাতে বাধা দিতে পারি নে,—এর জন্য আমার পাপ হবে? আর তাই যদি হয় তো তাতে আর কি করচি বল? মাঝে থেকে তুমি ওর মাথায় যেন তোমার ও-সব কুতর্ক ঢোকাতে যেও না। সংসারে এই রকমই হয়ে থাকে, স্বামী খেতেও দেয়, আবার মারেও দু'ঘা,—স্ত্রীরা চিরদিন এসব সহ্যও করে যায়, এ কিছুই

বিচিত্র নয়। এই সব আদর্শ ছিল বলেই দেশটা ঠাণ্ডা ছিল। এখন এই তোমাদের মতন তার্কিক মেয়ে সব জন্মে, দেশের আদর্শটা নষ্ট করে ফেলচে। এই জন্যেই বেশি লেখাপড়া শেখাতে চাই নি। এখন যাও দেখি, এক গ্লাস খাবার জল আর গোটাকত পান সেজে নিয়ে এস। আমার কাজ আছে—তোমার সঙ্গে বাজে কথা নিয়ে তর্ক করবার সময় নেই।"

অমিয়া বাপের হুকুম পালন করিতে চলিয়া গেল, কিন্তু তার মনের ভিতরটা বিদ্রোহী হইয়া রহিল। এর নাম আদর্শ বাসনানলে ইন্ধন হওয়ার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যার দৃঢ় বিশ্বাস মনের মধ্যে আছে, তাহাকে তাহার বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে তাহা চাহিবে না। কারণ সে জানে যে 'পতি পরম গুরু।' গরুর মতন ব্যবহার পাইলেও তার গুরুত্বের অপহ্নব হয় না।

অমিয়া এক দিন তার মাকে গিয়া চুপিচুপি বলিল, "মা, আমার বিয়ে দিও না।"

উমাশশী ছোট খুকির জন্য আলুই পাকাইতেছিলেন,—চমকিয়া মুখ তুলিয়া মেয়ের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিলেন। আনমনে কি একটা আন্দাজ করিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিচাপা সুরে জবাব দিলেন—"বিয়ে ত দিতেই হবে মা, বড়টী তো হয়েছ। ভাল তেমন পাচ্চি না ত, পেলেই দোব।"

মায়ের কথার উদ্দেশ্য বুঝিয়া মেয়ে ঘোর রক্তবর্ণ মুখে —"ধেৎ, আমি তাই বল্‌ছি বুঝি?" বলিয়া সবেগে বাধা দিল। তার পর পুনশ্চ শুষ্ককণ্ঠে মিনতি ভরিয়া কহিল—"সত্যি করে তোমায় বলছি মা, বিয়ে আমার তুমি দিও না, বিয়ে হলে আমি সুখী হ'তে পারবো না। যদি ঐ ওদের বাড়ীর ছেলেদের মতন হয়, তাহলে তক্ষনি আমি মরে যাব।" বলিতে বলিতে সে যেন সেই সম্ভাবনার ভয়েই সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল "লক্ষ্মীটী মা! পায়ে পড়ি, আমার বিয়ে দিও না—"

উমাশশী মেয়ের গভীর মানসোদ্বেগ লক্ষ্য না করিয়াই মৃদু হাসিয়া সান্ত্বনার সহিত সস্নেহে কহিলেন—"ওদের বাড়ীর ছেলেদের মতনই বা হবে কেন? ওরকম সংসারে ক'জনই বা আছে। আর আমরা দেখে-শুনে দোব, ভালই হবে। মিথ্যে ওসব খারাপ ভাবনা ভাবতে নেই।"

মায়ের মুখের এই স্নেহ-সান্ত্বনায় অমিয়ার মনের ভিতরকার জমাট আতঙ্ক একটুখানি যেন সরল হইয়া আসিলেও তাহা একেবারে বিদূরিত হইল না। বয়স বাড়িতেছে, বিবাহের কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, তার মনের ভিতর ততই প্রবলবেগে একটা ভীষণ ঝটিকা বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিবাহের কথা মনে করিতে গেলেই, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ঐ ছবিখানিই চোখের সাম্‌নে ভাসিতে থাকে। সুন্দর টুকটুকে পাতাকাটা রুজ-পাউডার-মাখা মুখখানি, কাণে চুণির দুল, কপালে টায়রার মুক্তাগুলি দুল দুল করিয়া দুলিতেছে, মসৃণ ললাটে তাহা যেন শুক্তি-গর্ভশায়ী মুক্তার মতই শোভমান হইয়াছিল। বেনারসী শাড়ীর পাড়গুলি বিদ্যুতের আলোয় জ্বলজ্বল করিতেছে, হাতে গলায় মুক্তার কলার মুক্তার তলা। ভোজের বাড়ী যেন রূপের ও অলঙ্কারবস্ত্রের প্রভায় ঝলসিয়া দিয়া এক দিন ঐ মেয়েটী সকলকার চোখের দৃষ্টিকে তারই পানে টানিয়া আনিয়াছিল। আর আজ? শীর্ণা, অকালবৃদ্ধা, কুৎসিত-ব্যাধিক্লিষ্টা রূপলাবণ্যহীনা রুগ্ন ক্ষুধিত পাঁচসাতটী সন্তানে পরিবৃতা নারী নিজের শরীর মনের বেদনায় অধিক্লিষ্টা হইয়া

লোক-লোচনের অন্তরালে আপনাকে লুকাইতে ব্যস্ত। হাতে তার গাছকতক কাঁচের চুড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তথাপি শাসনের শাস্তির আর শেষ হয় না।

উঃ! অমিয়ারও যদি ঐ রকমটা ভাগ্যে ঘটিয়া যায়? সে কোন মতেই এ অত্যাচারের তলায় মাথা নীচু করিবে না,—নিশ্চয়ই না।

কিন্তু কাজই বা কি এমন বিবাহে?—যার এমন কটু তিক্ত ফল ফলিলেও ফলিতে পারে?

৩

অমিয়ার বাপ যদিও মল্লিক-বাড়ীর বধূদের আধুনিক তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া উহাদের আদর্শ পত্নীত্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে মেয়েকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অমিয়াও যথাসাধ্য পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া চলিত, তথাপি, মধ্যে মধ্যে যেদিন মল্লিকবাড়ীর বাবুদের একটু ঠাণ্ডা মেজাজ বুঝা যাইত, সেদিন সে হয় সে বাড়ীতে গিয়া বধূদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিত, না হয় ঐ বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকাইয়া আনিয়া একটু আদর যত্ন করিতে চাহিত।

সেজ বধূ বিন্দুমতীর পাঁচটী ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে দুটী নিতান্তই শিশু, একটী একটু বড় হইয়াছে, আর দুটী খুব কাছাকাছি, দেখিলে যমজ বলিয়াই মনে হয়। একটী ছয় ও একটী সাত বৎসরের। অমিয়া এদের দুটীকে আনিয়াই একটু আধটু বর্ণপরিচয় করাইত, গল্প বলিত, ছবিটা খাবারটাও না দিত তা নয়। এক দিন সে তাদের একটা গল্প বানাইয়া বলিল—তাহাতে একটী দুষ্ট ছেলে পরের গাছে উঠিয়া আম চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে গাছের মালিক আসিয়া তাকে পুলিসে ধরাইয়া দেয়। ইত্যাদি বলিয়া চৌর্য্যের অপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল।

গল্পটী খানিকটা শোনা হইতেই হিতেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা পুলিস এসে যখন ধরলে, তখন তার সব আমগুলো খাওয়া হয়ে গেছলো, না খেতে বাকি ছিল—বল ত?"

অমিয়া বলিল—"না, তখনও সব খাওয়া হয়ে উঠে নি, গোটাকত আম তার হাতে ছিল, সেই শুদ্ধ ধরা পড়লো।"

মেয়েটীর নাম অনুজা। অনুজা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কাঁচা আম না পাকা আম সেগুলো?"

তার পর নিজেই মীমাংসা করিয়া লইল যে, নিশ্চয়ই সেগুলা কাঁচা আমই ছিল, সেইজন্যই খাইয়া উঠিতে পারে নাই,—পাকা হইলে পুলিস আসিয়া ধরিতে না ধরিতে খাওয়া হইয়া যাইত।

হিতু সহানুভূতিসূচক চুক্ করিয়া একটা শব্দ করিয়া কহিয়া উঠিল—"আহারে! গাছে উঠ্‌লো, সব করলো, মাঝে থেকে খেতেই পেলে না! আমি হলে কিন্তু যেমন করেই হোক, খেয়ে নিতুম।"

অমিয়া কোপপ্রকাশ পূর্ব্বক ধমকাইয়া কহিল—"ছিঃ হিতু! পরের জিনিষ কি চুরি করে খেতে আছে?"

হিতে বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল—"কেন থাকবে না? আমার বাবা বলে নির্ব্বোধের চাইতে চোরেরাও ভাল। তাদের বুদ্ধি খরচ করে খেতে হয়। বুদ্ধি থাকলেই লোকে সেটা খরচ করে থাকে, তা' সে হোক ভাল কাজে, হোক মন্দ কাজে।"

অনুজা ভাইয়ের কথার সমর্থন করিয়া বলিল—"শুধু তাই কেন? বাবা তো এ কথাও বলে যে 'দেখছিস্, কাজ-কর্ম্ম কিছুই তো করি না, তবু তোদের কেমন ভাল খেতে পরতে দিচ্চি? কি করে জানিস? যুক্তি খাটিয়ে। দেখে শেখ।' তা হিতু, তুই বড় হলে বাবার মতন টাকা ধার করবার ফন্দি করতে পারবি না?"

হিতু এই কথায় ধাঁ করিয়া বোনের গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—"'পারবি না' কিরে? আমি বাবার চাইতে বেশিই তো পারবো। আমার বুদ্ধি কি বাবার চেয়ে কিছু কম না কি? সেদিন কেষ্টা মুদি টাকার তাগাদা করতে এলো, তুই তো আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলি যে বাবা বাড়ী আছে, আমিই না তাকে বাবা বাড়ী নেই, চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়েচে ব'লে বিদায় করি? বল্ ত কে বিদায় করেছিল? হুঁহুঁ—আমায় তেম্‌নি বোকা পেয়েছিস কি না—ন্যাপলার মতন!"

অনুজা ভাইএর দত্ত মার সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিয়া হাঁকিয়া উঠিল—"মুখপোড়া ছেলে এক্ষনি মরুক! শুধু শুধু আমায় মারলি কেন?"

হিতেন্দ্র অনুজার চুল ধরিয়া টানিয়া গাছকতক ছিঁড়িয়া আনিল—"আমি কেন মরবো, তুই মর।"

অনুজার আক্রমণে এবার তার কাণ ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেই অনুজা ফস করিয়া নিজের আঁচল ছিঁড়িয়া সেই

আহত কাণের শোণিতপাত বন্ধ করিল, এবং অনুতপ্ত স্নেহভরে ভাইকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল—"আহা হা! রক্ত পড়ে গেল রে! না ভাই, আমার সঙ্গে আর মিথ্যে মিথ্যে লাগতে আসিস্ নি। চল একটু জল দিয়ে দিই।"

হিতেন্দ্র ক্রোধভরে বোনের হাতটা ঠেলিয়া দিল—"যা যা, আর আদর দেখাতে হবে না। পাজি ছুঁচো, ছোট লোকের মেয়ে!"

অনুজা গর্জ্জিয়া উঠিল—'কি! তুই আমায় ছোট লোকের মেয়ে বল্লি? তোর মরণ-বাড় হয়েছে দেখতে পাচ্চি!"

হিতেন্দ্রও ইহার উত্তর সমান তেজের সহিত প্রদান করিল—"বলেছি ত হয়েছে কি? বাবা যদি মাকে ছোট লোকের মেয়ে বলতে পারে—তাহলে আমি তোকে বলতে পারি নে? তুই কি খড়দার মা গোঁসাই না কি?"

অমিয়া অবাক আড়ষ্ট থাকিয়া ইহাদের বিবাদ-বিতণ্ডা দেখিল এবং শুনিল। এতখানি বয়সের মধ্যে সে যে-সব কথা কখনও কাণেও শুনে নাই, ইহাদের সেই সকল কথা ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্ত দেখিয়া গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে গিয়াও সহসা সে চকিত হইয়া স্মরণ করিল, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই বড় বর্ত্তমান নাই। নিজের বাড়ীতে মা বাপের মধ্যে যে ব্যবহার ইহারা লক্ষ্য করিতেছে তাহাই শিখিয়াছে মাত্র। নূতন করিয়া কোথাও হইতে বিচিত্র কিছুই তো শিখিয়া আইসে নাই! এই দুইটী সরল শিশু-জীবনকেও ইহারই ভিতরে এই যে গরল-মণ্ডিত করিয়া তৈরী করা হইতেছে, এর জন্য দায়ী ইহাদের মহাপাপিষ্ঠ দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য পিতা। এবং—এবং শুধুই পিতা কি? ইহাদের মাতাও কি এর জন্য অংশতঃ দায়ী নহে? অমিয়ার চিত্ত সেই নির্ব্বিরোধে ও নির্ব্বিচারে পাষণ্ড স্বামীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ-কারিণী বঙ্গ-বধূর প্রতি ঘোর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমনই কি সহিষ্ণুতা, যে ঐ দুরন্ত-প্রকৃতির স্বামীর সহিত লাঞ্ছিত জীবন বহন করিবার তুচ্ছ লোভটুকুও দমন করিতে পারে না? বৎসর বৎসর এই সকল অভাগা নীতিজ্ঞানহীন সন্তানের সৃষ্টি করিয়া সংসারে দারিদ্র্য ও পাপের বংশ বর্দ্ধিত করার চেয়ে এমন কি মরণকে বরণ করাও শ্লাঘনীয় ছিল না কি? নাঃ, অত্যাচারী স্বামীর ঘর করিতে স্ত্রীকে বাধ্য করার মত পাপ কিছুই নাই। ইহা ত শুধুই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ যে এর উপর পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া আছে। মদ্যপ, ব্যাধিগ্রস্ত, কুচরিত্র এ সকল লোকের বিবাহে সামাজিক বাধা কেন থাকিবে না? অত্যাচারীর স্ত্রীকে সমাজ কেন রক্ষা করিবে না? এ করিতে সে বাধ্য! আর তাহা করাইবার ভার নারীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সকল মেয়েই এই পণ করে, নিশ্চয়ই এই অবিচারের প্রতিকার-চেষ্টা দেখা দেয়। সহ্য করিয়া করিয়া স্ত্রীরাই স্বামীদের এরূপ পিশাচে পরিণত করিতেছে।

অমিয়া মনে মনে দৃঢ় করিয়া বলিল—"আমার যদি কখন তেমন দুর্ভাগ্যও ঘটে, আমি কিছুতেই কিন্তু সহ্য করবো না। এর জন্য প্রাণ দিতে হয় তাও দোব, তবু মাতাল বা কুচরিত্রের সন্তান দিয়ে ভারতের ভার বৃদ্ধি হ'তে দেবো না। সাক্ষী থাক অন্তর্যামী ভগবান! আর তুমিই আমায় সে বিপদে রক্ষা কোরো।"

৪

সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব ছিল; বর্ষার বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশে বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা বিচিত্র বর্ণে ও বিবিধ আকারে নিজেদের গঠিত ও সজ্জিত করিতে ব্যস্ত ছিল। ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে ছোট্ট একটুখানি বাগান; তাহাতে বাঁশের মাচায় তোলা জুঁইএর লতায় রাশি প্রমাণ ফুল ফুটিয়া রাস্তাশুদ্ধ যেন মাতাইয়া তুলিয়াছে। এক পাশে একটা কচি শ্যামল পাতা ও রাঙ্গা ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ায় রোধ হইতেছিল, যেন আকাশের লালের খানিকটা আচমকা খসিয়া পড়িয়াছে।

অমিয়া কতকগুলি জিনিয়া ফুলের বীচি আনিয়া বৃষ্টি-আর্দ্র মাটীতে পুঁতিতেছিল। পাশের বাড়ী হইতে দেখিতে পাইয়া হিতেন্দ্র ও অনুজা তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। দুজনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল "আমায় চারটি বীচি দিন্—আমাদের বাড়ী আমরাও বাগান করবো।"

অমিয়া গোটা কয়েক বীজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিল—"বাগান তো করবে, কিন্তু যা' তোমাদের বাড়ী ছাগল চরে,—ফটকটা ভেঙ্গে গেছে—গাছ কি থাকবে!"

অনুজা তৎক্ষণাৎ বীজ কয়টী হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"ঠিক কথা! যে আমাদের বাড়ীর দশা, বাগান করে কি হবে? নাঃ—করবো না বাগান।"

হিতেন্দ্র অমনি চট করিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন করবি না? খুব করবি! বাবা তো আর অমর হয়ে জন্মায় নি,—বাবা মরে গেলে বাবার ভাগটা তো আমার হবে? আমি তখন ফটক মেরামত করবো কি না। যে মদ খাচ্চে, দেখ্ না, কোন দিন মরে পড়ে বলে।"

অনুজা তাড়াতাড়ি বীজ কুড়াইতে কুড়াইতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"আহা, এমন দিন কি হবে! তা' হলে মাও বাঁচে, আমরাও বাঁচি,—মার খেতে হয় না আর।"

অমিয়া উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। তার হাত যেন আর চলিতে চাহিল না। একটা গভীর বিতৃষ্ণায় মনটা তার যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বীজ বপন ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি তার মার কাছে চলিয়া গেল। মা তখন রান্নাঘরের দালানে তোলা-উনানে ছেলেদের জন্য খাবার করিতেছিলেন,—মেয়েকেই বোধ করি খুঁজিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"দে তো মা লুচি ক'খানা বেলে। মেঘে মেঘে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে গ্যাছে!"

অমিয়া লুচি বেলিতে বসিয়া খানকতক বেলিয়াই ডাকিল—"মা!"

মা গরম ঘিয়ে দুখানা করিয়া লুচি ফেলিয়া ত্রস্ত করে তাহাদের টানিয়া তুলিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, তৎকার্য্য-নিযুক্ত থাকিয়াই উত্তর দিলেন—"কি রে?"—তার পর বলিলেন—"উষা, বিভা, শচীন্, ওদের ডাক দে' দেখি, খেতে বসুক!"

"ডাকচি"—বলিয়া পুনশ্চ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"মা!—একটা কথা বলবো?"

মা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত লুচি-ভাজা বন্ধ রাখিয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

"কি বলবি বল্ না?" পরে তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনশ্চ কহিলেন—"তার অত ভূমিকা কর্‌ছিস কেন?"—বলিয়া পুনশ্চ এক এক করিয়া দুখানা বেলা লুচি ঘিয়ের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। আধ মিনিটের অমনোযোগে গরম ঘি অজস্র ধূমোদ্গীরণ আরম্ভ করিয়া জলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল,—তাড়াতাড়ি কড়াখানা নামাইয়া ফেলিতে হইল।

অমিয়া এই সময় ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, সত্যি মা, আমার বিয়ে দিও না।"

একে ছেলেদের খাবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তারা খাইতে পায় নাই, তার উপর কড়ার ঘি ধরিয়া গিয়া লুচি দুখানার কালো জামের রং হইয়া গেল, মায়ের মন খুবই সুপ্রসন্ন থাকা সম্ভব নয়। তার উপর অত বড় মেয়ের যখন তখন এই অসঙ্গত আবদারে খুসী হইয়া উঠিবারই বা কতটুকু আছে। কড়ার ঘিয়েরই কাছাকাছি তাতিয়া উঠিয়া মা পরুষ কণ্ঠে বকিয়া উঠিলেন—"ফের সেই ভূতে ধরেছে! কি যে পাগলামী করিস! ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে বিয়ে না করে কি নার্স হবি না কি? ভালা তোকে পাশ দিইয়ে মাথা বিগড়ে দেওয়া গ্যাছে। নে'—এখন ওগুলোকে খেতে দিবি, না দিবি না, তাই বল্ তো দেখি?"

অমিয়া একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া বিষণ্ণ মুখে আদিষ্ট কর্ম্মে মনোযোগী হইল।

অমিয়া তার মনের সেই ভয় ভাবনা লইয়া সর্ব্বদা যেন ত্রস্ত হইয়া রহিল। মা বাপের মুখে যদি তার বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, অমনি তার বুকের মধ্যে ধড়্-ফড় করিয়া উঠে। পৃথিবীর সকল পুরুষকেই যেন মল্লিক-বাড়ীর সেজ-বাবুর ছায়া বলিয়া একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়া তার মনকে তাদের উপর বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহের কথা মনে হইলেই তার একটা তীব্র আতঙ্কের সহিত মনে হইত—যদিই দৈবাৎ তার স্বামী-রত্নটী ওই সেজ-বাবুর মতন তার প্রতি ব্যবহার করে, তার সন্তানগুলিও হিতু-অনুজের মতও তো হইতে পারে! অমনি পায়ের তলা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চুলের গোড়াগুলো অবধি তার আতঙ্কে কাঁপিয়া স্থির হইয়া যাইত।

৫

কিন্তু চিরদিন ঠিক এক ভাবেই কাহারও দিন যায় না। পক্ষী-শাবক তার পুরাতন নীড়টীকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসে বটে, তথাপি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু সেইটুকুকেই সে আর যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। অমিয়ার বাপ যখন তার পড়াশুনা চুকাইয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া তাহার বিবাহের জন্য ঘটক নিযুক্ত করিলেন এবং সেই ঘটক ঠাকুরও আজ একজন কাল একজনের খবর লইয়া আসা যাওয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন নিশ্চিত বিপদকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে বুঝিয়া

যেমনি অমিয়া নিজের মনকে কতকটা প্রস্তুত করিয়া লইল, অমনি সেই ফাঁকে ফাঁকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণায় একটা কৌতূহল ও আগ্রহও যেন তার সেই বিবাহ-বিদ্বিষ্ট চিত্তকে ভিতরে ভিতরে পাইয়া বসিল। প্রথম প্রথম ঘটকের খবর আসিলেই সে মনে মনে রাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইত। তার পর ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া তার মনের মধ্যে ঐ বসন্ত-দূতের সংস্পর্শে আগত-প্রায় বসন্তের একটা সাড়া পাওয়া গেল। এখন লুকাইয়া চুরি করিয়া সে তার ভবিষ্য বরের কথা কাণ দিয়া শুনিয়া লয় ও মনে মনে বিচার করিয়া দেখে।

ইতিমধ্যে দু' জায়গা হইতে তাহাকে কনে দেখিয়া গিয়াছে। বরের অভিভাবক এত বড় বয়সের মেয়ে দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অপর স্থলে মেয়ে পছন্দ হইয়াও দেনা-পাওনায় বাধা প্রাপ্ত হইল। বরের পিতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, মেয়ে দুইটা পাশ করিয়াছে বলিয়া তো আর তাহাকে চাকরী করাইতে পারিবেন না। অতএব গহনাপত্র ও বিবাহের ব্যয়টা কোথা দিয়া আসিবে? ইত্যাদি, অতএব—

উমাশশী বলিলেন—"হ্যাঁগা! তবে যে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালে বিয়েতে বেশি টাকা লাগে না?"

ইন্দ্রনাথ বিরক্তচিত্তে বলিলেন—"ও-সব বাজে কথা,—টাকা মেয়ে জন্মালেই দণ্ড লাগে, তার উপর রূপগুণ, বিদ্যেবুদ্ধি—ওগুলো সবই ফাউ।"

অমিয়া তার পুঁথিপত্র জড় করিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছিল, কিন্তু মন সে আর ভাল করিয়া দিতে পারে নাই। বইএর খোলা পাতার পর পাতায় তার চোখের দৃষ্টি ভ্রমিয়া ফিরিলেও, মন তার আর সেদিক দিয়া পথ চলে না। কাজেই উহারা তার দৃষ্টি-সীমাতেই আবদ্ধ থাকে, মাথার ভিতর প্রবেশের কোন পথ পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বইখানা কোলের উপর মেলিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া থাকে। কল্পনা তার উড়ন্ত মনকে লইয়া তখন কতই না খেলা করিয়া বেড়ায়। কখন একটী অচেনা অজানা গৃহের মধ্যে গৃহকর্ত্রীরূপে নিজেকে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক পুরুষের পাশে কার্য্যরতরূপে কল্পনা করে, কোলে কখন একটী ননীর পুতলী শিশু; আবার বিপরীত দৃশ্য দর্শনে কখনও বা শিহরিয়া তার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায়।

এক দিন হেমন্তের হিমস্নাত প্রভাতে ভোরের বেলাই অমিয়া জাগিয়া উঠিয়া তার খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মনে হইল, সেদিনকার ভোরের পাখীর কণ্ঠে যেন কি এক নূতন সুর ধ্বনিত হইতেছিল। শিশিরে-ভেজা শেফালি ও কনক-চাঁপার মিশ্র সুবাসেও যেন একটা নূতন গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। বাতাস আলো সবই যেন নূতন নূতন। দূরে আকাশের গায়ে ছবি আঁকিয়া যে সব চির-পরিচিত বাড়ী-ঘর সে আজন্মকাল ধরিয়াই দেখিয়া আসিতেছে, সেগুলা শুদ্ধ যেন তার আজ নূতন ঠেকিল। কিসের যেন একটা অজ্ঞাত পুলকে মনটা তার সহসা সেই নূতন হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়া কোন্ নবীন আনন্দের সাগরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য যেন উন্মুখ হইয়া উঠিল। অকারণে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, আজ যেন তার জীবনে খুব বড়-রকমের একটা শুভ ঘটনা ঘটিবে।

নিজেকে আগতপ্রায় মঙ্গল লাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া সে শয্যাত্যাগ করিল। যেদিক দিয়া গেল, চার দিকেই চাহিয়া দেখিল, তার বোধ হইল, সকলেই যেন তাহাকে সানন্দ পুলকে সুপ্রভাত জানাইয়া দিতেছে। মনের সে বিপুলতর উচ্ছ্বাস ও পরিপূর্ণতা লইয়া সে যেন আপনাকে গোপন রাখিতে পারিতেছিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া ছোট ভাইবোনগুলিকে কোলে তুলিয়া, বুকে টানিয়া আদরে চুম্বনে ভরাইয়া দিল। মা বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, বালিকার মত ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে তাঁকে জড়াইয়া ধরিল।

মা রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দিন দিন তুই খুকি হচ্চিস না কি অমিয়া? এক্ষনি দুজনেই যে কেটে মরতুম!"

অমিয়া মার পিঠের উপর মুখ ঘষিতে ঘষিতে হাসিমুখে কহিল—"না মা, কিচ্ছু হতো না মা! লক্ষ্মীটী, আমায় আজ বকো না।"

উমাশশী সস্মিতমুখে মেয়ের মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন রে, আজ তোর কি?"

মেয়ে মায়ের সেই স্নেহস্পর্শটুকুর তলায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া দিয়া সুখোৎফুল্ল মুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল—"কি জানি মা, কি! কিন্তু আজকে আমার বড্ড ভাল লাগচে।"

সারা দিনটা যথাপূর্ব্বই কাটিয়া গেল। অমিয়া দিনের প্রথমাংশটা হাসিয়া লাফাইয়া ছোটদের সঙ্গে খেলিয়া মায়ের কাজের সাহায্য করিয়া কাটাইয়া দিল। ভাইবোনদের স্নানের সময় ভাল করিয়া সাবান দিয়া স্নান করাইল, তাদের পোষাক পরানো, চুল আঁচড়ানো, ভাত খাওয়ানো, পড়া বলা সব কাজেই আজ সে তার যথাসাধ্য যত্ন লইয়া সমস্তই সুসম্পন্ন করিয়া তুলিল। তার পর যে যাহার কাজে স্কুলে কাছারীতে সবাই বাহির হইয়া গেলে, সেও আহারাদি সারিয়া একলা ঘরে বই খাতা লইয়া বসিয়া পড়িল।

অমিয়ার একখানি ছোট নীল-মলাট-দেওয়া নোটবুক ছিল। মধ্যে মধ্যে সে এইখানিতে গোপনে কবিতা লিখিত। আজ সেখানা খুলিয়া বসিয়া লিখিল—

আজিকে কি দিবে দেখা হে প্রিয় আমার!
এই যে আনন্দ ধ্বনি, এ কি তব আগমনী?
তুমিই কি দে'ছ খুলে এ শোভা-ভাণ্ডার?
পুলকে কম্পিত হিয়া, আছি পথে দাঁড়াইয়া,
সঁপিতে চরণে তব, হৃদি ফুলহার,—
আজিকে কি পাব দেখা হে প্রিয় আমার!

কবিতা লেখা শেষ হইল না,—চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরে একটী ভদ্রলোক আসিয়া বাবুকে খুঁজিতেছিলেন,—বলিলেন, বাড়ীর ভিতর হইতে খবর লইয়া এস, ক'টার সময় তিনি বাড়ী ফিরিবেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে।

অমিয়া বিস্মিত হইল। এমন সময়ে কে তার পিতাকে খুঁজিতে আসিল! নিশ্চয়ই কোন অজানা লোক হইবে। সে চাকরের মুখে উত্তর পাঠাইয়া দিয়া, নিজে উঠিয়া জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে বাড়ীর সাম্‌নেটা দেখা যায়। দাঁড়াইবামাত্র তার চোখে পড়িয়া গেল,—সদর দরজার কবাট ধরিয়া একটী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছেন। সে দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার ঊর্দ্ধোত্থিত ব্যগ্র দৃষ্টির সহিত তাহার সকৌতুক দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। অমনি লজ্জারক্ত মুখে সে ত্রস্তপদে সরিয়া আসিল।

সরিয়া আসিল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। কি জানি কিসের ঝোঁকে সে তার স্বভাব-বহির্ভূত কার্য্য করিল। জানালার কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া উহারই ফাঁকের ভিতর হইতে সে সেই অপরিচিত আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; এবং দেখিতে গিয়াই তার মনে হইল—এমন রূপ সে পুরুষের মধ্যে আর কখন দেখে নাই!

বাস্তবিকই কি সেই অপরিচিত পুরুষ এতই সুরূপ? কিন্তু কোন্ মুহূর্ত্তে যে কাহার জন্য দেখা দেয়, এবং কোন্ অজ্ঞাত কুহকী তার মোহনীয় কুহকের সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করিয়া বইসে, কেহই জানে না। সেইক্ষণে সমীপাগত যে কোন রূপকেই অপরূপ ও যে কোন সুদূরাবস্থিতকে নিকটতম আত্মীয়তম বলিয়া মনে হয়। সেই মোহের কাজল চোখে লাগান ছিল বলিয়াই সহসা ঐ অজ্ঞাত পুরুষকে দেখিয়াই অমিয়ার বোধ হইল, ঐ যে তাদের দ্বারে আসিয়া আজ ঐ অচেনা অতিথি দাঁড়াইয়াছে,—এ যেন কোন্ দূরদূরান্তর হইতে ছুটিয়া তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে,—এ যেন শত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাহারই প্রতীক্ষাকারী,—একমাত্র তাহারই। এই কথা মনে হইবামাত্র তার সমস্ত দেহ-মন যেন সেই ভোরের বেলার পুলক-স্মৃতিতে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত দেহ যেন সুখাবেশে শিথিল হইয়া আসিল। সে নিজেরও অজ্ঞাতে সেই অজানা অতিথির উদ্দেশে যুক্তকরে মনে মনে প্রণাম-নিবেদন জানাইল। মনে মনে বলিল—নিশ্চয়—নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি দেবতার দান! আমি যে তাঁকে প্রাণপণে ডেকেছিলেম, তাই তিনি হয় ত আমার জন্য তোমায় বেছে দিয়েছেন!

৬

আফিষ হইতে ফিরিয়াই, সেই আফিষের পোষাকেই ইন্দ্রনাথবাবু প্রায় ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলেন—"ছোট-বৌ! বলি শুন্‌চো?"

শ্বশুরবাড়ীতে উমাশশী ছোটবৌ হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল। বড় মেজ জায়েরা স্বতন্ত্র থাকিলেও তার ছোট-বৌ পদটা ঠিকই আছে।

উমাশশী রান্নাঘর হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন—"এই যে আমি এখানে, কি বলচো?"

ইন্দ্রনাথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন—"যতীন এসে যে সারাদিন বাইরের ঘরে বসে রয়েছে, সে অমিয়াকে বিয়ে করতে চায়, নিজেই কনে দেখবে। শীগ্‌গির উঠে এসে মেয়ে সাজিয়ে দাও দেখি।—"

এই খবর শুনিয়াই ময়দা-মাখায় নিযুক্তা অমিয়ার মুখ

একেবারে জবাফুলের মতন টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা তার যেন কি একটা বিপুল উল্লাসের তরঙ্গে তালে তালে দোল খাইতে লাগিল। তবে তো তার ধারণায় ভ্রান্তি নাই! নিশ্চয়ই সে দেবতার দান।

উমাশশী কিন্তু এ সম্বাদে প্রমাদ গণিলেন।—একে এখন কাজকর্ম্মের সময়—তার উপর মেয়েও বড় সোজা নয়। কনে দেখা দিবার জন্য কতই না তাকে ভালকথা মন্দকথা কহিয়া দেড় দুঘণ্টা বুঝাইয়া সমজাইয়া তবে তো রাজী করিতে হইবে! সে কি অল্পে বশ হয়! কাঁদিয়া কাটিয়া মুখ চোখ ফুলাইয়া গম্ভীর বিরক্ত মুখে কনে-দেখা দিতে গেলে, কেহ কি কোন জন্মে কনে পছন্দ করিতে পারে? এই জন্যই তো দেখিতে ভাল হইলেও তাকে কোন দিনই কেহ পছন্দ করিতে পারিবে না। মেয়ে বলে 'আমি কি শাক না মাছ, যে, আমায় যে-সে এসে নেড়ে-চেড়ে দেখে যাবে!' আরে বাপু, তুই এটা বুঝিস্ না যে, শাকমাছের চেয়েও তুই অধম,—তুই মেয়েমানুষ। মাছটা পচা হ'লে পয়সা ক'টাই জলে যায়, আবার একটা কেনা চলে; কিন্তু তোকে বদলাইয়া আর একটা কিনিতে গেলে তো একটু হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে। আজকালের বাজারে আর আগের দিনের মতন সহজে সেটা হইবে না।

কিন্তু উমাশশীর বিস্ময় আজ সীমা অতিক্রম করিল। একবার মাত্র ডাক দিতেই নেহাৎ ভালমানুষটীর মতন অমিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল; এবং মা যেমন ইচ্ছা সাজাইয়া দিলেও সে এতটুকু প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। শুধু মা যখন জমকালো দেখিয়া নিজের একটী বেনারসী স্যুট বাহির করিয়া পরিতে বলিলেন, তখন সে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, 'ওটাতে বড্ড বড় দেখায় না মা! তার চেয়ে আমার বাসন্তী রংয়ের পাতলা মাদ্রাজীটা পরবো?"

মা ঈষৎ বিস্মিত আনন্দে মেয়ের মুখের দিকে চাহিতেই, সে লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ নত করিল। মা বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা, তা'হলে তাই পর।"

যতীন বলিয়া ইন্দ্রনাথ যাহার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেটী ইন্দ্রনাথের বহুদিনের পাঞ্জাব-প্রবাসী বাল্যবন্ধু যোগীন্দ্রনাথের ছেলে। ইহারা সে দেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তা কয়, তাহাতেও কিছু পাঞ্জাবী টান বোঝা যায়। ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সেইখানেই সব। শুধু বিবাহটাই বাংলার সহিত সম্বন্ধটাকে বজায় রাখিয়াছে। বাঙ্গালী এইটুকুই কেবল ছাড়িতে পারে না। যতীন বাপের মৃত্যুর পর তাঁর কাঠের গোলা চালাইতেছে। কণ্ট্রাক্টারীও সে করে, রোজগার মন্দ হয় না। বিষয়-আশয় বেশ আছে। বয়স তার আনুমানিক বছর ত্রিশ-বত্রিশ—এম্‌নি হইবে। চেহারা বেশ জঙ্গী জোয়ানের মত। পাঞ্জাবী ধরণ কতকটা। গায়ের রং বেশ ফরসা, মুখের রং রোদে ঘোরার জন্য কতকটা তামাটে হইয়া আসিলেও ফরসা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতায় এক জায়গায় বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। পরের দ্বারায় কথাবার্ত্তা হয়। বিবাহ করিতে আসিয়া দেখা গেল—মেয়ে নিতান্ত ছোট,—বড় জোর এগার বৎসর বয়স—তার চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের ছোট। রাগ করিয়া বিয়ে ভাঙ্গিয়া এবার নিজেই সে কনে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। দৈবক্রমে অমিয়ার সন্ধান পায় ও তৎক্ষণাৎ একাই এ বাড়ীতে চলিয়া আইসে। বাপের পুরাতন চিঠি-পত্রের ফাইলে ইন্দ্রনাথের চিঠি ও বাড়ীর ঠিকানা তার চোখে পড়িয়াছিল এবং মনেও ছিল,—ছেলেটির স্মরণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ, পড়াশুনাও মন্দ ছিল না। বি-এ অবধি পড়িয়াছিল,—কিজন্য জানা নাই, পরীক্ষা না দিয়াই পড়া ছাড়িয়া দেয় এবং বাপের কারবারে ঢুকিয়া পড়ে।

কনে দেখা হইয়া গেল। কনে অপছন্দের মতন নয়, অপছন্দ হইলও না। দু'একটা কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াই যতীন ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওঁকে ভেতরে যেতে বলুন,—এইবারে আপনাকে দু' একটা কথা বলে আমি আজকের মতন উঠবো।"

অমিয়া এই অবসরে একবার চুরি করিয়া চকিত চক্ষে তাহার দ্রষ্টাকে দর্শন করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্তরালে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে আসিয়া মার বাহুতে মুখ লুকাইল। মনটা তার আনন্দে, লজ্জায় এমনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, মায়ের সামনে সহজ ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। মা কিন্তু তার এই মুখ লুকানোর সত্য অর্থটাকে না বুঝিয়া বরং বিপরীতই অনুমান করিয়াছিলেন। ঈষৎ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে অথচ অন্যের অশ্রাব্য চাপা সুরে তিনি কহিয়া উঠিলেন—"অমন করে

রৈলি যে! কেন—খাসা দেখতে তো, তোর কি মনে ধরলো না না কি? কি চাস্ তুই?"

অমিয়া লজ্জায় জড়াইয়া মায়ের গায়ের মধ্যে আরও ঠেসিয়া গিয়া মৃদুতর কণ্ঠে কোনমতে জবাব দিল—"কে বলছে মন্দ?"

"তবে আবার কি? দেখতে ভাল, পয়সা আছে, বয়সও তেমন কিছু বেশি নয়। দেখ, মিথ্যে কোন মতবাদ তুলে বসো না যেন! যদি ও তোমায় পছন্দ করে থাকে, তুমি তাই যথেষ্ট মনে করো।"

অমিয়া মার মুখের দিকে বারেক চাহিয়াই নত চক্ষে ত্বরিৎস্বরে কহিয়া উঠিল—"আমি কি বলেছি—আমার পছন্দ হয়নি। তুমি আমাকে কি যে মনে কর।"

বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল। উমাশশীর মুখ এই কথায় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে একটুখানি সকৌতুক হাসি হাসিলেন,—এই না মেয়ে বলতেন যে, বিয়ে করবেন না! যাক্—বাঁচা গেল!

৭

অমিয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। বর যতীন জানাইল যে, বিবাহ করিয়াই সে তার স্ত্রীকে লইয়া লাহোরে চলিয়া যাইবে। এই প্রস্তাবটাতে ইন্দ্রনাথ বাবুর মনটা কিছু দমিয়া গিয়াছিল। তাঁর মনে হইল—হয়ত উমাশশী এবং অমিয়া নিজেও এটা পছন্দ করিবে না। এত শীঘ্র বহুদিনের জন্য বহুদূরে আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে সুকঠিন,—তা যতই কেন সে বড় হোক না, আর যত লেখা পড়াই শিখুক।

কিন্তু অমিয়াকে যখন তিনি নিজে অনেক করিয়া বুঝাইয়া আস্তে আস্তে খবরটা দিলেন, তখন সে চুপ করিয়া রহিল, ভালমন্দ কোন জবাব করিল না। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রনাথ বাবু ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এতে কোন আপত্তি আছে?"

তখন ক্ষণকাল মাত্র নীরব থাকিয়া অমিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেও খুসী হইলেন। উমাশশী অসন্তুষ্ট না হইলেও অন্তরের মধ্যে হয়ত একটুখানি আহত হইলেন, এবং বলিলেন—"মেয়ে পরের জন্যেই হয় যে বলে, তা' ঠিক!"

বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সময় খুব কম—একমাসও নয়। ইহার ভিতর সবই তো করিতে হইবে। সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউস, জ্যাকেট, বডি—সবই মায়ে ও মেয়েতে দিন-রাত কল চালাইয়া তৈরি করিতে লাগিয়া গেল। বর নগদ ও দান-সামগ্রী কিছুই লইবে না—শুধু সামান্য বরাভরণ ও মেয়ের যা কিছু। উমাশশী তাই মেয়ের জন্য কাপড় জামাটাই বেশি করিয়া করিতে লাগিলেন। গহনা পাঁচসাতখানি একটু কায়েমী দেখিয়া গড়াইতে দেওয়া হইল। যতীন নিজে যাহা দিবে, তাহার একটা ফর্দ্দ দিয়াছিল। দেখা গেল, তাহাতে কান রতনচূর পর্য্যন্ত সীঁথিপাটী ফুলঝুমকা সবই মজুদ আছে। সেগুলি তার মায়ের গায়ের গহনা। যতীন মায়ের এক সন্তান, তাই সবই তিনি যতীনের বউকে দিয়া গিয়াছেন।

মা বলিলেন—"গহনার তো গাদা আছে দেখছি। তবে ও-সব সেকেলে হয়ে গ্যাছে, কেউ আর পরে না। তা' এর পর সব নূতন করে গড়িয়ে নিস।"

পাকা-দেখায় যতীন কনেকে একটী মুক্তার মালা পাঠাইয়া দিল। প্রতিবেশিনীরা জিনিষ যাচাই করিয়া মন্তব্য করিলেন—"হ্যাঁ, পছন্দ ভাল! তা' জিনিসটারও দাম আছে। হাঁজার দুইএর কমে আর হয়নি।"

কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অত হবে না, হাজারখানেক হয়ত ঢের!"

উমাশশী এক দিন স্বামীকে বলিলেন—"দেখ, অমিয়া একটা কথা বলছিল,—সে বলে, অত দূরের লোক, এত বয়স অবধি বিয়ে করেনি, স্বভাবচরিত্র ভাল তো? ভাল করে একটু খবর নিলে হতো না।"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন—"বিদুষী হয়ে মেয়ে বাপের ভুলগুলো তবু ধরে দিচ্চে! ওরে বাপু, তা কি আর আমি নিই নি? কলকাতায় যেখানে ও আছে, তার কাছেই নগেন ঘোষের বাড়ী। তিনি লাহোরে তিনবচ্ছর ছিলেন, ওদের খুব ভাল করেই জানেন। তিনি বল্লেন—মেয়ের ভাগ্যে থাকলেই এমন বরে পড়বে।"

উমাশশী নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া মেয়েকেও খবরটা দিলেন, ইহা শুনিয়া অমিয়ার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। বাবা মা তাকে কি বেহায়াই না ভাবিলেন! দেবতার দানকে, সে এম্‌নি অবিশ্বাসী যে, এত করিয়া যাচাই করিতেছে! নাঃ,

এ লোক কখনই মন্দ হইতে পারে না। ভগবান নিজেই যে আগে হইতে জানাইয়া ইহাকে তার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং পূর্ব্বপরিচিত নগেন ঘোষের বাড়ীর লোকেরা বরযাত্র আসিয়াছিল। বিবাহে সকল রকমেই খরচপত্র কম করিতে হওয়ায়, ইন্দ্রনাথ তাঁর নব জামাতার উপরে অত্যধিক পরিমাণেই সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। একে ত নিজে যাচিয়া আসিয়া বিবাহ করিল,—তার উপর খরচপত্রও বেশি করিতে হইল না,—আবার বরযাত্রীর উপদ্রবও সহ্য করিতে হইল না! নাঃ—নমিতা ও সমিতাকেও দু'একটা পাশ করাইয়া রাখিতে হইবে।

বিবাহরাত্রেই কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া বর-কনে বাসর ঘরে গেল। বর বধূকে যে লজ্জাবস্ত্র প্রদান করিলেন, সেখানা দেখিয়া বাসরঘরে অনেক মেয়েই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আইবুড় ভাতে একখানা সোনার তারের শাড়ী—তা যেন না হয় পাইল। কিন্তু লজ্জাবস্ত্র আবার রূপার তারের শাড়ী-জ্যাকেট দিয়া কে দেয়? নাঃ—জামাইএর হাতটা আছে! তা' হবে না কেন? কণ্ট্রাক্টরের আমাপা পয়সা!

অমিয়ার হাত যখন তার বাপ যতীনের হাতে তুলিয়া দিলেন, তখন গভীর সুখে তার সারা দেহ যেন শিথিল হইয়া আসিল।

বাসরঘরে যতীনকে অনেকেই গান গাহিতে বলিলে, যতীন একজনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের বিদুষী কনে নিশ্চয়ই গাইতে পারেন,—তিনিই একটা গেয়ে শোনান্ না অনুগ্রহ করে।"

জিজ্ঞাসিতা এবং তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া আরও জন-কয়েক মহিলা হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিলেন—"সে ভাই তুমি নিজেই বলে-কয়ে শুনে নিও, আমরা তো ওর গলা থেকে এতটুকু হুঁহু পর্য্যন্ত কোন দিনই শুনতে পাই নি। এখন তুমি নিজেই একটা গাও দেখি।"

যতীন বিস্তর আপত্তি করিল বটে, কিন্তু শেষটায় একটা গজল্ গাহিল। গানটা যদিচ কাহারও বোধগম্য হইল না, এবং মুখভঙ্গী ও হাত পা নাড়ার ধরণে মেয়ে-মহলে একটা হাস্যরসের উদ্রেকও করিল, তবু অমিয়ার মনে হইল—কেন, মন্দটা কি? বেশ ত ওস্তাদী গান।

অমিয়ার সখীদের মধ্যে দু'একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—"মা গো! যেমন কাটখোট্টাদের দেশের মানুষ—তেম্‌নি কি বিতিকিচ্ছি গান শিখেছ! যেন ড্রিল মাষ্টারের-ড্রিল করান,—গান গাওয়া ত নয়!"

অমিয়া মনে মনে সখীর উপর একটু বিরক্তি বোধ করিল। মা গো! মুখের উপর কি অমন করিয়াই নিন্দা করিতে হয়! ওঁর বর তো তবু একেবারেই আনাড়ী!—

বিবাহের পরদিন পাঞ্জাব মেলে বর-কনে রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিবে। এইবার অমিয়ার বিবাহের প্রচুর আনন্দ বিচ্ছেদের গভীরতর বেদনায় কোথায় যেন ঢাকা পড়িয়া আসিতেছিল। সকালে উঠিয়াই সে মায়ের কোলের উপর পড়িয়া খুব খানিক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। ছোট ভাই-বোন-গুলিও তাহাকে ঘেরিয়া যত কাঁদে, সেও তাদের কোলে করিয়া বুকে টানিয়া ততই কাঁদিয়া ভাসায়। বাপ-মা, প্রতিবেশী বুঝাইয়া কান্না থামাইতে পারে না।

বিকালের ডাকে অমিয়ার নামে একখানা চিঠি আসিল। সে সময় সে তার স্বামীর সহিত যাত্রা করিবার জন্য কন্যাসজ্জা করিতেছিল। বরের ইচ্ছানুসারে তাহাকে বিবাহের দামী বেনারসীর বদলে একখানি হাল্কা দেখিয়া লাল শাড়ী পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গহনা গায়ে সামান্যই দেওয়া হইয়াছিল। কনের চিহ্নের মধ্যে লাল ওড়নার সঙ্গে বাঁধা বরের চাদরখানা গায়ে জড়ানো রহিল; আর কপালে চন্দন না পরাইয়া মায়ের মন সরিল না। বর সাদাসিদা পোষাক—এমন কি, সাহেবী পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইল। ইহাতে উমাশশীর মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে তিনি কোন আপত্তি তুলিলেন না। আর পাঁচজনে একটু নিন্দা করিল এবং বলিল—"কনেকেই বা আর আলতা দেওয়া কেন, পায়ে মোজা-জুতো দিলেই হতো।"

সাজ শেষ করিতেই কন্যা-বিদায়ের পালা পড়িল। ইহারই ভিতরে অমিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল এবং পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিখানার খানিকটা পড়িয়াই তার মুখখানা হঠাৎ সাদা ফ্যাকাসে হইয়া গেল; এবং সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যগ্র-আগ্রহে সেখানা শেষ করিয়াই, সেটা রুমালে বাঁধিয়া জ্যাকেটের বুকের মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তখন তাহাকে সকলেই ব্যস্ত হইয়া ডাকাডাকি বাধাইয়া দিল।

মা বাপ চোখের জলে ভাসিয়া বরের হাতে মেয়ে সঁপিয়া দিলেন। উমাশশীর চোখের জলে দুজনের হাত ভিজিয়া গেল, কিন্তু অমিয়ার চোখে একফোঁটা জলও আর দেখা দিল না। সে শুষ্কনেত্রে মা-বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে আসিয়া গাড়িতে বরের পাশে উঠিয়া বসিল। ভাই-বোনগুলি কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল,—সে তাদের দিকে একবার চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখিল না। যেন এই কোথায় একটুখানি বেড়াইয়াই আবার এক্ষনি ফিরিয়া আসিবে—তার ভাব দেখিয়া এই রকমই মনে হইতে লাগিল।

অনেকেই মনে করিল—"ধেড়ে মেয়ে করে ঘরে রাখা,—বর পেয়ে বর্ত্তে গেছে। মা গো! কত দিনের মত অত দূরে চল্লো—তার মনে এতটুকু কষ্টও কি নেই! খুব মেয়ে দেখলুম বাবু,—অমিয়া!"

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিতেই যতীন একটা শ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বক আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"যাক বাঁচা গেল!"

অমনি অমিয়া চমকিত হইয়া তার দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। হঠাৎ তার মনে হইল, এই লোককে তার অত সুন্দর মনে হইয়াছিল কেমন করিয়া? সৌন্দর্য্য এর কোন্‌খানটায় আছে? ষণ্ডামার্কার মতন চেহারা, গম্ভীর মুখ, আর এই যে কথাটা সে বলিল, এর মানে এই যে, নির্ব্বিঘ্নে এ বিবাহ হইয়া উঠিবে, এ রকম আশাও হয় ত তার মনে ছিল না!

অমিয়ার বুক ঠেলিয়া একটা আর্ত্ত চীৎকার যেন সবেগে তার গলা চিরিয়া বাহির হইবার জন্য তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। প্রাণপণে সেটাকে দমন করিতে করিতে সে ক্ষণপূর্ব্বের বৃষ্টি দ্বারা কর্দ্দমাক্ত রাজপথের উপরে তার চোখ দুইটাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। যে তাহাকে প্রবল প্রবঞ্চনা দ্বারা জন্মের মতই মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কাপড়ের অংশটুকু পর্য্যন্ত সে যেন দেখিতে পারিতেছিল না।

ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিতেই টক্ করিয়া যতীন নামিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল,—এই সম্ভাষণে—"এস অমি,—নেমে এস—"

"অমিয়ার শরীরের মধ্যে যেন একটা প্রবল বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়া গেল। সে সেইখানে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া শুধু দৃঢ় স্বরে কহিল—"বড্ড ভিড় যে।"

যতীন কহিল—"তবে তুমি বসো, আমি লাগেজগুলো রেখে আসি, আর দেখে আসি রিজার্ভ দিয়েছে কি না।" এই বলিয়া সে কুলির সাহায্যে মালপত্র লইয়া প্লাটফর্ম্মের ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

পাঞ্জাব মেল দাঁড়াইয়া আছে, সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় দুখানা বার্থ রিজার্ভ দেওয়া রহিয়াছে। যতীন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাক দিল—"এস অমিয়া!"

গাড়ির ভিতর কেহই নাই! কোচম্যান ভাড়ার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যতীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কই, মাইজী কাঁহা?"

কোচম্যান উত্তর দিল—"মাইজী তো আপকা পিছাড়ি চলা গিয়া সাব্।"

যতীন মনে করিল, একলা থাকিতে ভয় পাইয়া অমিয়া তাহার সঙ্গেই গিয়াছিল,—ভিড়ের মধ্যে সে অত লক্ষ্য করে নাই। গাড়িওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল, এমন কি, সেই বার্থ-রিজার্ভ-করা কামরার ঢুকিয়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিল; কিন্তু অমিয়ার কোন অস্তিত্বই কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। বিস্মিত যতীন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেও, তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ছুটিয়া তার হারানো জিনিষ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। পাঞ্জাব মেল ছাড়িবার আর বেশি বিলম্ব নাই।

লম্বা গাড়িখানার প্রত্যেক কামরায় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সমস্ত প্লাটফর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া কোথায়ও অমিয়াকে পাওয়া গেল না। তখন ঘোর দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া যতীন গাড়ি হইতে তাদের মাল নামাইয়া লইল এবং পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তার বিশ্বাস হইল, কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক নিশ্চয়ই তাহাকে কোনরূপে সরাইয়া ফেলিয়াছে।

একটী কুলি হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম মেয়েমানুষকে আপনি খুঁজছেন বলুন দেখি? একটী রাঙ্গা-শাড়ী-পরা কনে-বউ একটা ভাড়াটে গাড়িতে উঠে হুগলী যেতে বলে দিলে আমি দেখেছি।"

প্রশ্ন করিয়া করিয়া যতীন বুঝিল, সেই কনে-বউটীই তার স্ত্রী অমিয়া। কিন্তু এ কি প্রহেলিকা! হঠাৎ অমিয়া এমন অদ্ভুত ভাবে তাহাকে ছাড়িয়া লুকাইয়া পলাইয়াই বা

যাইবে কেন? ইহার কারণ কি? হয়ত বাড়ীর লোকদের ছাড়িয়া আসিয়া তাদের জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া তাহাকে এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে! মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি বোধ করিতে থাকিলেও যতীনের সেই সদ্যনীড়ভ্রষ্টা বিরহ-বিধুরা কিশোরীর প্রতি একটু করুণাও যে মনের মধ্যে না জাগিল, তাহা নহে। সে মনে মনে বলিল, হয়ত ওঁরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করেই পাঠাচ্ছিলেন, তা না করে আমায় বল্লেই হতো। তবে আমি তো এ কথা আগেই বলেছিলুম! অনর্থক হায়রান, কতকগুলো টাকারও শ্রাদ্ধ।

হুগলী যাওয়ার কথা শুনিলেও সে সেটা খেয়াল না করিয়া চুঁচুড়ায় নিজের পিত্রালয়েই অমিয়ার ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় করিয়া সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৮

বর-কনে বিদায়ের পরই আত্মীয়-কুটুম্বগণ প্রায় সকলেই যে যার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। কেবল উমাশশীর বড় ভাজ ও ইন্দ্রনাথের ভগিনী উমাশশীর কান্নায় গলিয়া বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই। মেয়ে পাঠাইয়া দিয়া উমাশশী বড় বেশি রকমই কাঁদাকাটা করিতেছিলেন।

ইন্দ্রনাথেরও মনটা ভাল ছিল না,—বাহিরের ঘরে চুপটী করিয়া বসিয়া থাকা ভাল লাগিতেছিল না,—উপরে যাইবেন বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একখানা গাড়ি দাঁড়াইবার শব্দ হইল ও একটু ক্ষণমাত্র পরেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল যতীন্দ্র।

"এ কি—তুমি! ফিরে এলে যে?"—বলিয়াই ইন্দ্রনাথ কিছু ভীত বিস্মিত চমকিত ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন—অমিয়ার কি কোন অসুখ করিল না কি?

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"অমিয়া এখানে ফিরে এসেছে?"

ইন্দ্রনাথের মুখ সাদা হইয়া গেল—"অমিয়া এখানে ফিরে আসবে? এ কথার মানে কি যতীন?"

যতীনকে এইবার একটু বিপন্ন দেখাইল। সে উত্তর করিল—"যদি সে এখানে না এসে থাকে, তাহলে এর মানে যে কি, তা আমি নিজেও তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

ইন্দ্রনাথবাবুকে ভূতাহতের মতই দেখাইল। তিনি থর-থর করিয়া কাঁপিয়া একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তভাবে কহিয়া উঠিলেন—"কি হলো কি, কেন তুমি তাকে একলা ফেলে চলে এলে?" কোথায় গেল সে? ও যতীন! কি করলে তুমি তাকে?"

যতীন যতটুকু জানিত, সেইটুকুই সে বলিল। শুনিয়া ইন্দ্রনাথবাবু যেন ঝড়ে-ভাঙ্গা গাছের মতই হেলিয়া পড়িলেন।

"তাহলে কি হবে! কি করি এখন?"

যতীন শ্বশুরের মত অধীরতা দেখাইল না, সে স্থিরভাবে কহিল—"আপনি একবার ওঁকে ডাকুন দিকি, মা হয়ত এর কোন কারণ খুঁজে পেতে পারেন।"

তাহাই হইল। কিন্তু উমাশশী ব্যাপার শুনিয়া যেরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া দায় হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হয়ত তাকে চোরে ডাকাতে মন্দ লোকে ধরে নিয়ে গিয়ে এতক্ষণে মেরেই ফেল্লে! কি বলে তুমি তাকে অমন করে একলা ছেড়ে চলে গ্যালে। কেন মরতে আমি সঙ্গে লোক দিলুম না।"

স্বামীকে বলিলেন—"তোমারই বা কি আক্কেল যে বিয়ের কনে নিয়ে যাচ্ছে, তুলে দিতে সঙ্গে গেলে না বা একটা চাকর পাঠালে না,—হ্যাঁগা, সে ওয়েটিংরুমে বসে নেই ত?"

যতীন ঘাড় নাড়িল। তার পর বলিল—"না—সে আমি সব দেখেছি। তাছাড়া কুলি যে তাকে গাড়ি ভাড়া করে হুগলীর দিকে আসতে দেখেছে।"

উমাশশী কাঁদিয়া বলিলেন—"ঐ কুলিই যে ডাকাতদের কেউ নয়, তাই বা তোমায় কে বল্লে? সে কি না সেই মেয়ে যে নিজে গাড়ি ভাড়া করে চুপি চুপি পালিয়ে আসবে।"

ইন্দ্রনাথবাবু চিন্তাগম্ভীর মুখে মন্তব্য করিলেন—"তাও অসম্ভব নয়। আজকাল তো কত রকমই শোনা যায়।"

উমাশশী কাঁদিতে কাঁদিতে জামাইকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা সেই কুলিটা কি মুসলমান? ওরে অমিয়া মা রে! ওরে তোর কি দুর্দ্দশা হলো রে মা—" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, ইন্দ্রনাথবাবু তাঁহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন,—"করচো কি! এক্ষনি লোক জড় হয়ে যাবে যে!—"

এই সময়ে যতীন কিছু কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনারা কি তাকে তার অমতে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন? আমায় কি তার পছন্দ হয় নি?"

ইন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতে গেলেন, তাহার পূর্ব্বেই উমাশশী কান্না থামাইয়া সবেগে বলিয়া উঠিলেন—"এ কথা তুমি কেন মনে করচো যতীন! তোমায় সে খুব খুসী হয়েই বিয়ে করেছিল। বরং অনেক দূরে নিয়ে যাবে বলে আমরা ইতস্ততঃ করেছিলুম,—তোমার শ্বশুর নিজেই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে,'তোমার কি কোন আপত্তি আছে?' তাতে দিব্যি হাসিমুখেই ও জবাব দেয় যে,'না—না—না'। সে তুমি ভেবো না, তোমায় ওর খুবই পছন্দ হয়েছিল। আহা, মায়ের আমার মুখে আনন্দ যেন খেলা করে বেড়াচ্ছিল। তোমায় দেখবার আগে বরং যত সম্বন্ধ এসেছে, বিয়ে করবো না বলে হাঙ্গামা করতো।"

যতীন এতক্ষণের পর এইবার একটু অধীরতা প্রকাশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"তাহলে, ব্যাপারটা যে কি ঘটলো, আমি যদি এর একটুও কিছু বুঝতে পারচি! হয়ত এর মাঝখানে আর কেউ—আর কোন লোক—"

ইন্দ্রনাথবাবু রোষ-গম্ভীর স্বরে বাধা দিলেন—"আমার ফুলের মতন পবিত্র মেয়ের সম্বন্ধে ও ভাবে কথা বলো না যতীন! সে আমার দেবতার মতন শুদ্ধ,—"

উমাশশী অস্ফুটস্বরে পুনশ্চ কাঁদিয়া উঠিলেন—"ওরে মা আমার! কেন তোকে আমি বিয়ে দিলুম; কোথায় গেলি আমার মা?"

যতীন্দ্রনাথ ফাঁপরে পড়িয়া নত-মস্তকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁর এক দিনের সম্পর্কে সম্পর্কিত শ্বশুর-শাশুড়ীর রাগ দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। ব্যাপারটা যা দাঁড়াইয়াছে,—তাহাতে নিরপরাধেও তাহাকেই যেন অপরাধী হইতে হইয়াছিল।

এই সময় বাহিরে বাইসিকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ও টেলিগ্রাফ পিয়ন ডাকিয়া বলিল—"তার হ্যায়।"

ঘরের মধ্যেকার কয়জনেই চমকিয়া উঠিলেন ও যতীনই প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া সই দিয়া টেলিগ্রামটা লইয়া আসিল। ইন্দ্রনাথবাবুর নামেই সেটা আসিয়াছিল। সে তাঁহার হাতেই উহা প্রদান করিল।

ইন্দ্রনাথবাবু কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া সেটা পাঠ করিলেন। উমাশশী চোখ মুছিতে মুছিতে অধীর কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"কোথাকার তার? কে কি লিখেছে? অমিয়ার কোন খবর এলো কি? কোথায় আছে সে? পড়ো না কি লিখলে?"

"তুমি একটু থামলে তবে তো পড়বো" বলিয়া ক্রোধভরে ইন্দ্রনাথবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বিরক্তি-কঠিন স্বরে পড়িতে লাগিলেন—

"Have received information ab ut J's character and past life. I am upset. Don't be anxious about me."

যতীন্দ্রনাথ সবেগে বলিয়া উঠিল—"আমার চরিত্র ও গত জীবন সম্বন্ধে সংবাদ পেয়ে! কেন? আমার চরিত্রের কি অপরাধটা হলো? কি আমি করলুম?"

উমাশশী কহিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই সে পাগল হয়ে গ্যাছে!"

ইন্দ্রনাথবাবু টেলিগ্রামখানা চার-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, টুকরাগুলাকে পাকাইয়া ফেলিয়া দিয়া, ঘরটার এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত পাইচারী করিয়া আসিলেন ও তার পর স্ত্রীর সাম্‌নে আসিয়া মুখ খিঁচাইয়া—"কেমন! মেয়েদের আর লেখাপড়া শেখাবে?—পাশ করাবে না?—"ভীষণ স্বরে এই কথাটা বলিয়াই আবার ঘরটার আর এক মুড়ায় চলিয়া গেলেন। এর চেয়ে বেশি কোন কথা বলিবার মত শক্তি তাঁর মধ্যে তখন ছিল না।

উমাশশী বলিলেন—"তারটা কোথা থেকে করেছে? নৈহাটী থেকে? তাহলে যতীন! এক্ষনি তুমি একবার বাবা! নৈহাটীতেই না হয় চলে যাও,—সেখানে গেলে নিশ্চয়ই একটা কোন সন্ধান টন্ধান পাওয়া যেতে পারবে,—আর তাহলে—"

ক্রোধে ক্ষোভে ও বিরক্তিতে অধীর-প্রায় হইয়া উঠিয়া জামাতা যতীন শাশুড়ীর এই সৎযুক্তির বিরুদ্ধে নিতান্ত রূঢ়বাক্যেই প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—"আমি যাব না, আমি আপনাদের মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাতেই আর থাকতে চাই নে,—তাকে বিয়ে করে আমার যথেষ্ট সুনাম বেরিয়েছে,—আমি চল্লুম!"

জামাইএর মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্রে উমাশশীর সমস্ত দুঃখ চিন্তা ও ভয় অন্য আর একটা আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরতর আশঙ্কা ও লজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কাতর মিনতির

সহিত সাতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন—"অমন কথা বলো না যতীন! সে তোমায় প্রথম দেখেই মনে মনে তোমায় পছন্দ করেছিল; তুমিও তাকে দেখে শুনেই বিয়ে করেছ। নিশ্চয়ই কোন মন্দ লোক এর ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে,—হয়ত তোমাদের বেরুবার আগের সেই চিঠিখানাতেই এই খবর সে পেয়েছে! নিশ্চয়ই তাই! সেই জন্যেই যাবার সময় সে যেন কেমন একরকম হয়ে গেছলো! তার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। এখন আমি বুঝতে পারছি—সেই চিঠিই এই কাজ তাকে করিয়েছে।"

এই বলিয়া স্বামীর দিকে ফিরিলেন—"হ্যাঁ গা, তুমি তো জানো, মন্দ স্বভাবের উপর তার কি বিষম ঘৃণা! বিয়ের আগে সে আমাদের কতবার করেই এই কথা বলেছিল!"

ইন্দ্রনাথবাবুর মনের মধ্যে তখন ক্রোধ লজ্জায় বিমিশ্র যে বিচিত্র ভাব বর্ত্তমান, স্ত্রীর এই সাক্ষী মানাতে তাহাতে যেন স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হইল! তিনি বারুদের স্তূপের মতই ফাটিয়া পড়ার ভাবে তাহার দিকে ফিরিলেন—"গোল্লায় যাও তুমি, আর গোল্লায় যাক্ তোমার সেই পিউরিটানীক মেয়ে! বেটী লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়ে উঠেছেন! সত্যপীর ঠাকুরের মেয়ে!"

উমাশশী স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া ও সম্ভাষণ শুনিয়া একেবারে আকাট্ হইয়া রহিলেন। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কি জন্যে যে "গোল্লায়" যাইতে বাধ্য হইলেন,—এই প্রশ্নটা তাঁর মনে জাগিলেও মুখের দিক দিয়াও আসিল না। চোখে শুধু খানিক জল আসিল।

৯

অমিয়ার বিবাহের পরদিন,—রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজে,—অমিয়ার ছোট মাসি পূর্ণিমাদেবী তখনও তাঁর জপের মালা হাতে লইয়া পূজার ঘরের জানালাটীর কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। জপ সমাধা হইয়া গিয়াছিল, উঠি উঠি করিয়া তখনও উঠিয়া পড়া ঘটিয়া উঠে নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির সহিত একটু জোর বাতাসও থাকাতে, পূর্ণিমার ছোট্ট বাগানটীর গাছপালাগুলি একটু এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে। মালতি-লতাটা ফটকের মাথা ছাড়িয়া তার আসে পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। নেবুগাছের কতকগুলি পাকা নেবু—ছিঁড়িয়া পড়িয়া মাটী-মাখা হইয়া রহিয়াছে। আর তুলসী-কুঞ্জটীরও কতকটা দুর্দ্দশা ঘটাইয়া দিয়াছিল। পূর্ণিমা জানালার ভিতর দিয়া সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিলেন,—সকালবেলা পূজা পাঠ শেষ করিয়াই এইগুলিকে ঠিক করিয়া ফেলিতে যাইবে।

এমন সময় একখানা ট্যাক্সিগাড়ি আসিয়া তাঁর ফটকের সাম্‌নে দাঁড়াইল।

এমন সময় কে আসিল, বুঝিতে না পারিয়া তিনি তখন তাড়াতাড়ি মালা তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিলেন! বাড়ীতে বেশি লোকজন তো নাই। বিধবা পূর্ণিমাদেবী স্বামীর স্মৃতিভরা গৃহটীর মায়া ছাড়িতে না পারিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরও এইখানেই বাস করিতেছেন। কাছে থাকে তাঁর একটী ভাসুর-পো। ছেলেটী বি-এস্‌সি পড়ে। রাত্রি অধিক হওয়ায় সে এখন উপরের ঘরে নিদ্রা যাইতেছে। যে ঝি আছে, সেও ঘুমাইতেছে। শুধু পূর্ণিমাদেবীই একা সন্ধ্যা পূজা জপ পাঠ লইয়া জাগিয়া থাকেন,—আজও আছেন। নিদ্রাহীন শয্যাতলে পড়িয়া কেবল দুশ্চিন্তায় কাতর হওয়ার চেয়ে মনস্থির রাখিবার একান্ত উপায়রূপেই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দরজা খুলিয়া দিতেই ছুটিয়া আসিয়া একটী মেয়ে তাঁহাকে দুহাতে সবলে জড়াইয়া ধরিল। অমনি বিস্মিতা পূর্ণিমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! এ কি! অমিয়া তুই! তুই আজ এখানে কেন?" তাঁহার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল···"কি হয়েছে? কি হলো রে অমিয়া! তুই কেন এমন করে এখানে চলে এলি!"

অমিয়া মাসীকে ছাড়িয়া দিয়া সহজভাবেই জবাব দিল—"কিছুই হয়নি মাসিমা! সমস্ত পৃথিবীর আক্রমণ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার একটুখানি জায়গার দরকার হয়েছিল, তাই সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কত্যাগী তোমার কথাই মনে পড়ে গেল,—আমায় থাকতে দেবে মাসিমা?"

আকস্মিক এই অভাবনীয় সাক্ষাতের একান্ত দুশ্চিন্তা-জড়িত বিস্ময়ের আঘাত হইতে পূর্ণিমা দেবী তখনও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার বুকের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন চলিতেছিল, তাহার প্রভাবে তাঁহার গলা কথা কহিতে গিয়া স্পষ্টই কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টা করিয়া তিনি

কহিলেন "থাকো না মা! কিন্তু তোমার যে কাল বিয়ের দিন ছিল অমিয়া! কি হলো? বিয়ে কি হয়েছে? ওই না···সিঁথিতে তোমার সিঁদুর লেপা! তবে, এ কি?"

"তবে এস মাসিমা! সব কথা না শুনলে তুমি কিছুতেই স্থির হতে পারবে না। চল, একটা ঘরে চল। আমিও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারচি না, একটু শুয়ে পড়বো।"

স্তব্ধ নির্জ্জন ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া উভয়ে একটা জনহীন কক্ষের মধ্যে আসিয়া বসিল। সে ঘরে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা বিছানা পাতা ছিল। অমিয়া আসিয়া তার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। পূর্ণিমা দেবী উৎসুক ও উদ্বিগ্নচিত্তে তার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া গভীর ভাবে একটা শ্বাস টানিয়া লইলেন,—এ মেয়ের ভাব-ভক্তি দেখিয়া তাঁর যেন প্রাণ উড়িয়া যাইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"হরি! আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে ভাল লাগে না বলে যে ওর বিয়েতে আমি যাই নি, এ কি তারই শোধ আমায় দিতে ওকে এমন অদ্ভুত ভাবে আমার কাছে এনে দিলে!···"

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন—"অমিয়া!"

"এই যে মাসিমা! এই দেখ—এই চিঠিখানা পড়ে দেখ,—দেখে তার পর আমার বিচার করো। এই চিঠি আমি বাড়ী থেকে বেরুবার সময় পাই। পেয়ে সারাপথ ধরে কেবল ভেবেছি,—এই রাক্ষসের হাত থেকে কেমন করে মুক্ত হবো! মাকে কিছু বলিনি,—জানতুম, বলে কোনই ফল নেই। মা জানেন, মেয়েরা পুরুষের পদসেবার অধিকার মাত্র নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্মাতে এসেছে। তাদের ছাগল তারা যদি ল্যাজের দিক দিয়ে কাটে, আপত্তি করবার কি আছে? কিন্তু না, আমি তা' সইতে পারবো না। কুচরিত্র মাতাল স্বামীর স্ত্রী হয়ে চিরকাল ধরে জ্বলে মরবার সাধ আমার মোটেই নেই! তার চেয়ে আমি একবার মাত্র মর্‌তে রাজী আছি। মরবোই ভেবেছিলুম, হঠাৎ বাঁচতে সাধ গেল,··· আর তোমার কথা মনে পড়লো।···তাই চলে এলুম···"

পূর্ণিমাদেবী চমকিয়া সভয়ে অমিয়ার মাথায় হাত দিয়া "হরি দীনবন্ধু!" উচ্চারণ পূর্ব্বক, সস্নেহে উত্তর করিলেন—"সে বেশ করেছিস মা!···কিন্তু এমন না করে তুই···"

অমিয়া তাঁহাকে মাঝখানেই বাধা দিল—"না মাসিমা! তা বলো না, এ ছাড়া আমার পথ ছিল না। সেই চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে সুদূর রাজ্যে চলে গিয়ে আর আমার মরণ ভিন্ন মুক্তির কি উপায় ছিল?"

এ যুক্তি অকাট্য! পূর্ণিমা চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"কিন্তু মা! হিন্দুর ঘরের মেয়ে তুমি, স্বামীর পূর্ব্ব চরিত্রের খুঁৎ নিয়ে যদি জন্মের মতন স্বামীর সঙ্গে কাটা-ছেঁড়া করে ফেলো, তাহলে তোমার এ জন্মটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে! লোকে এতে তোমাকেই নিন্দে করবে। ছেলে মানুষ এখন বুঝতে পারচো না,—মনের ঝোঁকে এত-বড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে চিরজীবন ধরেই হয় ত অনুতাপ করে খুন হবে।"

এ কথা শুনিয়া অমিয়া উঠিয়া বসিল। তার সমস্ত অবসাদ যেন এক মুহূর্ত্তে চলিয়া গেল। সে সবেগে বলিয়া উঠিল—"আর যা বলো তা বলো মাসিমা,—অন্যায় কাজ এটাকে তুমি বলো না! তুমি কি নিজে জানো না যে, আমি কিছু অন্যায় করি নি! আমাদের দেশের সতী-স্ত্রীরা আমারও খুব শ্রদ্ধার পাত্রী, কিন্তু তাঁরা নিজেরা খুব বড় হলেও তাঁদের স্বামীদের তাঁরা নেহাৎ যে ছোট করে রাখেন, সে পাপ তাঁদের নিশ্চয়ই বিধাতার দরবারে ক্ষমার্হ হয় না। তা যদি হতো, তাহলে পরলোকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ইহলোকেই একটু প্রকাশ্যভাবে তাঁরা তাঁদের অতবড় মহত্ত্বের একটুখানি ফল লাভ করতে পারতেন। তা' না হয়ে চিরদিন ধরে দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দান করে লাথি জুতো ভিন্ন তাঁদের আর কি জুটেছে? কতকগুলি রোগগ্রস্ত নীতিজ্ঞানশূন্য সন্তান নিয়ে দুঃখকষ্টে অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত হয়ে পলে পলেই মরার বাড়া হয়ে তাঁদের সহিষ্ণুতার পুরস্কার তাঁদের লাভ করে যেতে হয়। এই পাপের অত্যাচারের প্রশ্রয় দানই যদি সতীধর্ম্ম হতো, তাহলে এরকমটা ঘটতো কি? তার পর ঐ সমস্ত মন্দ লোকদের সন্তান হয়ে মন্দ লোকের সংখ্যা, রুগ্নর সংখ্যা বর্দ্ধিত করা, সেও কি একটা কম পাপ না কি? না মাসিমা! লোকে আমার নিন্দা করে করুক, ওরকম জীবন যাপন করতে হলে, আমার নিজের বিবেকই আমার এই সব লোকদের চাইতে ঢের বেশি বেশি নিন্দা করতো। নিজের ওপরে আমার ঘৃণার আর অন্ত থাকতো না। সেটা থেকে তো বেঁচে থাকবো।"

"আকুল হইয়া বনে বনে ঘুরি—
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম—" রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

পূর্ণিমা বোনঝির যুক্তির সহিত পারিয়া না উঠিয়া শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি জানি মা !…"

অমিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"কেমন করে জানবে মাসিমা ! মন্দ লোকের হাতে তো তুমি পড়ো নি। তুমি জানবে কি করে, কি তার জ্বালা ! মেসমশাই আমার খুবই ভাল ছিলেন, আজও তাঁর স্মৃতিতে তোমার বুক ভরা। তাঁর ছবি, তাঁর খড়ম তুমি নিত্য পূজা করো দেখে গেছি। তুমিই বল দেখি, এ যদি তুমি না পারতে, তাহলে তোমার আজ কি হতো ?"

পূর্ণিমা পুনশ্চ যুক্তিহারা হইয়া গিয়া ছাড়াছাড়া ভাবে আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু চিরদিন ধরে হিন্দু সতীর এই নির্ব্বিচার আত্মসমর্পণের জন্য তার গৌরবের অন্ত নেই। স্বামীকে দেবতা ভেবেই স্ত্রী তার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে যে তৃপ্তি যে আনন্দ লাভ করতো, এত যুক্তি-তর্ক-বিচারে কি সেটুকু আর পাবে ? দেখ—শাস্ত্রে আছে, কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর অসদিচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সতী স্ত্রী তাকে নিজে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল—"

অমিয়া তীব্র কঠিন কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"সেই দিনই সে তার সমস্ত জাতের সর্ব্বনাশ করেছিল মাসিমা ! সেই দিনেই সে সব মেয়েদের মেরে রেখে গ্যাছে ! অতবড় নির্লজ্জ পাষণ্ড স্বামীর পাশবিকতাকে সমর্থন করে সে না হয় নিজের সমস্ত ইজ্জতকে নষ্ট হতে দিলে, দিক, কিন্তু সেই অভাগা স্বামীটারই বা এতে কি উপকার সে হতে দিলে বল ত ? মহানির্ব্বাণতন্ত্রের কতকগুলি শ্লোক আমি পড়েছিলুম। তাতে বলেছে—

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাৎদুদ্ধরতেবিলাৎ।

তদ্বদ্‌ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে।

সাপুড়ে যেমন সাপকে জোর করে গর্ত্ত থেকে টেনে বার করে আনে, তেমনি করে স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে তার সহিত আনন্দে যাপন করে। এতে তো কই বল্লে না যে, স্বামীর সঙ্গে গর্ত্তের ভিতর সর্পধর্ম্মী হয়ে দুজনে বাস করে। না, মাসিমা ! সতীধর্ম্ম একে বলে না যে, অসৎ স্বামীকে তার পাপে প্রশ্রয় দিয়েও তার সঙ্গে ঘর করা। এই করে করেই এ দেশের মেয়েরা পুরুষদের এতখানি উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে,—এ কি তুমিই 'না' বলতে পার ?"

বাস্তবিকই পূর্ণিমা দেবী ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। অমিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার তাহার সমর্থন করিতে গেলেও ভীষণ সামাজিক বিপ্লব। অসতী স্ত্রী লইয়া স্বামী ঘর করিতে নারাজ। বহু স্থলে নিতান্ত বাল্য-পাপের জন্য চিরজীবনের মতই অভাগিনী স্ত্রী স্বামীত্যক্তা হইয়া জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। তার সারা জীবনের প্রায়শ্চিত্তে সে পাপের সংশোধন ঘটে না। অপর পক্ষে নষ্ট-চরিত্র একান্ত অসৎ স্বামীর সকল অত্যাচার স্ত্রী যদি নির্ব্বিবাদে না সহিতে চাহে, তাহা হইলে সমাজও তাহার প্রতি খাঁড়া উঁচাইয়া খাড়া হয়। অন্যে ত ইহার প্রতিকার-চেষ্টা করেই না, সে নিজে করিতে গেলেও দোষী হয়। অমিয়া যাহা বলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। তথাপি, লোক-নিন্দাকেও তো তুচ্ছ করা যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কহিলেন—"কিন্তু অমিয়া ! সে যখন মন্দ ছিল, তখন সে ত তোমায় জানতো না। তুমি এখন চেষ্টা করে তাকে ভাল করে নিতেও তো পার ! আমার মনে হয়, আমার স্বামীকে যদি আমি কোন রকমে ফিরিয়ে পেতুম, তিনি যদি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পাপীও হতেন, আমি ক্ষমা করতে পারতুম। স্বামী হারানই সবচেয়ে কষ্ট,—তার কাছে আর কোন কষ্ট, কষ্টই নয়।"

অমিয়া একটুখানি সকরুণ হাসি হাসিল—"মাসিমা ! ওটা তুমি ভাবের মুখে বলচো, আর অভিজ্ঞতা নেই বলেই বলচো। আর ঐ যে বল্লে ভাল করে নিতে, তা' মন্দকে ভাল করা কি বড় সোজা কথা ? কখন কি কেউ তা পারে ? তার পর সম্পূর্ণরূপে তার হাতে গিয়ে পড়লে তখন কি আর ভাল করবার কোন পথ থাকে ? তাছাড়া, পাপের আর ভূত ভবিষ্যৎ নেই,—যে পুরনো পাপী সে কি সম্পূর্ণরূপে তার অভ্যাসকে ছাড়তে পারে ? সুযোগ পেলেই আবার কুপ্রবৃত্তি জোর করে, যদি না ভিতর থেকে নিজেই অনুতপ্ত হয়। আরও দেখ, পরে ভাল হলেও তার চরিত্রের মন্দটা তার ছেলেদের মধ্যে যে দেখা দেবে না, তা তো বলা যায় না।"

এবার পূর্ণিমা দেবী সহজেই বলিলেন—"তা কি বলা যায় ! কত মন্দ লোকের ভাল ছেলে, আবার কত ভাল লোকেরও মন্দ ছেলে হয় যে।—"

অমিয়া কহিল—"খবর নিলেই জানতে পারবে যে, ঐ ভাল লোকের শ্বশুরবাড়ীর দিকটা মোটেই ভাল নয়। মন্দ

লোকের বেলাও তার পিতৃবংশ বা মাতৃবংশে বিশেষ ভাল লোকের সংস্পর্শ দেখতে পাবে। শুধু ভাল থেকে মন্দ বা শুধু মন্দ থেকে ভাল হয় না।"

হার মানিয়া পূর্ণিমা কহিলেন—"আচ্ছা যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। এখন শুধু ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠির উপর নির্ভর করে তো এত বড় কাণ্ডটা বাধালে হবে না। আমি ভোরে উঠেই মৌলীকে দিয়ে একটা তার করে দেওয়াবো। জামাই নিজেই যদি একবার এখানে আসেন, সেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হবে। তাকেও তো একটা জবাবদিহি করতে দিতে হবে আমাদের।"

অমিয়া মাসির কাছে সভয়ে সরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল—"আমায় জোর করে নিয়ে যেতে দেবে না বলো? আমি এইটুকু আশা করে শুধু তোমার কাছে এসেছি। না হলে মার কাছেই যেতুম।"

পূর্ণিমা তাঁহার গায়ে জড়ানো ভীত ত্রস্ত পাখীটির মত ভয়ার্ত্ত বালিকাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া প্রতিজ্ঞা-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"যদি তুমি নিজে যেতে না চাও, আমি নিয়ে যেতে দোব না, কথা দিলুম।"

১০

টেলিগ্রাম ইন্দ্রনাথ বাবুকে পাঠানো হইল, এবং উমাশশীকে পত্র লেখা হইল। পরদিন পত্রোত্তর আসিল। উমাশশী পূর্ণিমার পত্রের উত্তর দিয়া সেই সঙ্গে অমিয়াকেও লিখিয়াছেন।—

কল্যাণবরেষু

তোমায় যে কি বলিয়া পত্র লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না! এমন মেয়ে তোমাকে আমি গর্ভে ধরেছিলাম যে, লোক-সমাজে আমার মুখ দেখানই দায় হইয়া উঠিবে। এ কথা আর ক'দিন চাপা থাকিবে! তার পর লজ্জায় অপমানে তোমার বাপ পাগল হইয়া যাইবেন, আর আমি আত্মঘাতী হইব। তোমার বোনেদের কোন ভদ্রলোকেই আর বিবাহ করিতে ভরসা করিবে না। কে এমন নির্লজ্জ আছে যে, স্ত্রীর হাতে এমন করিয়া অপমানিত হইতে চাহিবে?

তুমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী হইয়াছ; নির্ব্বোধ বা শিশু নও। হিন্দু বিবাহ যে ফিরাইয়া লওয়া যায় না, তাহা ভালই জানো। আর জানো, তোমার স্বামী ইচ্ছা করিলেই কালই আবার আর একজনকে বিবাহ করিতে পারেন। তবে জানিয়া শুনিয়া নিজে জন্মের মতন দুর্ভাগা হইবার ব্যবস্থা করিতেছ কেন? এখনও মাথা বুদ্ধি স্থির করিয়া ভালয় ভালয় ফিরিয়া এস। হয়ত এখনও যতীনকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করাইতে পারিব। যত দেরি হইবে, তোমার ভবিষ্যৎ ততই বেশি সঙ্কটাপন্ন হইতে থাকিবে, ইহা নিশ্চিত জানিও। তখন তোমার মা বাপ ছাড়িয়া স্বর্গের দেবতারা নামিয়া আসিলেও আর তোমার অদৃষ্ট ফিরাইতে পারিবেন না। চিরদিনটা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেই জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। হয়ত তুমি বলিবে—লেখাপড়া শিখিয়াছ, চাকরী করিয়া খাইবে। চাকরী ত ভারি,—বড় জোর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় টিচারী করিবে, এই বৈ ত নয়? তাই বা কত চাকরী কে লইয়া বসিয়া আছে!

তার চেয়ে অমিয়া, এখনও কথা শোন,—নিজের নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির জন্য অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও। সে লোক ভালই, এখনও হয়ত ক্ষমা করিতে পারে। তোমার বাপ বলেছেন,—যতীন তোমায় ক্ষমা না করিলে তিনিও করিবেন না, তোমার মুখ জীবনে আর কখন দেখিবেন না, এই বুঝিয়া কাজ করিও। —তোমার মা

চিঠি পড়িয়া অমিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া রহিল। এ চিঠির প্রতি বর্ণে তার মায়ের নয়, বাপের প্রচণ্ড শাসন মাত্র প্রকটিত হইতেছে। যে প্রতারক মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহার নারীজন্মটাকে বৃথা করিয়া দিল,—সমস্ত সহানুভূতি সেই তাহারই উপরে! আর সেই প্রবঞ্চকের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতেছে বলিয়া সে-ই হইল মহা অপরাধী! সমাজ আমাদের এই রকমই বটে! সে কারণ দেখে না, দেখে কার্য্য! কিন্তু তার ফল দেখে না! ভগবানের নৈষ্কল্যের বাণী এই রকম করিয়াই হয়ত পালন করে।

পূর্ণিমা আসিয়া চিঠি পড়িলেন ও বলিলেন—"তাহলে কি করবে? দেখচো ত তোমার বাবা কি রকম রাগ করেছেন?"

শুষ্ককণ্ঠে অমিয়া উত্তর করিল—"বাবা যে রাগ করবেন, সে ত আমি জানতুমই। তবে আমার মাকে দিয়ে যে সেটা প্রকাশ করবেন, সেটা আমি ভাবিনি। কিন্তু এইটেই আমাদের দেশের পক্ষে স্বাভাবিক! মায়েরাও তো মেয়েদের এই শিক্ষা পরস্পর দিয়ে এসেছেন। যতই লাঞ্ছনা করুক, স্বামীর পাদোদক পান না করে জলগ্রহণ করবে না, কারণ, পতি পরম গুরু।"

পূর্ণিমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"ছি! অমিয়া! এক জনের দোষে তুমি জাতিগত ভাবে এরকম বলো না।"

অমিয়া কিছু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল—"তা তো আমি বলি নি মাসিমা! তবে আমি বলছি, আত্মসম্মান জিনিষটাকে কি এমন করে জড় মেরে দিতে হয়? যেমন পুরুষরা অসতী বর্জ্জন করে চলে, মেয়েদের বেলাও সেরকম বিধান থাকা কি অসঙ্গত?"

পূর্ণিমা কহিলেন—"পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মন ক্ষমা ও স্নেহপ্রবণ; সেই জন্যই তারা সইতে পারে।"

অমিয়া দুঃখের ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, "বেশ ত, যাদের তেমন ভাল মন, তারা সহ্য করুক; যাদের তা' নয়, তাদের প্রতি জোর করবার দরকার কি?"

মায়ের পত্রের উত্তরে সে তার সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিল। শেষে লিখিল, "পাশের বাড়ীতে যে অভিনয় নিত্য দেখিতেছ, তা' দেখিয়াও তোমাদের মাতাল কুচরিত্রের হাতে মেয়ে দিতে ভয় হয় না মা! তাই যদি না হয়, তবে মেয়ে মরিলেও হয় ত দুঃখ না হইতেও পারে। মনে করিও—তোমার অমিয়া মরিয়া গিয়াছে। জীবন্মৃত থাকিয়া হীনের সহিত হীন হওয়ার চেয়ে, সে দুঃখও আমার সহ্য হইবে! আমি কত দিন হিতু-অনুজাকে তাদের অত্যাচারী বাপের মৃত্যুকামনা করিতে শুনিয়াছি। শান্ত সহিষ্ণু মল্লিকদের সেজ বউকে বলিতে শুনিয়াছি—'এমন স্বামী থাকার চেয়ে বিধবা হওয়া ভাল!' না, মা! আমার আর ঐ দেখা দৃশ্যের পুনরভিনয়ে প্রবৃত্তি নাই। এখন আমি একটা মানুষ—ত্রিশ চল্লিশ ছেড়ে কুড়িটা টাকা হলেও আমার চলে যাবে। না হয়, তাঁত বুনিতে শিখিব, সুতা কাটিব। আমার শতকোটী প্রণাম তোমরা জানিও। আর যদি পার, তবে আমার এই মুখরতার জন্য আমায় ক্ষমা করিও।"

অমিয়া সেদিন যে চিঠি পাইয়াছিল তাহা এই—

মহাশয়া! নিতান্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে, অর্থলোভে আপনার মা বাপ যাহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন, তিনি মনুষ্যনামের নিতান্তই অযোগ্য! আপনার মত বিদুষী পুণ্যবতী নারীর পবিত্র প্রেমের তিনি একেবারেই উপযুক্ত পাত্র নহেন। অধিক আর কি লিখিব, তিনি মদ্যপ ও অতিশয় কুচরিত্র। তার চরিত্রহীনতার জন্যই এতদিন বিবাহ হয় নাই। পরিচিত কেহই অতবড় অপাত্রে কন্যাদানে সম্মত হইতে পারে কি? সেইজন্যই এত তাড়াতাড়ি করিয়া এখানে নিজে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া গেল, ইহাতেই ব্যাপারটা বুঝুন! রাওলপিণ্ডিতে এই লোকটীর যেরূপ সুনাম, তাহা ষ্টেশনে পদার্পণ করিলেই জানিতে পারিবেন। ইহাঁর একটী বাইজী পোষ্য আছে, তাহার সহিত বনাইয়া চলিতে পারিবেন ত? কর্ত্তব্যের খাতিরে অপ্রিয় সত্য প্রচার করিতে হইল—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হ্যাঁ তবে, ঐশ্বর্য্য ধন এই লোকটীর প্রচুর আছে। গহনার বাক্সটী পাইয়াছেন কি? অন্ততঃ দশ পনের হাজার টাকার গহনা, মোটর গাড়িও চার-পাঁচ-খানা আছে। স্বামী না পান, ধনসুখ পাইবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি না বাইজী সুন্দরীর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পিত হয়। তবে ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে দিয়া বিষয়টা নিজের নামে লিখাইয়া লইতে পারেন।

কোন হিতৈষী।

এই চিঠির নকল পূর্ণিমাদেবী তাঁর বোনকে দিতে চাহিলে অমিয়া বলিল, "এবারটাও থাক। তাঁরা যদি দেখতে চান, তখন পাঠাবো। দেখা দরকার বলে তো তাঁরা মনেও করেন নি! কিন্তু মাসিমা! তোমার কি মত?"

পূর্ণিমা কহিলেন—"আমি আগে তোমার স্বামীর মুখে এর উত্তর শুনতে চাই, তার পর মত দোব। তা'ছাড়া রাওল-পিণ্ডিতে আমার একটী ভাগনে আছে। নিজে সে অতি সৎ। তাকেও আমি লিখবো। তারা অনেক দিনের বাসিন্দে। সে নিশ্চয়ই ঠিক খবর দেবে। আজই লিখে দিচ্চি।"

১১

আকাশে মেঘ করিয়া থাকিয়া দিনটাকে সাঁ্যৎসেঁতে করিয়া রাখিয়াছিল। বৃষ্টি নাই, রৌদ্র নাই, এতটুকু হাওয়াও নাই। যেন একটা বিরাট দুশ্চিন্তার ভারে স্তব্ধ থমথম করিতেছে—এমনি একখানা নিরানন্দ মুখ মেলিয়া সে চুপ করিয়া তাকাইয়া পড়িয়া আছে। না আছে তাহাতে একটু হাসি, না আছে কান্নার লেশ। শুধু জমাট ক্রন্দনের রুদ্ধ চাপ বুকে ভরিয়া লইয়া বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে।

অমিয়ার মনের ভিতরটাকে বাহ্য প্রকৃতির এই নিরানন্দতা

যেন আরও বেশি করিয়াই চাপিয়া ধরিয়াছিল। মন তার যেন নানারকম চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই চিন্তা-জর্জ্জরিত চিত্ত তাহার যেন বিদ্রোহের তাপে তাতিয়া রহিয়াছিল। নিজের সমস্ত অবস্থাটা স্মরণে আসিলেই, লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে রাগে তাহার মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যে সুখের কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সে তাহাকে লইয়া কত মতেই গঠিত করিয়াছিল, যাহাকে সে পূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্তে দেবতার দান বলিয়া দেব-নির্ম্মাল্যের মত মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, সেই বিশ্বাসের মূল্য সে কি, এম্‌নি করিয়াই লাভ করিল? এই চরিত্রহীন লঘুচেতা, যে একটা ঘৃণ্যা নারী লইয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাহারই সঙ্গে তাহাকে ইহজীবন তো বটেই, আবার বুঝি পরকালেরও সুখদুঃখের আশা কল্পনার সকল সম্বন্ধই স্থাপন করিতে হইবে! হীন-সঙ্গে অভ্যস্ত সেই ব্যক্তি—সে কি তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে? নারীকে যে বিলাসের পুত্তলি-রূপে পাইয়াছে, সে কি তাকে আর দেবতার অংশ-সম্ভূতারূপে সম্মানের চক্ষে দেখিবে?

বিশেষতঃ, মত্তপ যে, তার মধ্যে নিজেরই মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে, সে না কি অন্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ! আর এই লোকের মধ্য দিয়া তাহাকে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া লইতে হইবে! উঃ! কি বিড়ম্বনার সে জীবন! না—না, অমিয়া তাহা পারিবে না. সে জীবন বহন করা তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব! আর কেনই বা? নারীজীবন কি এতই তুচ্ছ যে, একজন হীনচরিত্র মত্তপের খেয়ালের খেলানা না হইতে পারিলেই তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল! সে কুমারীর মত থাকিয়া দেশের কাজে দশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবে! বিবাহ তো কোন দিনই তার ঈপ্সিত ছিল না, হয়ত তাকে কোন মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেই—অদৃষ্টের এই অভিযান!

পূর্ণিমাদেবী তাঁর স্বাভাবিক ধীরপদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—"অমিয়া, তোমার বাবা তার করেছেন যে, তোমার স্বামী একবার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চান। তিনি হয়ত এক্ষনি এসে পৌছবেন, তুমি তৈরি হয়ে থেকো।"

এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র অমিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—"মাসিমা! আমায় জোর করে নিয়ে যেতে আসচে না ত'? তাহলে কি হবে মাসিমা!"

পূর্ণিমাদেবী সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক আশ্বাস দিবার ভাবে ধীর কণ্ঠে কহিলেন—"তা কি পারে মা? কেন ভয় পাচ্চো? সে কি বলতে চায়, সেটাও তো শুনতে হবে!"

"কিন্তু যদি জোর করে ত তুমি কি করবে? ঐ বুঝি মাসিমা! এলো!"

সদর দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। একটু পরেই উৎকর্ণ মাসি-বোনঝির কাণে একটা জুতা পায়ের মস্‌মস্ শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিল। অমনি অমিয়া ছুটিয়া আসিয়া পূর্ণিমাদেবীকে জড়াইয়া ধরিল—"কি হবে মাসিমা! মাসিমা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমায় এই রাক্ষসের সঙ্গে পাঠিও না।"

পূর্ণিমা দৃঢ়-হস্তে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শান্ত অথচ স্থির স্বরেই উত্তর দিলেন—"আমি তো তোমায় আগেই কথা দিয়েছি।"

এদিকে সেই জুতা পায়ের শব্দটা ক্রমশই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—জানা যাইতে লাগিল। সহসা পরিচিত কণ্ঠ হইতে একটা স্বর শুনিতে পাওয়া গেল—"কই, এঁরা কোথায়?"

অমনি অমিয়া নিজেরও অজ্ঞাতসারে সহসা খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, আর বুকের মধ্যে ভয়ে সংশয়ে-যেন ধপাধপ্ ধপাধপ্ করিয়া ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল। একটা বিষম মুহূর্ত্ত যে তার সাম্‌নে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল।

ঘরে আসিয়া ঢুকিল যতীন। তার মুখ স্তব্ধ গম্ভীর, বিরক্তির চিহ্নে সুস্পষ্টই চিহ্নিত।

পূর্ণিমাদেবী মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইতেই, তাঁর মুখ দিয়া একটা আশ্চর্য্যসূচক ধ্বনি নির্গত হইয়া গেল—"এ কি! ভুলু তুই? তুই কবে এলি রে? আমি যে তোকে এই আজই চিঠি লিখলুম।"

যতীন পূর্ণিমার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া উত্তর করিল—"কেন মামিমা! আমার শ্বশুর তো তোমায় তার দিয়েছিলেন যে আমি আসচি! তুমি কি পাও নি?"

অতিমাত্র বিস্মিত পূর্ণিমাদেবী কহিয়া উঠিলেন—"তোর শ্বশুর! তুই তো বিয়েই করিস্ নি, তা শ্বশুর তোর

কোত্থেকে এলো শুনি! ওঃ—আচ্ছা! হ্যাঁ রে! তাই কি! তাহলে কি তুই-ই—"

যতীন একবার তাহাদের হইতে অদূরবর্ত্তিনী আনতমুখী অমিয়ার পাথরের মত কঠিন ও তেমনি ভাবলেশ শূন্য মুখের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার হতবুদ্ধি-প্রায় মাতুলানীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—"হ্যাঁ মামি মা! আমিই সেই অভাগা!" বলিয়া সে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল; কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ একটু বিদ্রূপের হাসিকেও সে যেন সযত্নে গোপন করিয়া লইল বলিয়াই পূর্ণিমার মনে ঈষৎ সন্দেহ জন্মিল।

তখন যেন শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় রুদ্ধ কণ্ঠকে সবলে দমন করিয়া লইয়া পূর্ণিমাদেবী বলিতে গেলেন—"তবে এসব কি ব্যাপার ভুলু! স্বর্গ থেকে দেবতা এসে সাক্ষ্য দিলেও যে আমি তা তোমার সম্বন্ধে—"

"মামিমা! যখন এসে পড়েছি, তখন ধীরে-সুস্থে সব কথাই হতে পারবে; তোমার হাতেই আমার বিচারের ভার আমি তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপাততঃ দয়া করে আমার লাগেজগুলোর কোন উপায় করিয়ে দিয়ে এস তো মা! ওরই সঙ্গে এঁর এবং আমার মায়ের সমস্ত গহনা-গুলোও আছে। তুমি তো জানো—কত সাধ করে তিনি সেগুলি তাঁর পুত্রবধূর জন্য রেখে গেছেন!"

পূর্ণিমার মনটা দ্বিধার মধ্যে দোল খাইতে থাকিলেও, তাঁর মনের উপর হইতে সহসা যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গিয়াছিল। এই ভুলু, তাঁর ভাগিনা ভুলু, একে যে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতিবিম্ব বলিয়াই জানেন। ইহাকে যে তাঁহারই পরে তিনি সৎ বলিয়া, মহৎ ভাবিয়া, শ্রদ্ধা করেন। সেই স্বার্থত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত সুচরিত্র ছেলের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ! নাঃ! নিশ্চয়ই এ তার কোন শত্রু-পক্ষীয়ের কাজ। কিন্তু অমন মানুষের এত বড় মহা শত্রু থাকিতে পারে! মেয়েটা যদি পলাইয়া না আসিয়া সেদিন ঘৃণায় দুঃখে মরিয়াই যাইত!

প্রকাশ্যে তিনি শুধু এইটুকু বলিলেন—"জানি বই কি! আমিই যে কতবার তাঁর ফরমাসি গহনা গড়িয়ে দিয়েছি! আচ্ছা, আমি তাহলে সব তুলিয়ে রেখে আসছি"—বলিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অমিয়ার সম্বন্ধে যে কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইবার আছে, সে কথাটা তাঁর স্মরণেও আসিল না। মনের ভিতরটা তাঁর এখন শুদ্ধ একটা নিছক বিস্ময়ের বিহ্বলতায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দুশ্চিন্তাটা এর ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়া যেন সরিয়া পড়িয়াছিল।

১২

কিন্তু অমিয়া তার মাসিমাকে এই ভাবে তাহাকে ইহার সহিত একা রাখিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া খুব নিশ্চিন্ত ছিল না। সেও মাসিমার সঙ্গে সঙ্গেই এঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইবে ভাবিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইল, ঠিক দরজার সাম্‌নেই দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে চাহিয়া আছে। আর সেদিকে অগ্রসর হইবার সাহস তার মনের মধ্যে দেখা দিল না, বরং সে পিছন দিকেই যতটা পারিল সরিয়া গেল; এবং উহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উত্তরে সেও তেম্‌নি সহজ কঠিন নেত্রে উহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে গেল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরকার অস্থির আলোড়নে তার চোখের দৃষ্টি এম্‌নি এলোমেলো হইয়া পড়িল যে, সে অতবড় জলজ্যান্ত মানুষটাকেও বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছিল না। যতীন্দ্রনাথ স্থির সহিষ্ণুভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে এবার তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা কহিল। অনুত্তেজিত সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি তাহলে একেবারেই কোন আশা নেই অমিয়া?"

অমিয়া এই প্রশ্নে একান্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিলেও, সঙ্গে সঙ্গেই তার এতক্ষণকার অবসন্নতাটা এক মুহূর্ত্তেই যেন আহত হইয়া সরিয়া গেল। সে গভীর বলে রুদ্ধপ্রায় শ্বাসক্রিয়াকে দমনে আনিয়া উর্দ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল—"না—না, একেবারেই না,—আমায় আর ওসব কথা বলবেন না। আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপেই ঠিক করে ফেলেছি।"

অমিয়ার মতন নির্ভীক, জেদী, একগুঁয়ে মেয়ে তাহার সান্নিধ্য প্রাপ্তেই যে ভয়ে শুকাইয়া গুটাইয়া কোণঠাসা হইয়া গিয়াছিল, সে দৃশ্যটা হয়ত যতীনের পুরুষ-প্রকৃতিকে একটু-খানি বেশ কৌতুক প্রদানও করিয়া থাকিবে; কিন্তু সেই ভীত জড়িত মূর্ত্তির মধ্য হইতে যখন স্বর বাহির হইয়া আসিল, তাহা যেন বজ্র দিয়া গড়া দুইটা তীক্ষ্ণ তীরের ফলা! যতীন্দ্রনাথ একটু বিস্ময়ের সহিত সেই খাটের সঙ্গে মিশিয়া

দাঁড়ানো ক্ষুদ্রকায়া নারীমূর্ত্তিটিকে স্থির দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর ঈষৎ নম্রকণ্ঠে কহিল—"অমন করে দাঁড়িয়ে থাকা কেন, এদিকে এসে বসো না। এ বিষয়ে আমাদের একটু কথাবার্ত্তা কওয়াও তো দরকার!"

এই প্রস্তাব শ্রুতমাত্রেই অমিয়া সভয়ে একটা অর্দ্ধব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল—"মাসিমা!"—তার পর সে আরও দু পা পিছাইয়া গিয়া ঘরের দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল। তার মধ্যের একজন ভীরু দুর্ব্বল নারীত্ব—সে এই সবল দৃঢ়কায় এবং তাহার পরিণেতা পুরুষের সান্নিধ্যকে অত্যন্ত ভয়ের ও সন্দেহের সহিত দেখিয়া ক্রমাগতই পিছু হটিতেছিল; আর একজন—সে মানুষের মধ্যবর্ত্তী, তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তার জমাটবাঁধা শক্তিরাশি—সে নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তায়র সর্ব্বক্ষমতায় অটুট সাহসে নির্ভীক বীরত্বে তার প্রবল আততায়ীর সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় নাই! এই দুইজন দুই প্রকারের মানুষ তার মধ্যে একত্র কার্য্য করিতেছিল বলিয়া, বাহিরে তাহাকে যতই অসহায় মনে হইতেছিল, ভিতর হইতেও আবার ততই কঠিন উত্তরও বাহির হইতে লাগিল।

যতীন তার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হয়ত হাসিল, কিন্তু বাহিরে খুব সহজ দয়ার্দ্র কণ্ঠেই কহিল—"ভয় করো না, ভয়ের কিছুই নেই। আচ্ছা, আমি তাহলে এই সিন্দুকটার উপরেই বসি। এখন আমার যা বলবার আছে বলি শোন। তুমি কার কাছ থেকে কি চিঠি পেয়ে আমায় এমন করে ত্যাগ করে যে পালিয়ে এলে, এর ফলে আমি যদি তোমায় কখন না নিই, যদি আবার বিয়ে করি, তখন তুমি আমায় আর দোষ দিতে পারবে না কিন্তু।"

এই ভয়ানক লোকটাকে নিজের অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত দেখিয়া অমিয়া যতখানি ভয় পাইয়াছিল, ইহার মুখের এই একটা কথাতেই সেটা যেন এক মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। এ' তবে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে আসে নাই, মাত্র নিজের সাফাই গাইতে আসিয়াছে! এই লোককেই সে ঈশ্বর-প্রেরিত বোধে কি আগ্রহেই—যাক্, কিন্তু এবার ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন! ভাগ্যে সময় থাকিতে সেই চিঠিখানা সে পাইয়াছিল! নতুবা ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইতেও বিলম্ব ঘটিত।

স্বামীর প্রশ্নোত্তরে সগর্ব্ব দৃষ্টি সে তাহার মুখের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া অকুণ্ঠস্বরে উত্তর করিল—"সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকবেন—জন্মে কখন আমার নামও আপনি আর শুনতে পাবেন না। এখন অনুগ্রহ করে একটু পথ দিন, আমি যাই।"

এই বলিয়া সে দৃঢ়পদে একটুখানি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, তার মুখের শ্বেত-বিবর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া, উত্তেজনায় তাহা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মনের বলের সহিত শরীরেও এখন তার খানিকটা বল দেখা দিয়াছে।

যতীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। পথ না ছাড়িয়া বরং পা দুইটা আরও একটুখানি সামনের দিকে মেলিয়া দিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সব্যঙ্গ হাস্যে সে কহিল—"তবে আমিও একটা কথা বলি অমিয়া! মন্দ হলেও আমি তা বলে এত বেশি খারাপ নই যে, তোমার গায়ে কোন দিন হাত-টাত তুলবো! তাছাড়া টাকা-কড়ি যদি উড়িয়ে দিই বলে ভয় করো, তা হলে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি তোমার নামে না হয় লিখে দিতেও রাজী আছি। তুমি যদি আমায় ত্যাগ করো, তাতে দুদিক থেকেই একটা লোক-লজ্জা আছে ত। তার চেয়ে যদি আমার সঙ্গে চলো, অসুবিধা তোমার কিছু হবে না। সুখে স্বচ্ছন্দেই থাক্‌বে।"

যতীন্দ্রনাথ এইটুকু বলিতেই আবার সে সভয়ে কিছু হটিয়া গিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"ওসব কথা কেন তুল্‌ছেন! আমি কোন কিছুতেই যাবো না। লোকলজ্জার চাইতে নিজের লজ্জা আমার কাছে ঢের বেশি বড়। চরিত্রহীনের ঘর আমি করবো না।"

যতীন কহিল—"তাহ'লে তোমার মত আর বদলাবে না? কিছুতেই না?"

অমিয়া দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

"আমি তাহলে ফিরে যেতে পারি? এখনও ভেবে দেখ! তুমি না যাও তো এই মাসেই আমি বিয়ে করবো কিন্তু। তোমার আশাপথ চেয়ে যে জীবন কাটাবো, সে আমার দ্বারায় হবে না, তা'বলে দিচ্চি।"

এই কষ্টকর আলোচনা চালাইতে অমিয়ার যেন বুকে খিল ধরিয়া যাইতেছিল। সে এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"যে মুহূর্ত্তে সেই চিঠি আমি পড়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সব-কিছু ভাবা শেষ হয়ে গ্যাছে। আজ আবার নূতন করে আমি কি ভেবে দেখতে যাব? ভাবনার আমার কিছু

নেই। আমি ও-রকম লোকের—না—আমি যাবো না। আপনি এক্ষনি চলে যান।"

যতীন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয়ার ক্রোধের ক্ষোভের অপমানের উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাসভরে কম্পিত দেহ, আরক্ত মুখ ও আহতা ফণিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব শুদ্ধ জড়াইয়া তার মধ্যের একটা নূতনতর তীব্র আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্য সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া লক্ষ্য করিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া শান্ত উদাসস্বরে ধীরে ধীরে কহিল—"আচ্ছা, আমি তাহলে চল্লুম,—" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দু পা অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ সে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"ভাল কথা! যে চিঠিখানা তুমি পেয়েছিলে, সেখানা কি ঠিক এই রকম? এইখানার সঙ্গে সেইখানা একবার একটু কষ্ট করে মিলিয়ে দেখবে কি?"—এই বলিয়া এবার সে অসঙ্কোচে চলিয়া আসিয়া অমিয়ার ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ভাঁজ খুলিয়া একখানি চিঠি তার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নিমেষমাত্র তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমিয়া সরোষ বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"এ কি! আমার চিঠি কেমন করে চুরি—পেলেন আপনি! দিন আমার চিঠি দিন!"

যতীন্দ্র চিঠিখানা তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"এখানি সত্যি বলচি,—আমি চুরি করি নি। তোমার খানা তুমি কোথায় রেখেছ খুঁজে দেখে দুটোয় মিলিয়ে নাও। তা হলেই তো সব সন্দেহ যাবে।"

অমিয়া চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া গিয়াই পুনশ্চ ঘোর অবিশ্বাসের সহিত কহিয়া উঠিল—"এ সেই চিঠিই। সেই 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি' মটো-লেখা একই কাগজ—সেই পুণ্যবতী লিখিয়া "ী" টা কাটিয়া দিয়া "ি" করা পর্য্যন্ত সমস্তই এক। নিঃসংশয় রূপেই এক হাতের লেখা এবং সেই চিঠিই—"

অমিয়া ঘোর অবিশ্বাসের সহিত মুখ তুলিল—"এ চিঠি আপনার হাতে কেমন করে যে গেল আমি কিছুই বুঝতে পারচি না!"

যতীন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"আমিও না। কিন্তু সেখানা তুমি কোথায় রেখেছিলে?"

"ওঃ এই ঘরেই তো—" বলিয়া সে খাটের গদীর দিকে চাহিল।

যতীন তাহার অর্থ বুঝিয়া একটু জায়গা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"বেশ'ত, দেখ না সেটা ওখানে আছে কি না—!"

"নেই, দেখতেই পাচ্চি—"বলিয়া সরোষে অমিয়া গদীর খানিকটা উল্টাইতেই খামশুদ্ধ চিঠিখানা যেমন ছিল বাহির হইয়া পড়িল। সেই একই রকম খাম, এক হাতেরই ঠিকানা লেখা। শুধু ডাকের ছাপটা নাই।

"এ কি! তবে এ আবার কি করে এলো!" বলিয়া দুখানা চিঠিই পাশাপাশি খুলিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সেই সময় মুখ তুলিলেই সে দেখিতে পাইত যে, তার পরিত্যক্ত স্বামীর চোখে-মুখে কি বিপুল কৌতুক হাস্যের উচ্ছ্বাসই ফাটিয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল!

"হ্যাঁরে হনুমান ছেলে! এ তোর কি কাণ্ড বল্ দেখি? তাই প্রথম থেকেই আমার যেন হাতের লেখাটা খুব চেনা-চেনা বোধ হয়েছিল! তোকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হলো—'ও চিঠি যে তোর হাতেরই লেখা! এই তো—ঠিক তাই! এই দেখ তোর চিঠি আমার কাছে ছিল,—কই সে চিঠি অমিয়া! বার কর তো মা! ওমা! এই যে! দেখ তো! দেখ অমিয়া! হতভাগা ছেলের কীর্ত্তিটা এখন দেখ! উঃ! কি রে তোরা—ডাকাত না খুনে রে।"

পূর্ণিমাদেবী তাঁর স্বভাব-বিগর্হিত উত্তেজনা-চঞ্চল হইয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে তিন-চারখানা পুরাতন পত্র খুলিয়া খুলিয়া তার লেখার সহিত ঐ অজ্ঞাতনামার লিখিত পত্র ও তাহার নকলের সহিত মিলাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। আর ক্রমাগত অসম্বরণীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্ষুদ্র বালিকাটির মতন হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই দেখ অমিয়া! এই দেখ মা—কোন একটা অক্ষরে এতটুকু অমিল আছে? এই দেখ এর 'ম' এই দেখ ওর 'ম'—তালব্য 'শ'—বর্গীয় 'জ'—সব দেখ এক রকম।" ওর হাতের লেখা ঠিক যে ওর মেজ মামার মতন! তিনিই যে ওকে প্রথম লিখতে পড়তে শেখান, ওর স্বভাবে তিনি যে ওকে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু এমন অন্যায় খেলা কেন খেলতে গেলি বাবা! মেয়েটা যদি আত্মঘাতী হতো, কি সেদিন পথে একটা বিপদে পড়ে যেত? কি হত বল দেখি তখন!"

যতীন্দ্রনাথ মামিমার এই নির্ভুল আবিষ্কারে ও ভৎর্সনায় যুগপৎ প্রফুল্ল ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া অপরাধীভাবে মৃদু-

কণ্ঠে উত্তর করিল—"এতটা যে ও করবে,তা' আমি ভাবতেই পারি নি মামিমা! বিয়ের আগের দিনই নগেন ঘোষদের বাড়ীতে শুনলুম,—আমার যিনি শ্বশুর হবেন, তিনি তাঁদের কাছে আমার চরিত্র সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ নিয়ে গেছেন। বলেছেন—তাঁর মেয়ের প্রতিজ্ঞা—স্বামীর চরিত্রে কোন দাগ থাকলে তার ঘর সে কিছুতেই করবে না। সেই শুনে একটুখানি পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই—তা' মামিমা! শিক্ষাটা আমারও বড় মন্দ হলো না! সেদিন ষ্টেশনে গাড়ি শূন্য দেখে বাস্তবিক খুবই ঘাবড়ে গেছলুম! তখন মনে মনে কি আপ্‌শোষই যে করেছি। তা'পর ওঁর মা বাবার সাম্‌নে গিয়ে,—সে যেন আমার মরার বাড়া হলো। মনে মনে ত জানচি যে আমিই এর জন্য দায়ী! তা'পর টেলিগ্রামটা দেখে অনেকখানি সুস্থ হলেম,—বুঝতে পারলেম যে, তাহলে নেহাৎ মরে নি এবং একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যাবার মতন মেয়েও এ নয়!"

এই বলিয়া সে তখন কৌতুক-হাস্যে-ভরা গভীর দৃষ্টিতে অদূরবর্ত্তিনী প্রস্তরীভূতা অমিয়ার দিকে চাহিল।

পূর্ণিমা দেবী কাছে আসিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাতটী বুলাইয়া তাহার শিথিল দেহ নিজের স্নেহনিবিড় বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন—"মা আমার! কত দুঃখই পেয়েছিলি! ভগবান যে হঠাৎ এমন করে এটাকে এমন অদ্ভুতভাবে শেষ করে দেবেন এ' যে আমাদের আশার অতীত! যতীন! অমিয়া তোমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল বলে তুমি কিন্তু ওকে একটী কথাও বলতে পাবে না, দোষ তোমারই বেশি। বিয়ের কনেকে অমন করে ভয় দেখালে, সে ভয় না পেয়ে কি করবে বাছা?"

যতীন্দ্রনাথ এইবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিয়া সেই হাসির মধ্যেই বলিতে লাগিল—"ভয়ই পাক, আর যাই করুক মামিমা! আপনার বোনঝিটী কিন্তু এবার সব পরীক্ষার চাইতেই শ্রেষ্ঠ খুব মস্ত বড় পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে পাশটা করে নিলে। নাঃ! তোমারও পরে ভক্তি তে চির দিনই অপর্য্যাপ্ত আছেই,—আজ আবার আর এক দিক দিয়ে ইনিও আমার নারীজাতির উপরে সেই শ্রদ্ধাকে দ্বিগুণিত করে দিলেন। এই তো চাই মামিমা! ওই চিঠি পেয়ে ও যদি নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে আমার সঙ্গে আমার ঘরে ঘর করতে চলে যেত, আমি আমার স্ত্রীকে আর যাই করি, জন্মে কখন আর শ্রদ্ধা করতে পারতুম না,—এটা খুব সত্যি।"

পূর্ণিমা দেবীর দু'চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি বিবশা অমিয়াকে টানিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিয়া তাহার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন—"মা! এইবার তুমি তোমার স্বামীকে প্রণাম করে, তার পায়ের ধূলো নাও। অনেক মন্দ কথাই তার সম্বন্ধে ভেবেছ হয়ত। ভুলু! আমার কাছে আয়। তোদের দুটিকে দুপাশে নিয়ে একবার বসি। আহা! কি সুন্দর মানিয়েছে দেখ দেখি! আজ যদি তোর মা বাবা আর তোর মেজ মামা বেঁচে থাকতেন!"

মনের মতন

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমি ত রচেছি বিশ্ব মনের মতন,
নাহি অন্ধ অভিলাষ, বাসনা-বিকার।
অন্তরে বাহিরে করি আশীস্ বর্ষণ,
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত প্রেম-পারাবার।
পৃথিবীর লক্ষ আশা লক্ষ দিকে ধায়,
হেথা সব বাঁধা আছে সোনার শৃঙ্খলে।
পৃথিবীর সফলতা সুদূরে মিশায়,
হেথা সব দূর আসে নিকটেতে চ'লে।
ধরায় সবাই রাজা, সবে চাহে কর,—
প্রাণ চাহে পরিতোষ, প্রেম চাহে সুখ,
তৃষিত চেতনা চাহে হইতে অমর,
সব বুকে ধরা দিতে চায় যেন বুক।
হেথায় মনের রাজ্য অনন্ত বিস্তার,
প্রেম ছাড়া আর কারো নাহি অধিকার।

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

শ্রীনগর

শ্রীনগর তো শ্রীনগরই—নগরের শ্রী সত্যই অপূর্ব্ব! চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর,—নগরের বুক বয়ে ঝিলাম সর্পগতিতে

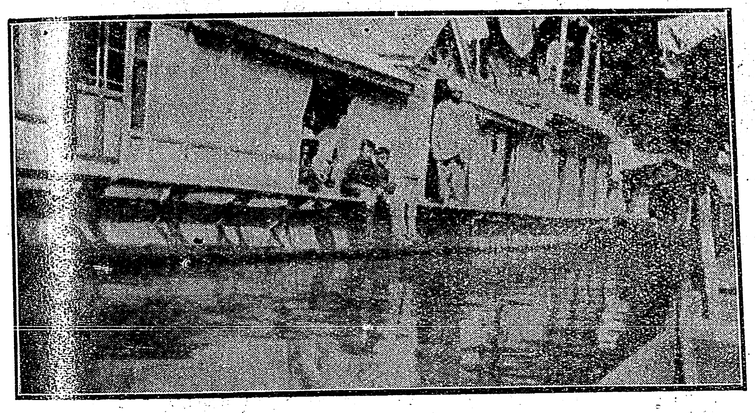

আমাদের হাউস-বোট

এঁকে-বেঁকে চলেছে, দুই তীরের কাছে হাউস-বোটে কত জাতির লোক যে বাস করছে! পথ-ঘাট প্রশস্ত। পথের ধারে বিলাতী ছবিতে যেমন সব কটেজের দেখা মেলে, তেমনি ঘর-বাড়ী। পপ্‌লার ও চেনার গাছ শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফুল-ফলের রকমারি বাহার··· প্রকৃতির আদরের দুলালটি যেন!

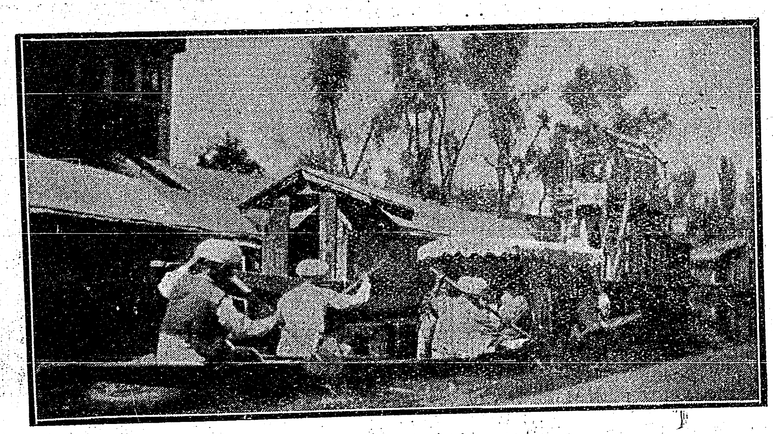

শিকারা

আমাদের হাউসবোট ছিল চেনার-নালায়। মহল্লার নাম চেনার-বাগ। চেনার-নালা নালাই বটে! ঝিলাম থেকে কাটা খাল জমিকে অমন শতভাগে বিভক্ত করে এদিকে-ওদিকে চলে গেছে—স্রোত অত্যন্ত মৃদু, জল কম, তাছাড়া সে জলও অত্যন্ত নোংরা। চেনার-নালার আকার অনেকটা কলকাতার টালার খালের মত। এই নালায় হাউস-বোটের সংখ্যা নেই বললেও চলে। আড়াআড়ি করে নালায় যতগুলি ধরে, তত আছে! শুধু মাঝখান দিয়ে একখানা কি দুখানা হাউস-বোট যেতে পারে, এমনি জায়গা খালি আছে। আমরা হাউস বোটে জিনিষপত্র তুলিয়ে স্নানাহারের আয়োজনে ব্যস্ত হলুম। আয়োজন পাকা করতে হবে। কেননা, এখানে তো ক্ষণেকের অতিথি হয়ে থাকা নয়, কিছুদিনের জন্য আস্তানা পাতা!

বোট থেকে বাসন-মাজা চাকর, জলতোলা ভিস্তী—দুখানি বোট, কাজেই—দুজন করে মিললো! তাছাড়া ম্যাথরও দুজন নিযুক্ত হলো। ভৃত্যকে পয়সা দিয়ে কতকগুলি কলসী আনানো হলো। চেনার-নালা বা ঝিলামের জল স্নান-পানের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ—কলের জল আনাতে হবে, তাতেই স্নান-পান-রন্ধন সব চলবে। ঝিলামের জলে বাসন মাজা অবধি নিষেধ। এ নিষেধ অবশ্য রাজাদেশে নয়।

যাঁরা পূর্ব্বে শ্রীনগর ঘুরে গেছেন, এমনি বন্ধু ও আত্মীয়ের দল আমাদের পূর্ব্ব হতেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এ জলে হেন রোগ নাই, যার ব্যাসিলি মিলবে না! কাজেই সর্ব্ব কার্য্যে আমাদের কলের জল চাই,—বোটের ভৃত্যদের

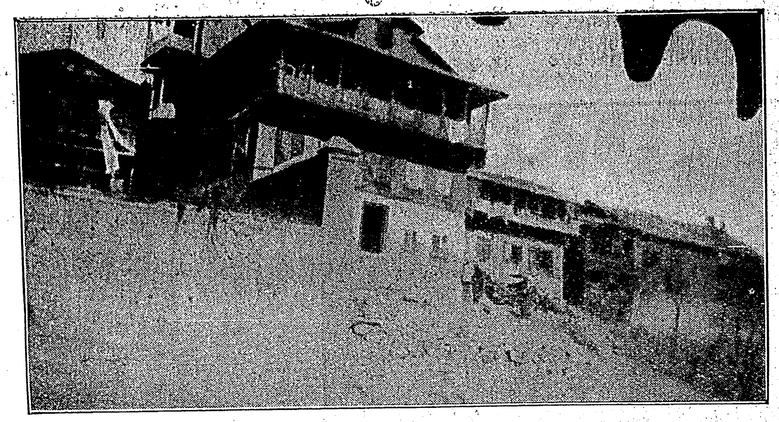

কাশ্মীরী বাড়ী

সে আদেশ জানানো হলো। কারণ, কাশ্মীরীরা ঝিলামের জলে স্নান করেন—বিশেষ, হাউস-বোটের মাঝি-মাল্লার দল এই জল পানের জন্য ও রন্ধনের জন্য ব্যবহার করে।

জল এলে সেই জল গরম করিয়ে স্নানের ব্যবস্থা করলুম। প্রতি বোটে তিনটে বাথরুম,—বাথ-টব প্রভৃতির সরঞ্জাম আছে। স্নান করে গরম জামা-কাপড়ে শরীর ঢেকে বোটের বাহিরে এসে চেনার-বাগে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করা হলো; ওদিকে ঠাকুর ততক্ষণে রান্না চাপিয়ে দেছে।

সন্ধ্যার অনতিকাল পরে আহারের তলব পড়লো। আহার হবে ডাইনিং-রুমে। আসন পাতা নয়—চেয়ারে বসে, টেবিলে ভাতের থালা রেখে খাওয়া! আহারাদি করে বোটের ড্রয়িংরুমে বসে খানিক বই পড়া গেল। ড্রয়িংরুমে ছোটখাট লাইব্রেরীও আছে—বিজলীর আলোয় আলো-করা ড্রয়িং-রুম অপূর্ব্ব ভূষায় সজ্জিত। তারপর রাত দশটা বাজলে শয়ন-পর্ব্ব। শীত খুবই প্রচণ্ড—গায়ে সাদা গেঞ্জি তদ্ভোপরি গরম গেঞ্জি ও ভায়েলা সার্ট, এবং সর্ব্বোপরি একখানি করে ধোশা ও কম্বল মুড়ি দিয়ে শোওয়া হলো। কিন্তু মাঝ-রাত্রে হি-হি শীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল! ধোশা-কম্বলে বেশ করে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত অনড়ভাবে পড়ে রইলুম—তারপর এমনি অবস্থাতেই রাত্রি কাবার।

সকালে বাথরুমে ঢুকে দেখি, ভৃত্য গরম জল রেখে গেছে। প্রাতঃকৃত্যাদি-সমাপনান্তে চা পান। তারপর বেলা আটটায় ওভারকোট প্রভৃতিতে আবৃত হয়ে বাজার-অভিমুখে সদলে রওনা হলুম।

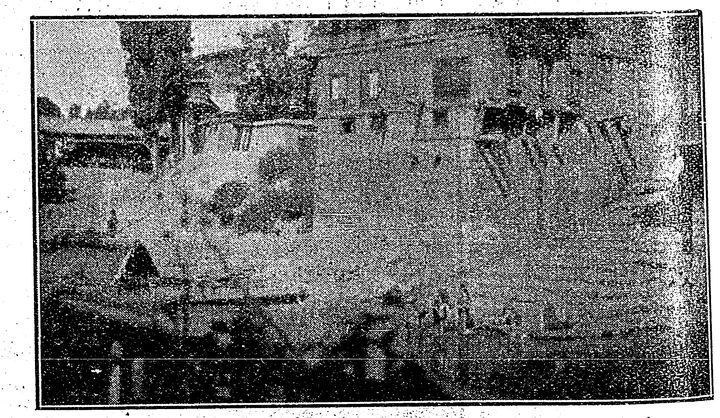

ঝিলামের তীরে ঘাট ও বাড়ী

কি শীত! বুকের মধ্যটা ঝন্‌ঝন্ করছিল, হাত অসাড়! দুই পকেটের মধ্যে হাত দুখানিকে পুরতে হলো। তবু কি শীত কমে!

বাজার শাক-সব্জী, আনাজ-তরকারীতে ভরা। আর কি শস্তা দাম! আলুর সের এক আনা; এক পয়সা বা দেড় পয়সায় এক সের বেগুন; চার আনায় একটি কুমড়ো

মিললো, তার ওজন প্রায় আধমণ! একটি বড় লাউ এক পয়সা। মাংসর সের ছ'আনা। এক রকম শাক পাওয়া গেল, কপির পাতার মত; তার নাম কড়ম শাক। আর লঙ্কা? সে যেন এক-একটা বড় বেগুনের মত! অঢেল—কত চাই! সরু চাল—টাকায় আট সের। বাজার করছি, বিস্তর মাঝি এসে ছেঁকে ধরলো,—'শিকারা সাব্! শিকারা'! 'শিকারা'র মানে, সেই ছোট ছিপের মত হালকা নৌকো! আনাজ-তরকারী নিয়ে শিকারায় চড়া গেল। ঝিলামের বুক বয়ে গিয়ে চেনার-নালায় ঢুকলুম। সাম্‌নে ঝিলামের বুকের উপর থেকে দীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী উঠেছে! সে যেন ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বসে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করছেন! চেনার-নালার প্রবেশ-পথের অপর তীরে মহারাজার প্রাসাদ। এটি মহারাজার গ্রীষ্মাবাস। শীত-কালে মহারাজা সপারিষদ জম্মুর প্রাসাদে বাস করেন।

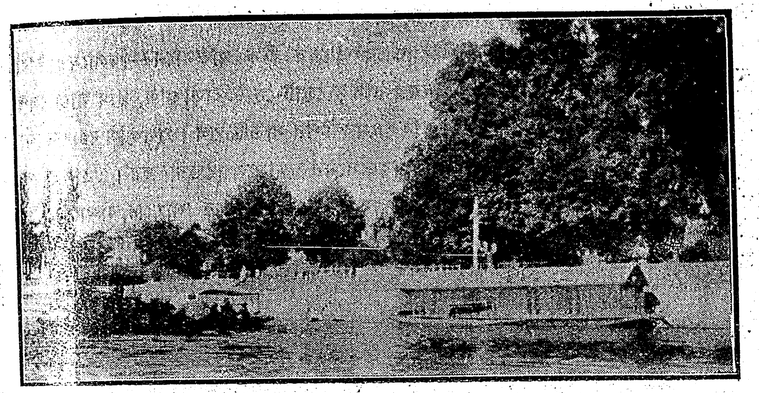

ঝিলাম। তীরে মহারাজ রণবীর সিংহের বেদী

বোটে ফিরে দেখি, দলে-দলে শিকারা বেয়ে দোকানী-পশারীর দল আনাজ-তরকারী থেকে সুরু করে শাল-দোশালা, কাঠের খেলনা, জুয়েলারি প্রভৃতি নিয়ে ভিড় জমিয়েছে। এখানে এমনিভাবেই এরা ব্যাসাতি করে। তবে পরদেশী ক্রেতা পেয়ে দাম হাঁকে চতুর্গুণ! আমরা সদ্য এসেছি, মন সংশয়ে আচ্ছন্ন, তাদের কাজেই বিদায় দিতে হলো, দর-দস্তুর জানিনা—পাছে বেজায় ঠকি!

বৈকালে মোটরে করে বেড়াতে বেরুনো হলো। পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা প্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে মহারাজ হরিসিংয়ের প্রাসাদ, পথের ধারে মহারাজার ফলের বাগান—প্রকাণ্ড বাগান, আপেল-নাশপাতি গাছ ফলন্ত! দূরে বহুদূরে পাহাড়ের শ্রেণী—আগাগোড়া এমনি প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে—দেখলে মনে হয়, ওদিকে যাবার কোনো উপায় নেই! হঠাৎ মনে হলো, কোথায় নিজের দেশ ছেড়ে এসেছি—ফিরে যাবার পথ ওর মধ্যে খুঁজে পাবো কি!

বেড়িয়ে বোটে ফেরবার মুখে ওখানকার ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। এঁর আতিথ্যের খ্যাতি ভারত-বিস্তৃত। যে-কোনো বাঙালী এখানে আসেন, তাঁর বোট ঠিক করে দেওয়া থেকে সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া ললিতবাবুর ব্রত! এতটুকু বিরক্তি নাই! সদাপ্রসন্ন মুখ! কাশ্মীরে দীর্ঘকাল বাস করেও ভদ্রলোকের

চেনার-নালা

গায়ে তেমন মাংস লাগে নি কিন্তু! ললিতবাবুর গৃহে যত বড়-বড় বাঙালী-অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো! শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই গৃহে সভাপতির মত বসে, আর বহু বাঙালী—প্রোফেসর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমুপস্থিত। সকলে নানা গল্পে-আলোচনায় ব্যাপৃত। আমাদের কাছে এলাহাবাদের ললিতবাবুর লেখা পরিচয়পত্র ছিল, বসু-মহাশয়ের নামে! পত্র দিতে তিনি অভ্যর্থনার ধূম বাধিয়ে তুললেন—চা, বিস্কুট, বাদাম প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়িত করলেন! পরিচয় হলো। এখানকার বাঙালীরা দেশ ছেড়ে এত দূরে থাকলেও মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন্ নি। 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলি নেন, পড়েন, কাজেই সে-সব পত্রে মাঝে-মাঝে কলমের যে-সব আঁচড় টানি, তারও পরিচয় রাখেন! তখন 'ভারতবর্ষে' আমার 'পিয়ারী' উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে বেরুচ্ছে—সে-সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। 'পিয়ারী'র অদৃষ্ট-চক্র ঘুরে কোথায় দাঁড়াবে, সে-প্রশ্নও তুললেন। বাংলা দেশে থেকে হাজার মাইল দূরে এমন নিশুক দরদী প্রাণের পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধ হলুম। ঋষিবরবাবু বললেন,—ধুতি পরে বেরুবেন না, এ কলকাতা নয়। ঠাণ্ডা লাগবে, নিউমোনিয়া হতে পারে। আমি বললুম,—কিছু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছে না তো! ঋষিবর বাবু বললেন,—কাশ্মীরী পট্টর ব্রীচেস (breeches) পরে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরুবেন। পট্টু কিনতে বললেন। আমি বললুম,—তাই হবে। ললিতবাবু আমাদের আস্তানার সন্ধান নিলেন,—তার পর কতকগুলি উপদেশ দিলেন। আমরাও বিদায় নিলুম।

শ্রীনগর কাশ্মীরের ঠিক মাঝখানে—ঝিলামের দু'ধারে কাশ্মীরীদের বাস; ছোট-ছোট বাড়ীগুলি, ছাদ মাটী লেপা। শ্রীনগরে ঝিলামের উপর সাতটি পুল। পুলগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহারাজ প্রবরসেনের আমলে তৈরী হয়। প্রথম পুলটি পাকা। বারামুলা থেকে শ্রীনগরে আসতে বাজারের পরই

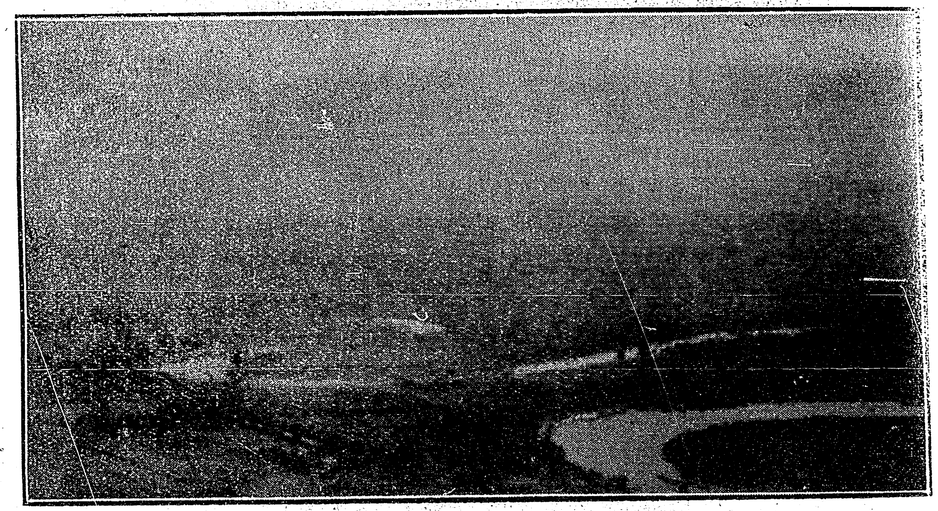

শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বত-শিখর হইতে ঝিলামের গতি-দৃশ্য

এই পুল পার হতে হয়। অপর ছটী পুল কাঠের পাইলস্-এর উপর, তার উপর দিয়ে এক্কা চলে, মোটর বা ভারী গাড়ী যেতে পারে না। সহরে ঢুকতেই সর্ব্বাগ্রে চোখ পড়ে, নগরের বুকে এক পাহাড়ের মাথায় একটি মন্দির। এ মন্দিরের নাম, তখ্ত্-ই-সুলেমান। এ পাহাড়টি নগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। পাহাড়টি এক হাজার ফিট উঁচু। মন্দিরটি একেবারে পাহাড়ের মাথায়। মন্দিরের চূড়ায় বিজলী-আলো দেওয়া হয়েছে—তার ভিতর বেশ কৌশল আছে। আলোটুকু বহু বহু দূর থেকে রাত্রে পথ-প্রদর্শকের কাজ করে। এ আলোটি বহু অর্থব্যয়ে বসিয়েছেন মহীশূর-রাজ। পূব দিক দিয়ে নদী ঝিলাম বয়ে চলেছে—

এবং এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চেনার-নালা-পথে ডাল হ্রদে এসে মিশেছে। ডাল মানেই হলো হ্রদ। হ্রদের গা ঘেঁষে পাহাড়ের শ্রেণী। ডালের তীরে খানিকটা জায়গায় হাউস-বোট আছে বিস্তর। হ্রদের জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—এমন পরিষ্কার যে তলার নুড়ি-পাথর সুস্পষ্ট দেখা যায়; তাছাড়া মাছ ভেসে খেলা করছে, তাও চোখে পড়ে। তখ্ত্-ই-সুলেমানের নীচে নার্শিং হোম্; এখানে আটজন য়ুরোপীয় রোগীর বাসের ব্যবস্থা আছে। তখ্ত্-ই-সুলেমানের উপরে মন্দিরে যাবার পথ আছে।

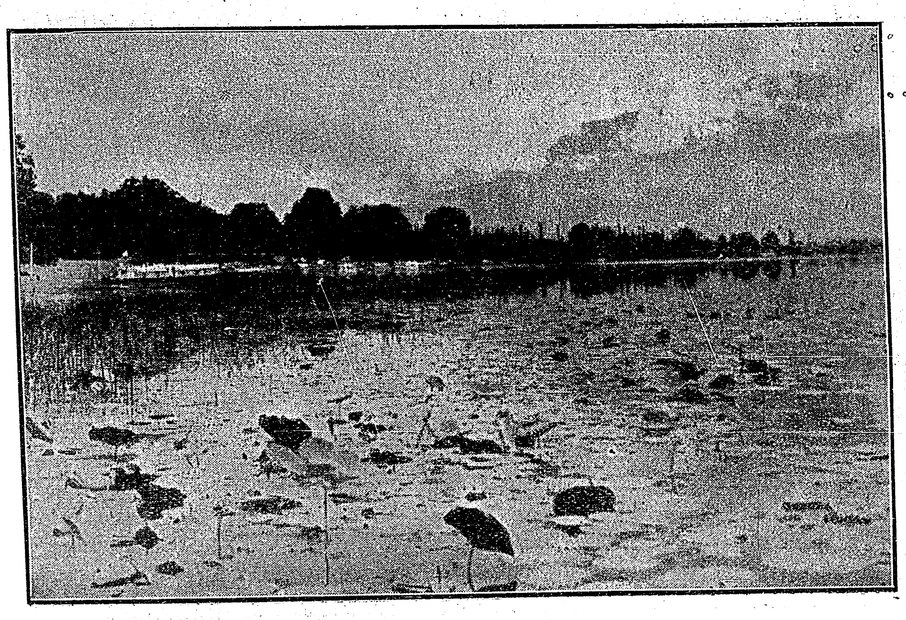

ডাল হ্রদ—কমলবন

এ-পথে ঘুরে মন্দিরে চড়া একটা সখের কাজ! ভক্তি যাঁদের আছে, তাঁরা তো যাবেনই—সে বেশী কথা নয়! তবে য়ুরোপীয় যাত্রীর দলও পাহাড়ে চড়ে মন্দির দর্শন করেন। খুব মোটা বয়স্কা মেম-সাহেবকেও দু'জন তরুণের কাঁধে ভর দিয়ে পাহাড়ে চড়তে দেখেছি। এ পাহাড়ের অপর নাম শঙ্করাচার্য্য পাহাড়। এ মন্দির প্রথম তৈরী করেন জালক। জালক ছিলেন বৌদ্ধ। মন্দিরটি প্রথম তৈরী হয় ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সালে। তার চিহ্নও নাকি লুপ্ত হয়ে যায়। পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপাদিত্য এর সংস্কার করে মন্দিরে মহাদেব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহটির নাম জ্যেষ্ঠেশ্বর। যে শিবলিঙ্গ আছে, সেটি মানুষ-ভোর উঁচু, আর তার বেড় বিশাল বটগাছের মত।

এখানে মন্দির প্রভৃতির প্রাচীনতা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, কাশ্মীর বহু প্রাচীন যুগ থেকেই আপনার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আসছে। কাশ্মীরের উদ্ভব সম্বন্ধে যে-গল্প বহু পূর্ব্ব কাল থেকে চলে আসছে, তাতে পুরাণের শীল মারা—আর সে গল্প ভারী মজার! গল্পটি এই,—হিমালয়ের বুকে সুদীর্ঘ হ্রদ ছিল, তার নাম সতীসর। এই সতীসরে পার্ব্বতী মাঝে মাঝে নৌ-বিহারে আসতেন। কিছুকাল পরে অকস্মাৎ এই সতীসরে এক দৈত্যের আবির্ভাব হলো। দৈত্যের অত্যাচারে সতীসরের তীর-প্রদেশের অধিবাসীর দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারা যাগযজ্ঞ করে দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেবতাদের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হলো। এবং যেমন হয়ে থাকে, তাদের তপে তুষ্ট হয়ে এলেন ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপমুনি। তিনি অধিবাসীদের মুখে দৈত্যের কথা শুনে দৈত্যকে বধ করার আয়োজন করলেন! দৈত্য নানা জলচর জন্তুর রূপ ধরে সতীসরের

জল তোলপাড় করে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। সতীসরের জল ঘোলা করছে এক দুরন্ত দৈত্য—পার্ব্বতী দেবীর কাছে খপর গেল। তিনিও অন্তরীক্ষে এসে দাঁড়ালেন। কশ্যপমুনি তখন মন্ত্রবলে সতীসরের জল শোষণ করতে লাগলেন—দৈত্যের পক্ষে তখন আত্মগোপন অসম্ভব হলো। সে তো এক জায়গায় আশ্রয় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালো, অমনি কশ্যপমুনি অস্ত্র ধরলেন। তাতেও দৈত্যকে এঁটে ওঠা যায় না! পার্ব্বতী দেবী তখন তারণ করতে এলেন। হিমালয়ের একাংশ হাতে উপড়ে নিয়ে তিনি দৈত্যকে

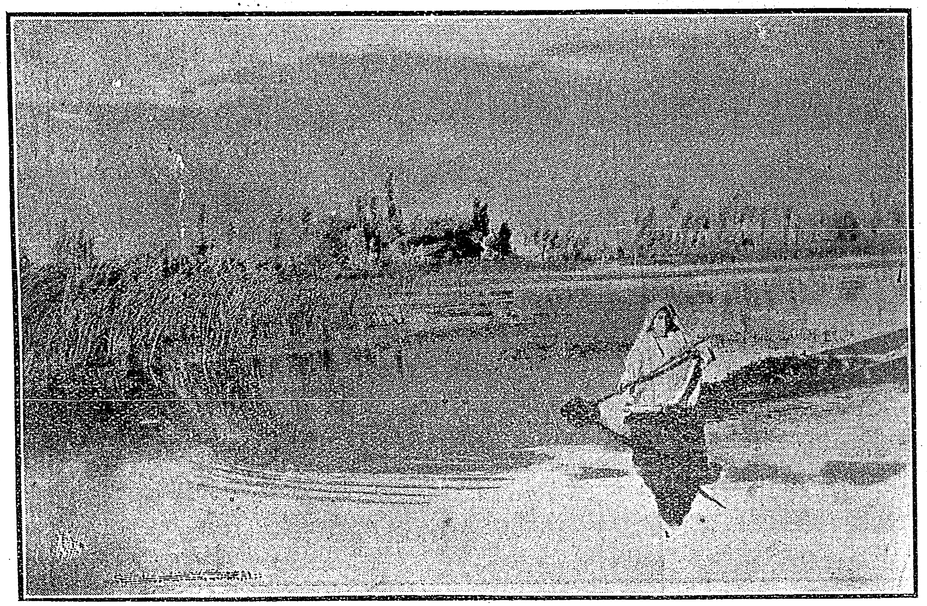

ডাল হ্রদ—ভাসমান ক্ষেত

লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন! আর সে যায় কোথায়! দৈত্য সেই পর্ব্বতখণ্ডের ঘা খেয়ে পঞ্চত্ব পেলে। সেই পর্ব্বতখণ্ড হলো এখনকার হরিপর্ব্বত। হরিপর্ব্বত শ্রীনগরের একান্তে অবস্থিত। তার মাথায় কেল্লা আছে। কেল্লাটি আকবর বাদশাহ তৈরী করান। আজো সে কেল্লা জীর্ণ হলেও সশরীরে খাড়া আছে, এবং তাতে কাশ্মীর মহারাজার ফৌজ থাকে। আর দৈত্যের পালিয়ে বেড়ানোর দাপটের দরুণ পায়ের চাপে যে-সব নানা ঢিপির সৃষ্টি হয়, সেগুলো ছোট-খাটো পর্ব্বতশৃঙ্গ হয়ে গেছে। কশ্যপ জল শুষে নেওয়ায় উপত্যকা-ভূমি বেরিয়ে পড়ে। সেই উপত্যকাই হলো শ্রীনগর। সতীসরের একটা শীর্ণ ধারামাত্র ঝিলাম বা বিতস্তা নদীতে পরিণত হয়েছে! দৈত্য যেখানে নিহত হয়, সে জায়গা হলো আধুনিক বারামুলা। হরিপর্ব্বতে শ্রীদুর্গার মূর্ত্তি আছে—আজো তাঁর নিত্যপূজা হয়।

পুরাণের গল্পে লোকের মন যত সন্দিহান্ থাকুক, কাশ্মীরের প্রাচীনতার বিবরণ ইতিহাস-পাঠে জানা যায়। ঐতিহাসিক যুগে কাশ্মীর-রাজ্য ভারতের হিন্দুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম।

শ্রীনগরের পত্তন হয় খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, রাজা অশোকের রাজত্ব-কালে। কহ্লন এই কথা বলেন। পরে মহারাজ প্রবরসেন (২য়) হরিপর্ব্বতের চারিদিক ঘিরে শ্রীনগর রাজধানী গড়ে তোলেন। ঝিলাম বা বিতস্তার উপর তিনিই প্রথম সেতু নির্ম্মাণ করান। কাশ্মীরে যে-সব প্রাচীন মন্দির আছে, তাদের সংস্কার এবং অনেকগুলি নূতন মন্দির গঠন, এ তাঁরই কীর্ত্তি। শ্রীনগরের তখন নাম ছিল প্রবরপুর।

তার পর ১০৫০ খৃষ্টাব্দে ঝিলামের দ্বিতীয় সেতুর কাছে

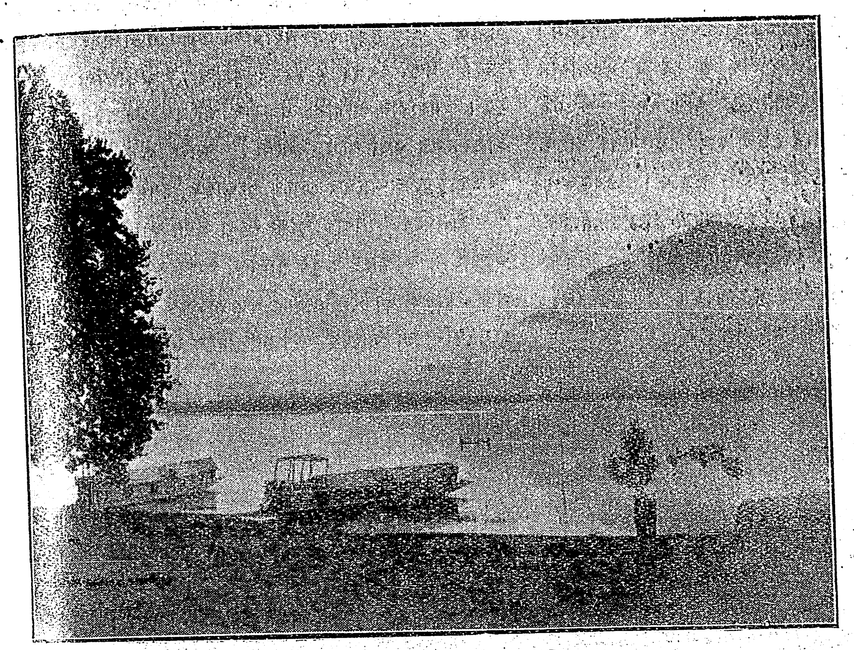

ডাল হ্রদ—গাগ্‌রি বল্

নদীর তীরে প্রাসাদ তৈরী হয়। কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা সকলেই শৈব ছিলেন। কাশীর মত শিব-মন্দিরের এখানে সংখ্যা নেই। মন্দিরের গড়ন কিন্তু সম্পূর্ণ কাশ্মীরী কলানুযায়ী। এই সব মন্দিরের সবিশেষ পরিচয় পরে দেবো। হিন্দু-প্রাধান্যের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে সুদৃঢ়ভাবে মোঙ্গল-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্ব্বে একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর মাহ্‌মুদ গজনীর করতলগত হয়—এবং তুরাণী রাজগণ কাশ্মীরে প্রভুত্ব করেন। তার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল কাশ্মীর দখল করে। এই মোগল-আমলেই কাশ্মীর শোভায়-শ্রীতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সহজ সুষমায় মানুষের হাতের কারিগরি ফোটে!

কাশ্মীরী নারীর ধান কোটা

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ কাশ্মীর অধিকার করেন। তিনি প্রায়ই কাশ্মীরে বেড়াতে আসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বেগম নুরজাহান কাশ্মীরে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে আসতেন। তাঁদের আমলে বহু উদ্যান, বহু প্রাসাদ তৈরী হয়, বহু সরাই রচিত হয় এবং বিস্তর পথঘাটও তাঁরা তৈরী করান। এখনকার এই ঝিলাম-ভ্যালি রোড তখন থেকেই আছে—কিন্তু সে পথ তখন খুবই দুর্গম ছিল। বহু রাজার নির্দ্দেশে বহু শিল্পীর হাত পেয়ে এখন অপেক্ষাকৃত সুগম হয়েছে।

তার পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর শিখদের হাতে আসে এবং রাজা রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীর শিখ-হস্তেই থাকে।

এই সময় জম্মুরাজ গোলাপসিং বহু দেশ জয় করেন এবং লাদাক, স্কার্দো, গিলগিট প্রভৃতি জম্মুরাজ্যভুক্ত হয়। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করা কঠিন। এই জন্যই ইংরাজ সন্ধি-সর্ত্তে জম্মুরাজের হাতে কাশ্মীর তুলে দেন, নিঃস্বত্বে। জম্মুরাজ তখন সুবিস্তীর্ণ কাশ্মীর-রাজ্যের অধিপতি হন। গোলাপ সিংএর মৃত্যু হয় সিপাহী-বিদ্রোহের সময়; তাঁর ফৌজ বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে। গোলাপ সিংয়ের পর তাঁর পুত্র রণবীর সিং কাশ্মীর-রাজ্যের অধীশ্বর হন। রণবীর সিং রাজত্ব করেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; তাঁর মৃত্যু হলে মহারাজা স্যর প্রতাপসিং রাজ্যেশ্বর হন। গত বৎসর (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ) প্রতাপসিংহের মৃত্যু হয়। মহারাজ হরিসিং এখন কাশ্মীরের অধীশ্বর। কিন্তু এ ইতিহাসের কথা পরে বলবো। আজ শুধু কাশ্মীরের যে বৈচিত্র্যটুকু আমাদের চোখে পড়েছিল, সেই কথাই বলি।

শ্রীনগরে আসবার পূর্ব্বে নানা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে ধারণা জন্মেছিল, কাশ্মীরে শুধুই পাহাড়, পাহাড়ের কোলে সরু পথ, আর নদী! গাড়ী চলে এমন প্রশস্ত রাজপথ এখানে নেই! কিন্তু এসে দেখি, তা মোটেই নয়। চারিদিকে দীর্ঘ প্রশস্ত পথ—তবে

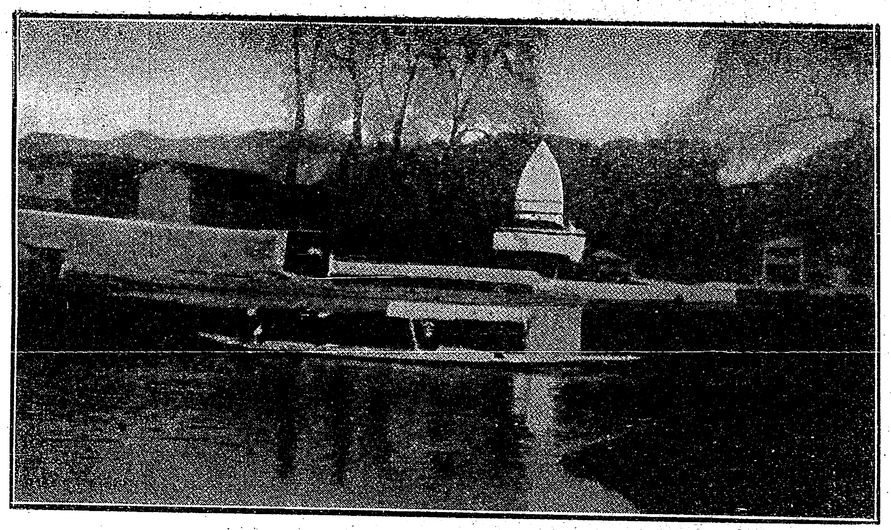

চেনার-বাগ, কাশ্মীর

ঝিলাম নদী ও তার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা (চেনার-নালা নামে প্রসিদ্ধ) আছে। এই চেনার-নালায় হাউস-বোটের সংখ্যা নেই। এই সব হাউস-বোটে বেশীর ভাগ বিদেশীর বাস। বিদেশী মানে যাঁরা বড় চাকরি করছেন, বা দীর্ঘকালের জন্য বেড়াতে এসেছেন। পর্য্যটকের অভাব এখানে কোনকালেই নেই। অনেক ইংরাজ আছেন; তবে তাঁদের 'বিষহীন ফণী' বলে মনে হয়! সে রক্তচক্ষু বা পথে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেশী লোক দেখলে ঘৃণায় সিঁটকে ওঠা—এ দৃশ্য শ্রীনগরে দেখিনি কোনো দিন! শ্রীনগরের প্রশস্ত লনে দেশী ও বিলাতী নর-নারী বেড়াচ্ছেন, অকুতোভয়ে, অসঙ্কোচে, সকালে-

সন্ধ্যায়, পাশাপাশি! কোথাও দেশী লোকের পদার্পণ নিষেধ—এ-রকম সাইনবোর্ড নেই! এই সুস্থ আবহাওয়াটুকু সব-আগে চোখে পড়ে! আমরা সেখানে থাকতে থাকতে এক কাশ্মীর-প্রবাসী পাঞ্জাবী দোকানদারের সঙ্গে কি অ-বনিবনা হওয়ায় এক লাল রঙের সাহেব দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাকে যা-তা বদ গাল দেন। পাঞ্জাবী তাকে সতর্ক করেন, খবর্দ্দার, গাল দিয়ো না! তাতে সাহেব না ভোড়কে দেশীর স্পর্দ্ধা দেখে আবার সেই বদ্ গালের পুনরুক্তি করেন! যেমন গাল দেওয়া, অমনি পাঞ্জাবী যুবার প্রচণ্ড ঘুষি সাহেবের নাকে পড়া! সাহেব এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি টাল সামলে নিয়ে পাঞ্জাবীকে মারেন, পাঞ্জাবীও তার চতুর্গুণ শোধ দেন। সাহেব ছেঁড়া কোর্ত্তায় রক্তাক্ত কলেবরে রেসিডেণ্টের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। তিনি বলেন, থানা আছে, কোর্ট আছে, নালিশ করগে। আমার কাছে কেন? সাহেব থানায় গিয়ে নালিশ লেখান্—তারপর কোর্টে যাবার পূর্ব্বেই বোধ হয় তাঁর চেতনা হয়, এখানে সাদায়-কালোয় পার্থক্য তো নেই! তখন ছেঁড়া কোর্ত্তা খুলে গায়ের রক্ত ধুয়ে-মুছে সাহেব নিজের কাজে মন দেন। এ হলো গত সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা।

তারপর দ্বিতীয় বৈচিত্র্য এবং সেইটেই প্রধান বৈচিত্র্য যা চোখে ঠেকে, সে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য! পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, ফুল-ফল……এর প্রাচুর্য্যের আর সীমা নেই! পাহাড় চতুর্দ্দিকে,—কিন্তু তার একঘেয়ে ভাব কোথাও নেই। আকারে-প্রকারে পদে পদে এত পার্থক্য, বর্ণের বিচিত্র সুষমায় এমনি উজ্জ্বল যে বিস্ময়ে এই গিরিমালার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে যায়! চিত্রকরের তুলির রেখায় ফুটিয়ে তোলবার মতই মহান্ সে দৃশ্য, সুন্দর সে দৃশ্য! উত্তর দিকে চাও, পাহাড়ের সাগর যেন! মাথায় তুষারের শুভ্র কিরীট, সাগরের তরঙ্গের মতই ফেনিল! উত্তরের এ পর্ব্বতের নাম নাঙ্গা পর্ব্বত। পূর্ব্বদিকে চাও, গম্ভীর মূর্ত্তিতে উচ্চ-শিখর

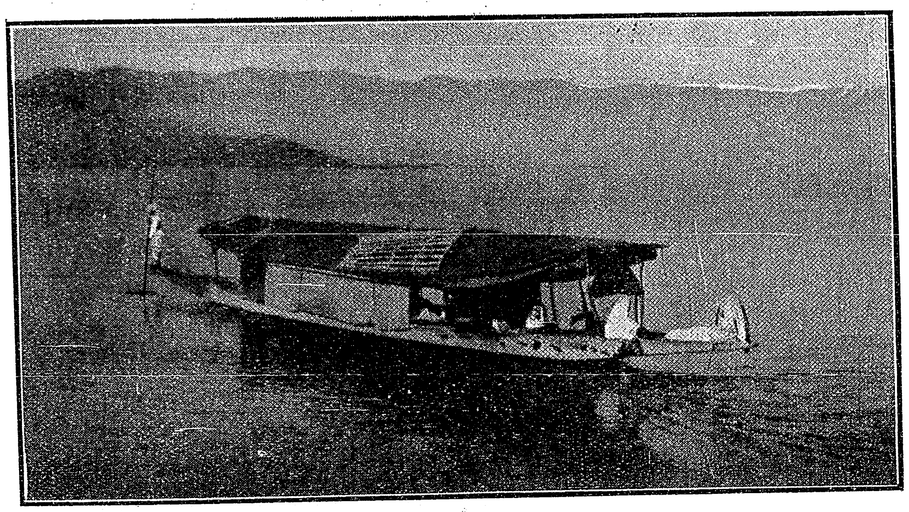

উলার হ্রদ

গিরিরাজি সিন্দ্-উপত্যকাকে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে মহাদেও পর্ব্বত, শ্রীনগরের পানে তাকিয়ে অচল দাঁড়িয়ে আছে! মহাদেও পর্ব্বতের পাশে অমরনাথ পর্ব্বত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পীরপাঞ্জাল, আর পশ্চিমে ফার্ ও দেওদারের ঘন জঙ্গল পঞ্চনদকে চোখের আড়াল করে পুঞ্জিত রয়েছে! পাহাড়ের গা ফেটে অসংখ্য ঝর্ণা ঝরে পড়ছে। জলের এখানে অপ্রতুল নেই। পান করবার জন্য কলের জল আছে। পথে জল নেবার জন্য অসংখ্য হাইড্রাণ্ট, আর খুব তোড়ে তাতে দিবারাত্রি জল পাওয়া যায়। এই জল আসচে হারবন থেকে। সেখানে পাহাড়ের উপর লেক্ আছে।

পাহাড়ের জল সেই লেকে অজস্র ধারে জমা হচ্ছে। লেকটি শালও পরিষ্কার কাচা হয়। যেখানে শাল কাচা হয়, সে অংশের খুব হুঁশিয়ার প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, কেউ না স্পর্শ করতে নাম গাগ্‌রিবল। গাগ্‌রিবলের দৃশ্য চমৎকার। ডালের

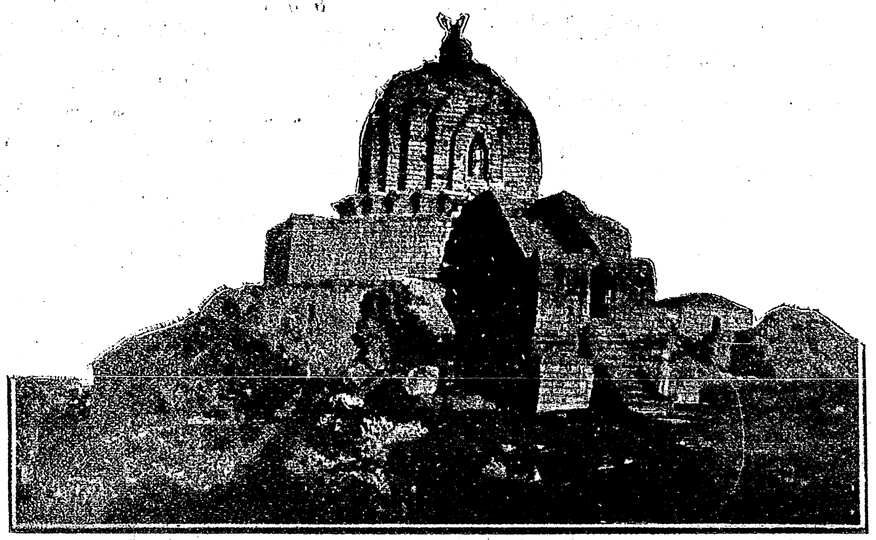

শঙ্করাচার্য্য পাহাড়

পারে। হারবন দেখার অনুমতি নিতে হয় রাজ-সরকার থেকে। অনুমতি-পত্র ছাড়া হারবনের গণ্ডীর মধ্যেও কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

নদী—ঝিলাম্। নাম বিতস্তা। কাশ্মীরীরা বলেন ভেট্। বারামুলা-অঞ্চলে ঝিলামের নাম কাশুর দরিয়া; তারপর ডোমেলের কাছে যেখানে কিষণগঙ্গ নদীর সঙ্গে কাশুর দরিয়া মিশেছে, সেই অঞ্চল থেকে ঝিলাম নামেই প্রসিদ্ধ।

তার পর হ্রদ। কাশ্মীরে অসংখ্য হ্রদ। শ্রীনগরে ডাল্ হ্রদ। খুব স্বচ্ছ জল, আর এত পরিষ্কার যে জলের নীচে মাছগুলো খেলা করে বেড়াচ্ছে, দেখা যায়—এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। ডালের অর্থই হ্রদ। ডালের জল এত পরিষ্কার যে এর একটি জায়গায় শাল কাচা হয়। জল খুব soft; তাতে খুব মিহি

পরিধি হলো লম্বে পাঁচ মাইল, চওড়ায় দু' মাইল। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের নীচেই। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা, আর পাহাড়ের বুকে মাঝে মাঝে হালের বাংলা-সারী,—

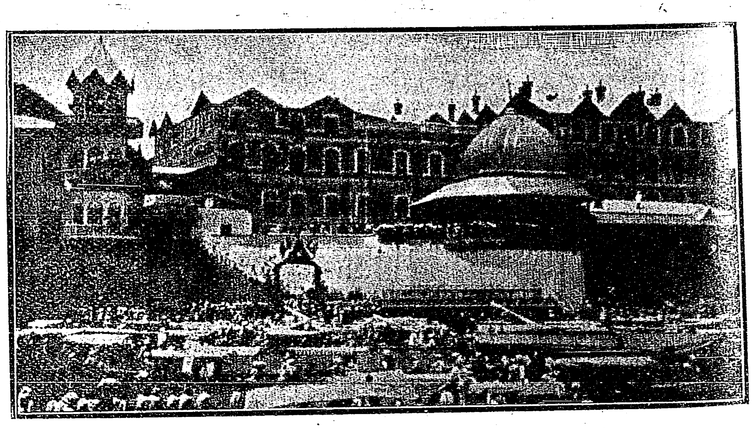

শ্রীনগর—প্রাসাদ

ও সেকালের 'পরীমহল', 'চশ্‌মা-সাহী'। ছবির মত দেখায়!

কাশ্মীরের বিখ্যাত উলার হ্রদ হলো বন্দীপুরের কাছে গিল্‌গিট যাবার পথে। উলারের অর্থ গুহা (cave)।

উলারের বিস্তার ১৫ মাইল। জল খুব গভীর—ঝড়ের সময় উলারে বিপদের ভয় খুব বেশী। বড় বড় হাউস-বোট ঢেউয়ের জোরে তীরে এসে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ে; এবং এ ঝড় খুবই আচম্বিতে ও অকস্মাৎ নামে! উলারে বেড়াতে যেতে হলে সকালে আসতে হয়—বিকালের দিকেই ঝড় ওঠে। উলারের মাঝিরা ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারলে তখনি হুঁশিয়ার হয়ে চট্‌পট্ বোট তীরে নিয়ে আসে। উলারের পাশে মস্ত পাহাড়; তার নাম বাবা শফরুদ্দিন। এই পাহাড়ের মাথায় এক পীরের আস্তানা আছে।

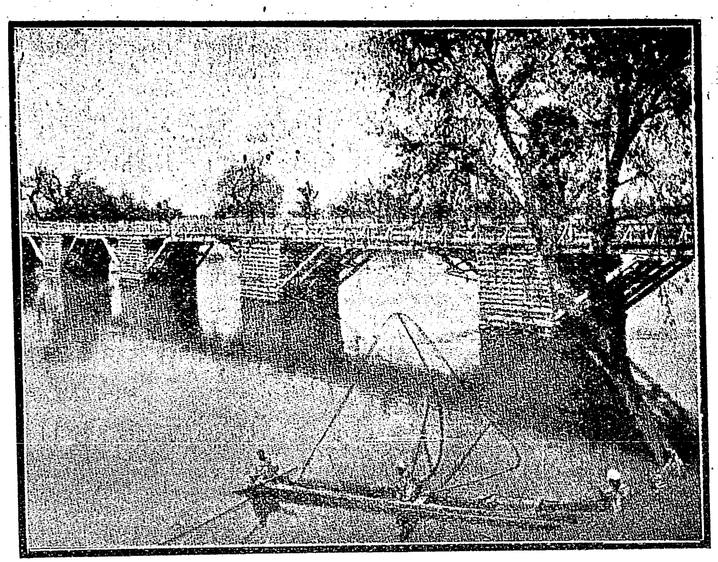

ঝিলামের বুকে পঞ্চম সেতু

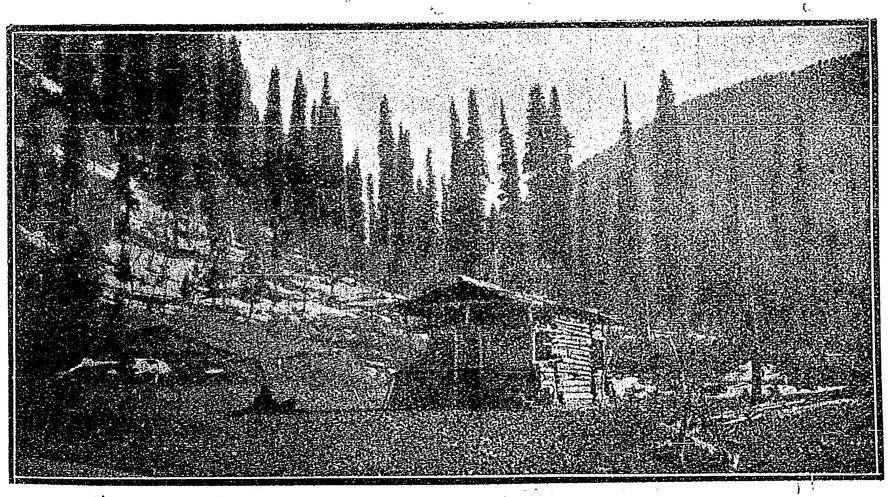

কাশ্মারের সাধারণ গৃহের নমুনা

কাশ্মারে কলেরা, বসন্ত, এই দুটী রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। কাশ্মীরীরা যে-অঞ্চলে থাকে, সে-অঞ্চলে অত্যন্ত সরু গলি,—কাশীর গলি তো তার কাছে চৌরঙ্গী! এই গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোট ছোট ঘেঞ্জি বাড়ী-ঘর—আর লোকগুলিও তেমনি নোংরা। দেহে ভগবান অজস্র রূপ ঢেলে দিলে কি হবে—এ রূপের তারা তোয়াজ জানে না! মেয়েদের স্নানের ভঙ্গী ভারী অদ্ভুত। মাথায় কবে সে কোন্ সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে বেণী যা বেঁধেছে—সে বেণী খোলেওনি, কোনোদিন! স্নানের সময় জলে মাথা ভেজায় না—সারা দেহ নগ্ন করে জলে ডুবিয়ে সে জল না মুছেই ঘাগরা

ঝুলিয়ে দেয়। বাড়ী গিয়ে জল মোছা সম্ভব! কিন্তু জলশুদ্ধ ভিজে গায়ে শুকনো ঘাগরা ঢাকা দেওয়া—এ একেবারে তাজ্জব দৃশ্য!

রোগ ছাড়া ভূমিকম্প এবং আগুন লাগার বিপত্তিও বড় অল্প নয়। ভূমিকম্পের জন্য বাড়ী সব কাঠের তৈরী। বিলাতী কটেজের মত—মাথায় চিমনি। চিমনি না থাক্‌লে শীতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত।

কাশ্মীরীদের ভাষা প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত; ভাষার নাম কাশুর। এবারের মত কাশ্মীরী ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বিদায় নেওয়া যাক্। এদের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার কতক মিল আছে—সেটুকু উপভোগ্য।

Boatকে কাশ্মীরীরা বলে, নাও; Green সব্‌জ্; White শ্বৎ; Copper ত্রাম্; Court-yard আঙ্গন; Cross তরণ্; Dance নৎসন; Day দো; Drink সেওন্; Lake ডাল্; Eye আথ; Forest ওয়ান্; Fowl কুকর্; Grand-father বুড়ীবাপ; Meat মাষ্; Milk দোধ্; Name নাও; Pigeon কোতর্; Right side দখণ; Snake সর্‌ফ্; Sunshine তাপ্; Washerman ধোব্; Wind আওয়া; Blood রত্।

ছুটী প্রবচনের নমুনা দি—

"গ্র-স্ত হস্ত"—এর মানে "চাষা, না হাতী!"

"বাতা ইয়ার বে-রোজগার"—এর মানে, "পণ্ডিত বন্ধু হয়, যখন তার রোজগার বন্ধ থাকে।"

কাশ্মীরের আরো বিশেষ কথা পরের বারের জন্য মুলতুবি রইলো।

শরৎ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

আবার এলে নূতন হয়ে
নূতন করে আবার এলে।
বনে মনে ফুটায়ে ফুল
এলে কমল নয়ন মেলে।
এলে নদীর কলস্বনে,
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে,
এলে রূপের রূপালিতে
বুকের ভাঙ্গা মৃণাল ঝেলে।
অতীতে আজ আন্‌লে ডেকে
চিরনূতন শানাই গানে।
শৈশবেরি নিমন্ত্রণ হায়
ভগ্ন গৃহের দরদালানে।
তোমার পানে নয়ন তুলে,
যাই যে বয়স যাই যে ভুলে,
'সরস্বতী'র রুদ্ধ বুকে
জোয়ার ভাটা আবার খেলে।
এলে মোদের বনশ্রীতে
গৃহশ্রীতে আবার তুমি,
মলিন আকাশ সুনীল করে
সবুজ করে কানন-ভূমি।
এলে শত যুগের স্মৃতি
এলে মধুর মিলন প্রীতি,
এলে ধূসর বালুর বেলায়
জোৎস্নারি সোহাগ ঢেলে।
আনো তোমার গজের পিঠে
মহামায়ায় আবার আনো,
স্নেহের অধিবাসের বাসর
মায়ের মায়া ভালই জানো।
আনো সম্বৎসরের আশা
আলিঙ্গন আর ভালবাসা
পুরানো ঘট আবার ভরি'
আনো নূতন চোখের জলে।
চিরনবীন চিরকিশোর
সবুজ হিয়ার তুমিই সাথী,
দিবস তোমার আলোয় ভরা
সুধায় ভরা শারদ রাতি।
চিরশ্যামল তোমার পথে
চাই যে আমি পথিক হতে
বুকের দীঘি পদ্মে ভরে
তোমার সরস পরশ পেলে।

পাকাদেখা

শ্রীনির্ম্মল দেব

আজ আমার বয়স সাতাত্তর বছর। তিন-কুড়ি সতেরোটা শরৎ-বসন্ত এই জীবনের রাঙা-মাটির পথ দিয়ে আনাগোনা ক'রেছে—রেখে গেছে স্মৃতির ধূলি-রেখায় তা'দের পায়ের চিহ্ন! সেই এক দিন সকাল-বেলায় বুনেছিলুম বীজ, তা'রই ফসল ব'সে ব'সে কাট্‌ছি আজ এই গোধূলি-বেলায়! আর বেশী দেরী নেই, বেলা প'ড়ে গেছে,—এখনই অন্ধকার হ'য়ে আস্‌বে। তা'র আগেই আমার এ ধানের আঁটি তুলে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌তে হবে—সাতাত্তরটা বছরের হাসি-কান্নার আল্‌পনা-আঁকা আঙিনায়। তা'র পর এই নতুন ধানে আমার নবান্নের উৎসব হবে, কিন্তু তা' ওই অন্ধকারের এপারে নয়, ওপারে,—নব-জীবনের অরুণ-আলোয়!

এই দীর্ঘ সাতাত্তরটা বছর আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে কত ফুল ফুট্‌লো, কত ফুল ঝ'রে গেল, কত সুর বাজ্‌লো, কত সুর থেমে গেল! কিন্তু সব ফুটে ওঠা—ঝ'রে যাওয়া, বেজে ওঠা—থেমে যাওয়ার মাঝখানে যে জিনিষটি আমার সারা-জীবন ভ'রে অক্ষয়-অমর হ'য়ে আছে,—যা'র পাপ্‌ড়ি কোনো দিন ঝ'রবে না, যা'র ঝঙ্কার কোনো দিন থাম্‌বে না,—আজ এই সন্ধ্যা-বেলা একলা ব'সে সেইটিকে নিয়েই নাড়্‌ছি-চাড়্‌ছি—ছোট বালিকার খেলা-ঘরের পুতুলের মতন!

যৌবনের সকাল বেলাতেই সেই যে না-বুঝে একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে ফেলেছিলুম, সেই একটিমাত্র ভুলেরই জের চ'লেছে কত বিচিত্র রেখায় এই দীর্ঘ জীবনের পথ বেয়ে। আজ এই নিঃসঙ্গ জীবনের সুদূর সীমান্তে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটাই বার-বার মনে হ'চ্ছে—সে ভুল কি আমার, না আমার অলক্ষ্য অদৃষ্টের! সেই ভুলটুকুই আজ আমার একমাত্র সম্বল—আমার পারের কড়ি! তখন মনে হ'তো—এই যে আমার যৌবন-প্রভাতে আশোয়ারীর রেশটুকু মিলোতে-না-মিলোতেই পূরবীর কড়ি-মধ্যম কেঁপে উঠ্‌লো, আমার জীবন-দেউলে বোধনের মন্ত্র থাম্‌তে-না-থাম্‌তেই বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো,—কেন এমন ভুল ক'রে ফেল্‌লুম! তখন সে ভুলের জন্যে কত-না কেঁদেছি, কত-না দুঃখ পেয়েছি! তখন তো বুঝি নি যে, ভুল ক'রে দুঃখ পাবার অনুভূতি যিনি দিয়েছেন, না-বুঝে ভুল কর্‌বার মূর্খতাও তো তাঁ'রই দেওয়া,—আমি কে! তাই আমার সব ভুল-ভ্রান্তির হিসাব-নিকাশের ভার, মানুষের ভুল ভ্রান্তির মালিক যিনি, তাঁ'রই হাতে তুলে দিয়ে, আজ চুপ্‌টি ক'রে ওপারের পানে চেয়ে ব'সে আছি—খেয়ার প্রতীক্ষায়!

* * * *

তখন আমার বয়স তেইশ বছর,—সেই বয়স, যে বয়সে পূর্ণিমার চাঁদ ডুব্‌তে চায় না, পাখীগুলো গান গেয়ে-গেয়ে হাঁপিয়ে পড়ে না, শেফালি-যূথিকা-চামেলির গন্ধ দখিণা বাতাসে দিবা-রাত্র ভেসে-ভেসেও ফুরিয়ে যায় না! পাশের পড়ার দোহাই দিয়ে মা'কে বরাবর ঠেকিয়ে রেখে, শেষে এক দিন যখন মা আবার সেই কথা পাড়্‌তে আর সে পুরোনো দোহাই না দিয়ে চুপ ক'রে রইলুম, তখন মা আমার মৌন সম্মতিতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোমর বেঁধে ঘর-আলো-করা বৌ খুঁজ্‌তে সুরু ক'রে দিলেন। সে যেন একটা সুন্দরী-স্বয়ম্বর যজ্ঞ লেগে গেল! দুনিয়ার যেখানে-যেখানে সুন্দরী কুমারী ছিল, তা'দের খুঁজে বা'র কর্‌বার জন্যে ঘটক-ঘট্‌কীদের মধ্যে একটা তুমুল সাড়া প'ড়ে গেল। শেষে সকলের সৌন্দর্য্য যাচাই ক'রে নির্ব্বাচিত হ'লো আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। পণের হাঙ্গামা ছিল না, তাই কেবলমাত্র রূপের জোরেই পাত্রী ঠিক হ'য়ে গেল।

তরুণ জমীদার আমি। সাত-শ টাকা দামের হীরের দুল দিয়ে মামা পাকা দেখে এলেন। সঙ্গে গেছ্‌লো সুনীল—আমার আজন্ম-সুহৃৎ। সে ছিল কবি—রূপ চিন্‌তে পাকা জহুরী! তাই তা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে তা'কে মামার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

দিন-পনেরো পরে বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা বাগানে নদীর ধারে ঝাউ-গাছের তলায় একটা ইজি-চেয়ারের ওপর এলিয়ে প'ড়ে ভাব্‌ছিলুম—এই পনেরোটা দিন ফুরোতে কতদিন লাগবে!—কবে আস্‌বে

সে-দিন, যেদিন জ্'লে উঠ্'বে সেই রূপের প্রদীপ-শিখা আমার এই দীপহীন দেউলে,—কবে এক দিন সানাইয়ের বাঁশীর সুরে চেলী-চন্দনে সেজে, সিঁদুরের রাঙা রাগে সে এসে দাঁড়াবে তা'র রক্ত-চরণ ফেলে, আমার এই অন্তর-জোড়া তরুণ-যৌবনের-কল্পনা-চিত্রিত পিঁড়িখানির ওপর—মূর্ত্তিমতী উষার মতন!

সুনীল এসে আমার পাশে ঘাসের ওপর ব'সে প'ড়লো। মনের নিবিড় কৌতূহল গোপন ক'রে, বাহ্যতঃ নিস্পৃহভাবে তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কেমন দেখ্‌লি রে সুনীল ?"

সুনীল ব'ললে—"চমৎকার! কিন্তু ভাই—"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কিন্তু কি ?"

সুনীল একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললে—"তা'র পিঠে বোধ হয় ভাই, একটু কুঁজ আছে!"

বুকের ভেতরটা ধ্বক ক'রে উঠ্‌লো। আকণ্ঠ উদ্বেগ অতি কষ্টে চেপে সহজভাবে তা'কে ব'ললুম—"দূর! তুই ভুল দেখেছিস্! বোধ হয় সে লজ্জায় একটু সাম্‌নে ঝুঁকে প'ড়েছিল, তুই তা'ই কুঁজ ভেবেছিস্।"

সুনীল তা'তেও নিশ্চিন্ত না হ'য়ে ব'ললে—"না ভাই, আমার মনে হ'লো পিঠের ওপর কি যেন উঁচু হ'য়ে আছে! সে নিশ্চয়ই কুঁজ!"

সূর্য্যাস্তের গৈরিক আভাটুকু সন্ধ্যার আকাশ হ'তে যেন পলকের মধ্যে আমার চোখের সাম্‌নে নিভে গেল! যেখানে-সেখানে, যখন-তখন তা'র অপূর্ব্ব রূপের খ্যাতি শুনে-শুনে আমার যৌবনের কল্পলোকে নীরবে নির্জ্জনে ব'সে তা'র যে বিচিত্র মানসী-মূর্ত্তি ধীরে-ধীরে গ'ড়ে তুলেছিলুম, আজ একটা নিমেষে সে মূর্ত্তি যেন ভেঙ্গে-চূরে গুঁড়িয়ে গেল! আর কিছু ব'লতে পারলুম না। সুনীলের মনে সংশয় জেগেছে, নিশ্চয়ই কোনো একটা বিশেষ রকম গোলমাল আছে!

রাত্রে মা ভাঁড়ার-ঘরে ব'সে মামার সঙ্গে বিয়ের আয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলেন, আমি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তাঁ'দের সাম্‌নে গিয়ে ব'ললুম—"মা, আমি বিয়ে ক'রবো না!"

মা ব'ললেন—"কেন রে, আবার কি হ'লো ?"

আমি ব'ললুম—"না, আমি বিয়ে ক'রবো না!"

মা ব'ললেন—"সে তো বুঝলুম, কিন্তু কারণটা কি বল না!"

আমি কোনো ইতস্ততঃ না ক'রে সোজাসুজি ব'লে ফেল্‌লুম—"শেষে তোমরা কোথেকে একটা কুঁজো মেয়ে ঠিক ক'রেছো!"

মা বিস্মিত-চক্ষে আমার শুষ্ক মুখের পানে চেয়ে ব'ল্‌লেন "সে কি রে! এত লোক এত বার দেখে গেলো, আমি নিজেও দেখে এসেছি, সকলেই একবাক্যে মরি, মরি ব'ললে, কারুর চোখে কোনো খুঁত প'ড়লো না, আর তুই আজ ব'লছিস্ কি না সে কুঁজো! এ বাজে খবর তুই কোথেকে পেলি ? আর তা' ছাড়া সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে—পাকা-দেখা পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে, এখন এ সম্বন্ধ মিছিমিছি ভেঙ্গে দেওয়া কতখানি অন্যায় হবে বল্ দিকিন! তা'রা গরীব হ'লেও এতখানি অভদ্র ব্যাপার কি করা উচিত ?"

আমি তবু অবিচলিতভাবে ব'ললুম—"না, ও মেয়ে আমি বিয়ে ক'রবো না!—বিয়েই ক'রবো না!"

মা উদ্বিগ্ন-চিত্তে ব'ললেন—"আচ্ছা, আমি বন্দোবস্ত ক'রছি, তুই নিজে গিয়েই একবার দেখে আয়! তা'র পর এসে বলিস্।"

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

* * *

হাতীতে চ'ড়ে, লোক-লস্কর নিয়ে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ক'রে মামার সঙ্গে মেয়ে দেখ্‌তে গেলুম। এক জীর্ণ কুটীরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতেই, একটি স্নিগ্ধ-সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে, আমাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে, ভেতরে নিয়ে গিয়ে মাটির দাওয়ার ওপরে স্বহস্তে একখানা মাদুর পেতে সস্মিত মুখে দু'টি হাত বাড়িয়ে আমাদের ব'সতে ব'ললেন। আমাদের ধন-দৌলতের খ্যাতি এ অঞ্চলে লোকের মুখে-মুখে ফির্‌তো। সেই ধনী জমীদার-বংশের একমাত্র দুলাল আমি—আমি যে তাঁ'র সামান্য পর্ণ-কুটীরে এসে ব'সেছি, আমার যোগ্য সমাদর যে কিছুই হ'চ্ছে না—সেজন্যে কোনো কুণ্ঠার ছায়ামাত্রও বৃদ্ধের হাবে-ভাবে ভাষায়-ভঙ্গিমায় প্রকাশ হ'লো না! জীবনে সেই একটি দিনমাত্র বিস্মিত হ'য়ে দেখেছিলুম—দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্যের সাম্‌নে কেমন ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ায়!

মামা বৃদ্ধের সঙ্গে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি বিষয়ে রঙ-বেরঙের গল্প জুড়ে দিলেন। আমি নিঃশব্দে ব'সে তাঁর ঘর-দোরের ওপর চোখ বুলোতে লাগ্‌লুম। পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন দেওয়াল, মেজে; আঙিনার সর্ব্বত্রই একটি কল্যাণী গৃহ-লক্ষ্মীর দরদী হাতের পরশ যেন ফুলের মতন ফুটে র'য়েছে! ছোট আঙিনার এক প্রান্তে শিউলি-গাছের তলায় একটি তুলসী-মঞ্চ,—ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলে মঞ্চটির চার পাশ ছেয়ে গেছে। ধনীর প্রাসাদে ভোগ-ঐশ্বর্য্যের নিত্য সমারোহের মধ্যে আজন্ম-বর্দ্ধিত আমি—আজ এই সুন্দর, সুশ্রী দারিদ্র্যের রিক্ত, শূন্য, তাপস মূর্ত্তি আমার চোখে বৈচিত্র্যের হিসাবে বড় ভাল লাগ্‌লো!

খানিক পরে মামার কথার ইঙ্গিতে বৃদ্ধ মেয়েকে আন্‌বার জন্যে উঠে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃদ্ধের সঙ্গে একটি মেয়ে এসে আমাদের আনত প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে আমাদের সাম্‌নে একটু দূরে গিয়ে ব'স্‌লো।—আসতে আসতে উদ্দাম লজ্জায় তার পা-দুটো জড়িয়ে গেল না,—আমাদের সাম্‌নে ব'সে অকারণ কুণ্ঠায় তার মাথাটা বোলের কাছে ঝুঁকে পড়লো না,—সহজ সরল ভাবে অসঙ্কোচে সে আমাদের পানে দুটি কালো চোখের অকুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে চাইলে। আমি সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে, লজ্জার জড়িমা জোর ক'রে কাটিয়ে ফেলে, উৎসুক চোখ তুলে তার দিকে তাকালুম। খানিকক্ষণ আমার চোখের পলক পড়লো না! —সুন্দরী বললে তার কিছুই বলা হয় না,—অপ্সরী বললেও তার বেশীর ভাগ না বলাই থেকে যায়! সে ভোরের শুকতারার অচঞ্চল আলো, স্তব্ধ গভীর নিশীথে দূর বেহাগের মূর্চ্ছনা, শরতের স্বচ্ছ নীল সন্ধ্যাকাশে সূর্য্যাস্তের গৈরিক আভা!—তেম্‌নি নিবিড়, তেম্‌নি গভীর, তেম্‌নি মহান! না, না,—সে এসবকে ছাপিয়েও আর কিছু! সে যে কি—তা আমি জানি না!—সেদিন জানি নি, পরে জানি নি,—এই বিচিত্র দীর্ঘ জীবনের কোনো দিন জান্‌তে পারি নি! সে তাই—যা দেখে বিস্মিত পুলকে, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়;—"কী সুন্দর!" বল্‌বার চেতনাটুকুও দেহের মধ্যে থাকে না। মঞ্জরিত যৌবনের বসন্তোৎসব তার দেহের মাধবী-কুঞ্জে সুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সে উৎসবের বাঁশরী-ধ্বনি যেন তার কাণে গিয়ে এখনও পৌঁছয়নি,—এখনও যেন তার শিশুকালের মনটি পড়ে আছে সেই খেলাঘরের পুতুলেরই দিকে! কিন্তু এমন একটা সস্মিত গাম্ভীর্য্য তার নধর মুখখানির ওপরে মাখানো যে, মুখ দেখে তার বয়স পাঁচ কি পঁচিশ তা ঠিক করা একটা দুরূহ ব্যাপার!

আমি চুপ করে বসে মনে মনে স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করতে লাগলুম। ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙীন কল্পনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমার চিত্ত-সৈকতে শত ধারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বেলা পড়ে আসছিলো; বিদায়মান সূর্য্যের একটা পথহারা রশ্মি শিউলি গাছের ফাঁক দিয়ে তার অকম্পিত মুখের ওপরে এসে পড়েছিলো—দেবী-প্রতিমার মুখে সন্ধ্যারতির পঞ্চ-প্রদীপের আলোর মতন!

কতক্ষণ আমার এমন মুগ্ধ বিহ্বল ভাবে কেটে গেছলো, সে খেয়াল আমার ছিল না। চমক ভাঙলো—যখন মামা আমার গায়ে হাত রেখে একটু নাড়া দিয়ে বললেন—"কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও তো করো।"

আমি লজ্জা পেয়ে শুধু বললুম—"না।"

বৃদ্ধ স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন—"ভালো করে দেখে নাও বাবা, পিঠে কোনো দোষ আছে কি না,—মনের কোণে কেন একটা অকারণ সন্দেহ থেকে যায়!"

মাথাটা আমার নিদ্রিতের মাথার মতন মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো,—মনে মনে নিজেকে শত ধিক্কার দিয়ে আমি নির্ব্বাক হয়ে রইলুম।

তেম্‌নি সশ্রদ্ধ প্রণাম করে সে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল—গোধূলি বেলায় দিনান্তের শেষ আলোটুকুর মতন,—আমাদের সাম্‌নেটা অন্ধকার করে!

আরও খানিক ক্ষণ এ-কথা সে-কথায় কেটে গেল। আমরা উঠবো-উঠবো করছি, এমন সময়ে ভেতর থেকে একটা স্নিগ্ধ আহ্বান এলো—"বাবা!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠে "এখনই আসছি!" ব'লে চ'লে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ফিরে এসে একটা ভেলভেটের কৌটো আমার হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও বাবা।"

আমি চেয়ে দেখলুম—সেই হীরের দুল, যা দিয়ে মামা পাকা দেখে গেছলেন। বৃদ্ধের কথার অর্থ কিছুই বুঝতে না পেরে সেটাকে হাতে ধরে আমি অভিভূতের মতন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম! বৃদ্ধ বললেন—"দেখে নাও বাবা, ঠিক আছে কি না; ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমার মেয়ে চির-কুমারী থাকতে চায়!"

মামা প্রগাঢ় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন ?"

শান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন—"কেন তা' তো জানি না;

তার কোনো কাজের 'কেন' আমি কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, জিজ্ঞাসা করবার দরকারও কোনো দিন হয় নি। কারণ, দারিদ্র্যের শূন্য কোলেই সে আজন্মকাল মানুষ হয়েছে, তাই সে যা' বলে, সব দিক ভালো ক'রে ভেবে-চিন্তে, স্থির-সঙ্কল্প হ'য়ে বলে।"

মামা ব'ললেন—"এটা কি ভালো হচ্ছে বেয়াই মশাই?"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে ব'ললেন—"ভালো-মন্দর বিচার সত্যিই আমি এতদিনেও ক'রতে জানি না ভাই! তবে শুধু এইটুকু জানি—মানুষ তার নিজের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের পানে চেয়েই জগতের ভালো-মন্দর বিচার করে। যদি অপরের অন্তরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে সে-বিচার ক'রতো, তা' হ'লে ভালো-মন্দর রঙ্ ব'দলে যেতো!"

* * * * *

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১

কিরণের সহিত সেদিনের সাক্ষাতের পর হইতে দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আর লীলার সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই।

কিরণ অধীর চিত্তে লীলার আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে ডাকিবার কথা মনে হইলেই লীলা কাঁপিয়া উঠিত। সেদিনের পর হইতে তাহার সহিত আগের মত সহজ ভাবে দেখা করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিরণও আর পূর্ব্বের মত অকুণ্ঠ ভাবে তাহার কাছে আসিতে পারিত না।

দীর্ঘ দুই মাসের পর সেদিন লীলা বৈকালে ড্রয়িংরুমে নামিয়া আসিয়া বসিয়াছিল। বীণা তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল, ও মধ্যে মধ্যে অধীর ভাবে জানালার মধ্য হইতে পথের দিকে চাহিতেছিল।

সুস্থ হইবার পর হইতে লীলা বীণার মধ্যে একটা অত্যন্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত। তাহার পূর্ব্বের সে চাঞ্চল্য ও কৌতুকপ্রিয়তা অনেকাংশে ঘুচিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহার চোখে-মুখে যে একটা ভোগ-বিলাসের ও অসার দম্ভের প্রখর দীপ্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিত, তাহা লুপ্ত হইয়া একটি কোমল মধুর ভাব তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লীলার রোগের সময় হইতে সে তাহার সমস্ত আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—সাধ্যমত তাহার সেবা করিত। লীলা অনুতপ্ত মুগ্ধচিত্তে ভাবিত, এই বীণাকে সে এতদিন হৃদয়হীনা অসার-প্রকৃতি বলিয়া কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, কত অবহেলা করিয়াছে।

দুই ভগিনীর আলাপের মধ্যে কুমার গুণেন্দ্রভূষণ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

'এই যে! আপনি আজ নেমে আসতে পেরেছেন!' কুমার অত্যন্ত বিনম্রভাবে লীলাকে নমস্কার করিয়া বীণার পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। পরে লীলাকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলিলেন—কি চেহারাই হয়ে গেছে আপনার—ঠিক যেন ছোট পাখীটির মত! যাহোক্ ভাল হয়ে উঠেছেন যে, সেইটাই লাভ! যে ভয় আমাদের হয়েছিল!

লীলা একটু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল!

কুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বীণার মুখ আগ্রহে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—জানো লিলি, তোমার অসুখের সময় ওঁর যে কি ভাবনা আর কি ভয়, সে যদি দেখতে! বাড়ীতে স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, সকালে চা খেয়েই এখানে এসে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বসে থাকতেন। আবার ফিরে গিয়ে নাওয়া খাওয়া সেরে সেই যে চলে আসতেন, একবারে রাত দশটা পর্য্যন্ত! কতদিন বাড়ী যেতেই চাইতেন না,—মা কত বুঝিয়ে, কত করে পাঠিয়ে দিতেন। সারাক্ষণ ভেবে ভেবে অস্থির!

—ভাবনা হবে না? সে কি সহজ কাণ্ডটি হয়েছিল বীণা? আর তা ছাড়া, আমি এ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তোমাদের সুখ-দুঃখ ঠিক তোমাদের মতই সমান ভাবে

আমি অনুভব করি। বাইরের লোকের মত একবার এসে খোঁজ খবর নিয়ে চলে গেলে ত আমার মন বুঝতো না! কুমার অত্যন্ত কোমল স্বরে বীণাকে কথাটা বলিয়া লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত আমার কিসে লেগেছিল জানেন? কেবলি আমার মনে হত যে, যে দিনই আমার সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হলো, তার দু' ঘণ্টা না যেতে যেতেই কি সেইখানে সঙ্গে সঙ্গে এমন শক্ত অসুখ? তখনো ভাল করে একটা কথা পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে কইতে পারি নি, অথচ পিসীমার কাছে আপনাদের কথা শুনে পর্য্যন্ত আলাপ করবার জন্য এত আগ্রহ এত ইচ্ছা কতদিন থেকে মনে রয়েছে। নানা কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আসা আর হয়ে উঠছিল না। তা যদি বা অনেক কষ্টে কোন মতে আসা হলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার—কি জানি তখন কেমন আমার মনে হত যে, আমার সঙ্গে দেখা না হলে হয় ত আপনার এমন অসুখ হতো না। অবশ্য এ কথাটার কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। তবু সে সময় খালি ঐ কথাটা মনে হয়ে কেবলি আমার নিজের উপর বড় রাগ হতো!

কুমারের সঙ্গে লীলার পরিচয় কেবল দু' তিন মিনিটের মাত্র, তবু তিনি এমন নম্র মৃদু ভাবে, এমন আত্মীয়তার ভঙ্গীতে কথাগুলি বলিলেন যে, লীলা অপরিচিতের এত ঘনিষ্ঠতার অধিকার লওয়ায় বিরক্ত হইতে পারিল না।

সে বলিল—আপনি আমার কথা ভেবে এত দিন কষ্ট পেয়েছেন, আমি তার কিছুই জানতুম না। সংসারে বন্ধুবান্ধব অবশ্য অনেক পাওয়া যায়, তবে প্রকৃত ব্যথার ব্যথী বন্ধু লাভ অনেক সৌভাগ্যের কথা। আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু রূপে পেয়ে আমিও খুব সুখী হলুম। এখন এখানেই ত থাকবেন কিছু দিন?

—সেই রকম ইচ্ছেই ত আছে। অবশ্য আবার সেখানে বিশেষ দরকার যদি না পড়ে। তা আপনি এখন বেশ সুস্থ আছেন ত মিস রায়? আর ত কোন রকম অসুখ নেই?

লীলা বলিল—অসুখ বিশেষ কিছু নেই,—এখন গায়ে আর একটু বল পেলেই বাঁচা যায়। অসুখের চেয়ে এই ঘরের মাঝে বন্দী হয়ে থাকাটা যেন আরো কষ্টকর হয়ে উঠেছে! কতকাল যে বাড়ী থেকে বেরোই নি, তা মনেই পড়ে না! মনে হচ্ছে যেন আজন্মকাল এমনি ঘরে বসেই কেটেছে!

—সত্যি! বাড়ীতে বসে বসে এমনি অস্বস্তিই ধরে বটে! আমি ত কাজকর্ম্মের সময় ছাড়া এক মুহূর্ত্ত বাড়ীতে বসে থাকতে পারি না। বড়দিনের সময় আমরা সকলে মিলে শিকারে যাব স্থির হয়েছে। এখানে শিকার আর কি—এই একটু বেড়ানো, আমোদ আহ্লাদ, আর দু' একটা পাখী মারা এই আর কি! মেয়েরাও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে যাবেন ঠিক হয়েছে। তত দিনে আপনি যদি আর একটু সারেন, তা হলে আমাদের সঙ্গে বেরোবেন—আপনি ত খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারেন শুনেছি। খুব বেড়ানো হবে সমস্ত দিন—আপনার বেশ ভালোই লাগবে।

—দেখা যাক্, যদি পারি, নিশ্চয়ই যাব—ফাঁকা হাওয়ায় যাবার জন্যে আমার মন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

লীলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিরণ মিসেস রায়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে প্রতি দিনই এই সময় তাঁহাকে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরাইয়া দিতে আসিত। প্রতি দিনই তাহার আশা হইত, যদি লীলার সঙ্গে দেখা হয়। আজ তাহাকে দেখিয়া সে তাহার পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল।

মিসেস রায় কুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—এই যে গুণেন্দ্র! তুমি এখানে! ক্লাবে সকলে আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল! ওরা বলছিল তুমি যে ক্লাবে যাওয়া, সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করা, সবই ছেড়ে দিলে—ব্যাপারটা কি! তা আর যাও না যে?

কুমার বলিলেন—গিয়ে কি হবে বলুন? আমার ও-সব সঙ্গ আর ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গ মন থেকে ভাল লাগে, সেইখানেই ঘুরে-ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, সেইখানে বসেই সময় কেটে যায়—পাঁচ জায়গায় যাবার সময়ই বা কোথা? কথাটা বলিয়া কুমার হাসিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিলেন।

—তা বেশ বাছা! যেখানে ভাল থাক সেখানেই থেক। লীলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে? বলিয়া মিসেস রায় প্রীতি-প্রফুল্লমুখে বলিলেন—গুণেনের সঙ্গে আলাপ করো লীলা! অমন গুণের ছেলে আর হবে না! কিরণ, বসো তোমরা, আমি কাপড় ছেড়ে এখনি আসছি।

মিসেস রায় চলিয়া গেলে, লীলা কুমারের উদ্দেশে বলিল—আপনারা বসুন, ঠাণ্ডা পড়ছে, আমি এবার ঘরে যাই।

কিরণ তখন বলিল, তুমি বেড়াতে যাবার কথা বলছিলে না? কবে একটু বাইরে যেতে পারবে বলো? তা হলে আমি বিকেলে এসে তোমায় নিয়ে যাব!

লীলার মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস জমিয়া উঠিল! কিরণের সঙ্গে একা বেড়াইতে যাইবার কথায় আজ আর সে সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বীণা বলিল—আজ সকালে বাবা বলছিলেন, কাল থেকে আমাদের ক্লাবে ছেড়ে দিয়ে তিনি লিলিকে সন্ধ্যেবেলা একটু করে বেড়িয়ে আনবেন। ডাক্তার মত দিয়েছেন। তার পর সে একটু হাসিয়া আবার বলিল—জান্‌লেন কিরণ বাবু! অসুখের পর থেকে বাবার যত টান সব লিলির উপর! আমার কথা আজকাল তাঁর একবারও মনে পড়ে না!

কিরণ হাসিয়া বলিল—তাই না কি? এটা ত তাঁর বড় অন্যায় পক্ষপাত বলতে হবে! আচ্ছা! এবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি এ কথা বোলবো তাঁকে। তা হলে আমি কাল বেলা চারটের সময় এখানে আসবো কি লিলি? যেতে পারবে ত?

লীলা বলিল—তাই এসো! বাবাকে আমি বলে রাখবো, তিনি তাতে খুসি হবেন। আমি এখন কতকটা বল পেয়েছি। গাড়ীতে তোমার সঙ্গে যেতে কষ্ট হবে না বোধ হয়।

রাত্রে একা বিছানায় পড়িয়া লীলা নিজের ভাবনা আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। কিরণের সঙ্গে যখন তাহার কোন সম্বন্ধ হইবার উপায় নাই, তখন আর এ ভাবে তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিয়া মনকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। এ কয়দিন সে নিজের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করিয়াছে, কিরণের কথা ভুলিয়া অরুণকে ভাবিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সবই বৃথা! কিরণের সেই আবেগময় কণ্ঠস্বর, তাহার সেই অনুরাগদীপ্ত অনিমেষ দৃষ্টি, প্রেমপূর্ণ মধুর কথা লীলা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। কিরণের একাগ্র প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে বলিয়া দিত, সে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু লীলা যে নিশ্চিতই জানে তাহার এ অপেক্ষা বৃথা—অরুণের উপর সবই নির্ভর করিতেছে। অরুণ ত কোন দিনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। কিরণের জন্য বেদনায় দুঃখে অনুক্ষণ তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল। যাহার সঙ্গে মিলন তাহার কাছে স্বর্গ-সুখেরও অধিক প্রার্থনীয়, কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহাকে ছাড়িয়া হয় ত অরুণকে বিবাহ করিতে হইবে,—অরুণের সাধ্বী সেবাপরায়ণা পত্নী হইতে হইবে!

কিন্তু তবু যখন তাহার সেদিনের কথা মনে পড়ে, তখন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা পুলকের শিহরণ তড়িতের মত বহিয়া যায়! তাহার অন্তর দুর্নিবার আনন্দের বন্যায় ভাসিয়া যায়! কিরণ—কিরণের মত অসাধারণ—লোক তাহাকে ভালবাসে!

মনের এই অদম্য আবেগ ভুলিয়া কিরণকে পূর্ব্বের মত কেবলমাত্র বন্ধু ভাবে ভাবিবার জন্য লীলা প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝিতেছিল। সে অপরের নিকট বিবাহ-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ—কিরণের প্রতি মনের এ ভাব তাহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত—এই চিন্তা তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিত্তকে নিয়ত পীড়া দিত, অথচ সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ একা ঘরে পড়িয়া পড়িয়া সে এ চিন্তা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

সেদিন ক্ষান্ত একটু সকাল সকাল শুইতে আসিল। লীলাকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল—এই যে তুমি এখনো জেগে আছ? আমি তাই একটু সকাল করে এলুম—বলি—তুমি যদি আবার ঘুমিয়ে পড়!

লীলা বুঝিল—ক্ষান্ত আজ কোথা হইতে নূতন কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সে বলিল—কেন—এত রাত্রে তোর আবার আমার সঙ্গে কি দরকার পড়লো?

দরকার এই যে বলি! বলিয়া ক্ষান্ত সেইখানে বসিয়া পড়িল—তাহার পর বিষম উত্তেজিত ভাবে আরম্ভ করিল—হ্যাঁ গা দিদিমণি! তোমাদের এ কেমন ধারা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড বল দেখি? একে ত এই সব সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে দিবে রাত্তির যত পুরুষমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেচে বেড়ানো! তার উপর ওই যে সব মড়ুইপোড়ারা এখানে ধেই ধেই করে নাচতে আসে, তাদের একটু দেখে শুনে খবর নিয়েও কি আনতে নেই? যে সে এসে ঘরে ঢুকলেই হলো? গড় করি বাছা! তোমাদের পায়ে আর তোমাদের মা বাপের পায়ে! এমন কাণ্ড আমার বাবার জন্মে কখনো দেখিও নি—দেখবোও না—ছি! ছি! ছি! লজ্জায় ঘেন্নায় আমার যে মরতে ইচ্ছে করছে!

লীলা বলিল—এই! আজ আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে

দেখছি! কি হয়েছে কি? সেইটা আগে বল্ না—মরতে ইচ্ছে হয়, তার পরে মরিস এখন! অমন করে বকে মরছিস কেন?

—বকে মরছি কেন? তোমাদের যা সব রীত্ চরিত্তির হচ্ছে—তাই দেখে দেখে থাকতে পারি নি—বকে মরি—বলি—আজ বিকেলে তোমাতে আর বড় দিদিমণিতে বসে যার সঙ্গে গপ্প করছিলে—সেই যে গো—খুব টক্‌টকে রং—দু হাতে হীরের আংটি জ্বল জ্বল করছে—সেই মুখপোড়া মিন্সে এখানে এসে ভাল মানুষের মত কোথা থেকে জুটলো বল ত? বদমাইসের ধাড়ি—শয়তানের বাচ্ছা—ঘাটের মড়া—সাত-ঘর মজিয়ে—

লীলা ক্ষান্তর গালাগালির উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া অত্যন্ত রাগিয়া বলিল—আরে মর! তোর যে বড় বাড় বেড়েছে দেখছি! মুখ সামলে কথা বলতে পারিস না? যত কিছু না বলি—ততই আস্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়ে উঠছে! ভদ্রলোকের ছেলেকে তুই অমন করে গাল দিস্ কোন আক্কেলে?

—ভদ্দর লোক! ওর সাত-পুরুষে কেউ ভদ্দর লোক নয়! পয়সা থাকলেই কি ভদ্দর লোক হয় গা? ও ওমনি করে লোকের ঘর মজিয়ে বেড়ায়! সেই যে গো—তোমায় বলি নি? ওই মুখপোড়াই ত সেই ডেপুটি বাবুর ভাইয়ের বউকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে! এখন সে ছুঁড়ীর খোয়ারের অন্ত নেই! তার দিকে একবার ফিরেও চায় না—সে দাসীদের মহলে দাসীদের কাছে পড়ে আছে।

লীলা চমকিয়া উঠিল! ক্ষান্ত এ কি বলিতেছে! কুমার গুণেন্দ্রভূষণ! কুমার সেই শোচনীয় কুৎসিত কাণ্ডের নায়ক? অকস্মাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে নিজে কুমারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয় বটে, তবে যেটুকু সে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানের পাত্র বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। আর আজ সন্ধ্যার সময় সে তাহার নিজের বাড়ীতে কুমারের যে আদর ও মান্য দেখিয়াছে, তাহাতে তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। কুমার যে-কোন ভদ্র-পরিবারে এ ভাবে মিশিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহার এ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষান্ত তাঁহার সম্বন্ধে এ সব কথা কি বলে? সে কিছু বুঝিতে পারিল না, অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল—তুই এ কথা জানলি কি করে? উনি আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু, সম্প্রতি কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন—উনি ত এখানে থাকেন না। ওঁর নামে এ সব কথা কে বলেছে তোকে? আর জোছনাকে যে নিয়ে এসেছে—তুই কি তাকে চিনিস্ যে এ কথা বলতে এসেছিস?

ক্ষান্ত হাত নাড়িয়া বলিল—আমি তাকে চিনবো কোথা থেকে? আমাদের সাতপুরুষে কেউ কখনো অমন দুষমণের ছায়া মাড়ায় না। আমার ধারে এলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে গায়ের ছাল চামড়া তুলে দেবো না? বয়েস যখন আমার অল্প ছিল, তা গুটর বয় না হই—কালো কোলোতে একটা ছিরি ছিল ত? মাথায় এই এক মাথা মিশ কালো চুল হাঁটুতে এসে পড়তো, তা গাঁয়ের এক মিন্‌সে গয়লা—

লীলা ধমক দিয়া বলিল—ফের! ওই সব আষাঢ়ে গল্প বানাতে বসলি? যা বলছি—এক কথায় তার জবাব দে! একটি বাজে কথা নয়! বল্—তুই ওঁকে চিনলি কি করে?

—বাবা! মেয়ে যেন ঘোড়সওয়ার! মেজাজ অষ্ট পহর তেরিয়া হয়েই আছে! বলি—আমি ওকে চিনবো কোত্থেকে গা? আমি যদি চিনতুম, তা হলে এই যে তোমার অসুখের সময় থেকে ও এসে এখানে জমিয়ে বসেছে, যখন-তখন আসছে যাচ্ছে, বড় দিদিমণির সঙ্গে দিবে-রাত্তির ফুস-ফুস গুজগুজ করছে, এ সব কি হতে পারতো? মা ত একেবারে ওর নামে গলে পড়ছে। বড় দিদিমণিও তাই! আমি বলি কে না কে—বড়দিদির সঙ্গে বিয়ে হবে বুঝি? আজ না কি আমার বোন—সেই যে গো—যে জোছনার কাছে আছে—সে সহরে এসেছিল—তা একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখে—না—বাইরের ঘরে তোমাদের সঙ্গে সে দিব্যি বসে গপ্প করছে! বামা তো দেখে অবাক্! বলে—এ শয়তানটা আবার তোদের এখানে জুটলো কি করে? ভয়ে সে তো আর দাঁড়ালো না, তোমাদের ওই রাজপুত্তুর যদি বামাকে এখানে দেখতে পেতো, তা হলে কি আর ওকে জোছনার কাছে থাকতে দিত? বাড়ী গিয়েই হয় তাকে দেশছাড়া করতো, না হয় আটক করে রাখতো—কথা জানাজানি হবে বলে!

লীলা স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। কুমারের সহিত বীণার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা আজ সে বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য

করিয়াছে। তাহার পিতা মাতা কখনো এ সম্বন্ধে বাধা দিবেন না। তাহার নিজেরও এ ঘটনা কিছু বিসদৃশ ঠেকে নাই। কিন্তু ক্ষান্তর বর্ণিত ব্যাপার যদি সত্য হয়, সত্যই যদি বাহ্যিক ভদ্রতা ও শীলতার আবরণের ভিতরে কুমারের এইরূপ জঘন্য চরিত্র হয়, তাহা হইলে বীণাকে সময় থাকিতে সাবধান করা উচিত,—এ ঘনিষ্ঠতা আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়! এখন কুমারের সম্বন্ধে আরও ভালরূপে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

লীলাকে নীরব দেখিয়া ক্ষান্ত আবার বলিল—বলি, সংসারটা কি কেবল পাজি বদমাইসদেরই আড্ডা গো দিদিমণি? দয়া ধম্ম বলে কি একটা জিনিস নেই? দিন রাত্তির এখনো সত্যি-যুগের মতই হচ্ছে! এখনো চন্দর সূয্যি উঠছে! মুখপোড়ারা কি ভাবে যে চার পোয়া কলির রাজত্বি আরম্ভ হয়েছে? অমন কচি মেয়েটা—কোন দুক্ষু জানতো না—কিছু বুঝতো না—হেসে খেলে বেড়াত—তাকে তার ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে এই খোয়ার! ছুঁড়ি এখন খায় না—নায় না—শুকিয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে—আর দিবে-রাত্তির অঝোর ঝরে কাঁদছে! সে আর কদ্দিনই বা বাঁচবে বল ত?

লীলা সহসা অন্তরে দারুণ আঘাত বোধ করিল। অভাগিনী জোছনা! তাহার কি পরিণাম হইবে! বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমার এখন তাহার সম্বন্ধে এমন উদাসীন হইয়াছে—তাহা সে বুঝিল। জোছনার সম্বন্ধে লীলার পক্ষে উদাসীন থাকা অসম্ভব—কিন্তু লীলা তাহার কি ভাল ব্যবস্থা করিতে পারে?

লীলা বলিল—সে লোকটা কি জোছনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না?

—ওরা আবার কোন্ কালে ভাল ব্যাভার করে গা? ওদের আদর এই দুদিন। সে বাড়ী থাকেই বা কখন? এই দু' মাস ত দেখছি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এখানেই কাটাচ্ছে! আমার বোন বলে—রাত্তিরে কতকগুলো এয়ার বন্ধু নিয়ে অদ্ধেক রাত ইস্তিক বাইরের ঘরে মদ খেয়ে হল্লা করে, তার পর সেইখানেই ঘুমোয়! সে ছুঁড়ির ধারেও যায় না কোন দিন। ওর বউ ওর জ্বালায় বিষ খেয়ে মরেছে, এই জোছনাও মরে কোন্‌দিন! আরো কত জায়গায় কত কীত্তি করেছে—তা কে জানে? এবার আমাদের বড় দিদিমণিকে নিয়ে পড়েছে!

লীলা শিহরিয়া উঠিল! কুমারের হাতে পড়িলে বীণারও এই পরিণাম অনিবার্য্য! সে আর কিছু ভাবিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি বলিল—তুই চুপ কর ক্ষান্ত! এ সব কথা আর মুখে আনিস নি। আমি ওদের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ভাল ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোর যে রকম স্বভাব—তোকে বারণ করে দিচ্ছি—খবরদার যেন এ সব কথা কোথাও গল্প করে বেড়াস নি। যা করতে হয়—সব আমি নিজে কোরবো। কারু কাছে এ কথা এখন প্রকাশ না হয়।

ক্ষান্ত বলিল—না গো না! আমার অমন হালকা স্বভাব নয়—যে যাকে তাকে সব কথা গপ্প করে বলতে যাব। সে সব আক্কেল আমার যথেষ্ট আছে। তুমি কিন্তু দিদিমণি—যেমন করে পার—ঐ লোকটাকে এখান থেকে তাড়াও। ওর ছায়া মাড়ালে পাপ হয়। আর যদি পার, তো—সে ছুঁড়ির একটা হিল্লে করো। বামা তাকে হাতে করে মানুষ করেছে—তার দুগ্‌গতি দেখে এখন সেও তার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে। (ক্রমশঃ)

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

দয়াদেবী যখন শুনিলেন যে ধীরু কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া ধীরুর কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু সে কোথায়, কোন্ দূর দেশে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য ছুটিয়া গিয়াছে, সে কথা কেহই তাঁকে বলিতে পারিল না। তিনি কথা-প্রসঙ্গে যদি কখনও দেবেনের কাছে তাহার কথা পাড়িতেন, দেবেন মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ স্বরে কহিত, "তিনি বিবাগী হয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন।" সত্যই যখন দেবেন কিংবা রাজেন্দ্রনাথ কেহই আর ধীরুর কোন অনুসন্ধান করিল না, এবং সে সম্বন্ধে সকলেই যেন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দিনপাতের সঙ্গে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে লাগিল, তখন দয়াদেবী বুঝিলেন হতভাগ্য ধীরুর জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেও এ সংসারে কেউ নাই। মনকে বুঝাইলেন—সে ব্যাটাছেলে, যেমন করেই হোক্ আপনার পথ আপনি করে নেবে। কিন্তু হতভাগা যদি একবার বলে যেত কোথায় যাবে, কি করবে—তাহলেও হত। যুক্তি, তর্ক, মীমাংসা কোন কিছুই দয়াদেবীর দুর্ব্বল স্নেহ-কাতর মনকে সুস্থ করিতে পারিল না। দিনের পর দিন তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। এ সংসারে ধীরুই যেন তাঁহাকে এতদিন জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বাঁধন ছিঁড়িয়াছে—তাই আজ তাঁহার মন এক মুহূর্ত্তের জন্য এখানে থাকিতে চাহিতেছে না—মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে।

দেবেন ইদানিং দয়াদেবীর সঙ্গে বড় একটা সদ্ভাব রাখে নাই। তাহার প্রধান কারণ—ধীরু-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উভয়ের মত-পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ—ধীরুর গৃহত্যাগ।

আজ বৈকালে দেবেন বেড়াইতে বাহির হইবে এমন সময় দয়াদেবী তাহাকে কহিলেন—"তাহলে কাল বাদে পরশু দিনই আমি কাশী যাওয়া স্থির করলাম।" দেবেন তাহার ভ্রূদ্বয় কপালে টানিয়া কহিলেন—"কি হল কথাটা? কাশী যাচ্ছ—বেশ ভাল কথা।" দেবেন গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইল। দয়াদেবী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"হাঁ বাবা, এ দিকের দিনও ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। তাই বাকি কটা দিন।"

দেবেন বাধা দিয়া কহিল—"তা কি করতে হবে?"

"তুই যে বলেছিল কাউকে সঙ্গে দিবি।"

"—কে যাবে?—লোক নেই।"

"দু-দিনের জন্য গিয়ে নবীনও ত রেখে আসতে পারে! সে ত চেনে, জানে—সেখানেও সেই সেবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময়—।"

দেবেন মাথা বাঁকাইয়া বিরক্ত ভাবে কহিল—"না—না, পা'রবে না যেতে। কাজকর্ম্ম দেখে কে? তুমি চলে গেলে সংসারের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, কিন্তু সে না থাকলে আমার ঢের ক্ষতি।"

দয়াদেবী দেবেনের কাছে এতখানি রূঢ় জবাব প্রত্যাশা করেন নাই। রাগ, দুঃখ, অভিমানের চিহ্ন তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাব জোর করিয়া চাপা দিয়া তিনি কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"তবে তোমাদের ইচ্ছা কি আমায় এই বুড় বয়সে এখানে ফেলে পিষে মারা! এত কাল তোমাদের সংসারে ঝি চাকরাণীর অধম হয়েও থেকেছি, এখন যদি আমার গতর আর না বয়, বাবা"—দয়াদেবীর কণ্ঠ কে যেন সজোরে চাপিয়া ধরিল।

দেবেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল—"দেখ পিশি, ইদানিং তোমার কথার ধরণ-ধারণ একটুও ভাল নেই বলে আমি তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই এক রকম ছেড়ে দিয়েছি। কে তোমাকে এখানে পায়ে শিকল বেঁধে আট্‌কে রেখেছ বল? বেশ, কাশীই যদি যেতে চাও সরকার মশায় গিয়ে রেখে আসবেন। কারুর জন্য কারুর কিছু আট্‌কায় না পিশি, বুঝলে?"

দয়াদেবী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন—"আমি তা ত বলিনি বাবা!"

"হাঁ তাই বলছি। তুমি মনে করেছ যে তুমি চলে গেলে আমার সংসার অচল হয়ে যাবে? তা নয় পিশি! রাজা

মরলেও রাজি চলে। আর ধর তাই-ই যদি হয়, তা হলেই বা কচ্ছি কি।”

দয়াদেবী ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—“বালাই, সংসারে অমঙ্গল কেন হবে বাবা! তোমরা সব বড় হয়েছ—ছোট ছোট বউরা এখন গিন্নী হয়েছে—আপনার সংসার আপনি বুঝে নিয়েছে—এখন ত আর আমাকে দিয়ে কারুর দরকার নাই। ধীরে হতভাগাটাই ছিল আমার পায়ের বেড়ী, তা সেও ত”……।

দেবেন বাধা দিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল—“হাঁ—হাঁ, তা আর জানি না—সবই জানি পিশি! সেই ত হ’ল রোগের গোড়া! আর এই ধীরের জন্যই তোমার যত আক্রোশ পড়েছে আমাদের ওপর। সব বুঝি পিশি—নেহাৎ কাঁচা ছেলে আমি নই।……তা বেশ, তোমার যেখানে খুসী যাও বাপু,—এত হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। তোমার টাকা-কড়ি আমি হিসেব ক’রে ফেলে দেব’খন।” মুখখানা গম্ভীর করিয়া দেবেন চলিয়া গেল।

সত্যবালা এতক্ষণ রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল। দেবেন চলিয়া যাওয়ার পরই দয়াদেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দয়াদেবী তখন দেয়ালে ঠেশ দিয়া মালা-হাতে শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন—আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিতেছে। “তুমি দেখছি এ বাড়ীতে একটা অমঙ্গল না ডেকে এনে আর কোথাও এক পা নড়ছ না!”

দয়াদেবী আশ্চর্য্য ভাবে কহিলেন “সে কি মা! ষাট্, তোরা বেঁচে থাক, সুখে থাক। আমি কেন অমঙ্গল ডাকব? তোরা কি আমার পর?”

সত্যবালা কহিল “তা নয় ত কি? রাত নেই, দিন নেই সন্ধ্যা-সকাল বাদ নেই, সব সময়ে চোখের জল ফেলা। তাতে কখন গেরস্থর ভাল হয়? যাবে যাও তোমার কপাল নিয়ে। কেউ ত আর তোমায় তাড়াচ্চে না—তবে এত কেন?”

“ত সত্যি মেজ বউমা, আমি আমার কপাল নিয়েই যাচ্ছি। দেবুর আমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।”—

সত্যবালা বাধা দিয়া কহিল—“ওঃ, তার জন্যে আর ভাবনায় ঘুম নেই! রাত দিন বুক চাপড়াচ্ছ, কপাল ঠুকে শাপ দিচ্ছ, তাড়িয়ে দিল বলে গাঁ-ময় ঢোল পেটাচ্ছ। আর তোমার দরদে কাজ নেই মা!”

দয়াদেবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—“বল্ মা তোর প্রাণে যা চায়! এতদিন সইলাম, আর কি একটা দুটো দিন সইতে পারব না,—খুব পারব!”

রাজেন্দ্রের গলার আওয়াজ পাইয়া সত্যবালা চলিয়া গেল। “কি পিশি, পরশু দিনই কাশী যাচ্ছ না কি?”

দয়াদেবী মুখ তুলিয়া কহিলেন—“হাঁ; বাবা বিশ্বনাথ নেহাৎ টেনেছেন।”

“নিজেই যাচ্ছ, আর দোষটা বিশ্বনাথের ঘাড়ে চাপাও কেন বাপু। কিন্তু কাজটা ভাল কর্‌লে না” এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেল।

দয়াদেবী চাহিয়া দেখিলেন, আকাশ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। একটা গভীর নিরুৎসাহ বুকে করিয়া সন্ধ্যা আগতপ্রায়। জপের মালাছড়া কপালে ছোঁয়াইয়া পেরেকে তুলিয়া রাখিয়া দয়াদেবী ধীরে ধীরে বারান্দার কোণে আসিয়া উৎসুক, কাতর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেউড়ির দিকে চাহিয়া থাকিলেন। টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে পড়িল, একটা হতাশ করুণ অস্ফুট শব্দ সন্ধ্যার বাতাস তাঁহার মুখ হইতে টানিয়া লইয়া বিশ্বের কোলাহলের মধ্যে মিলাইয়া দিল। দয়াদেবী ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

৮

মানুষের এমন এক একটা সময় আসে, যখন দুঃখ জিনিষটাকে চিনিয়া জানিয়া অনুভব করিয়াও, লোকে সেইটাকেই আবার ব্যগ্র হৃদয় দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। চক্ষের জলে মুখ ভাসিয়া যায়, বুকের ভিতর টন্ টন্ করিয়া উঠে; কিন্তু তবুও সেই অতীত জীবনের স্মৃত ও বিস্মৃত ঘটনাগুলি লইয়াই সে নাড়াচাড়া করিতে থাকে,—যেন তাহাতেই সে শান্তি পায়।

ধীরুও আজ তাই। যখন ঝরিয়ায় একটা কয়লা কুঠির ধারে নদীর চড়ায় বসিয়া ছিল, তখন তাহার মনটা বাংলাদেশের এক সুদূর পল্লীগ্রামের মাঝে উদাসীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেই পরিচিত পথ-ঘাট, পদ্মফুল-ভরা ঘোষেদের পুকুর, পার্শ্বে শ্যামের মন্দির, আম, কাঁঠাল, নারকেল গাছ-ঘেরা তাদের সাদা বাড়ী…সেই বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ,…উঠানের পাশেই তুলসীমঞ্চ…যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় পিশিমা প্রদীপ জালিয়া মালা জপ করিতেন। পিশিমার কথা মনে আসিতেই ধীরুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

…হায় সেই স্নেহময়ী পিশিমা আজ তাহারই মতন আজন্মের পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন… না জানি কত কষ্টই তাঁহার ভোগ করিতে হইতেছে! …ধীরু তাহার জামার পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল। পত্র পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু পত্রের উপর পড়িল। ধীরু সযত্নে পত্রখানি মুড়িয়া তাহার জামার পকেটে রাখিয়া দূরে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল…আজ যদি সে উপার্জ্জনক্ষম হইত, তাহা হইলে…একটা রঙ্গীন ছবি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। হয়ত পাঁচজনের মতন সেও…জমাট অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় একখানি মুখ মনের কোণে উঁকি মারিতেই… ক্ষোভে দুঃখে সে নিজেকে জর্জ্জরিত করিল। ঠিক এই কথাটাই সেদিন দিগম্বরী তাহাকে বলিয়াছিলেন…আর কল্যাণীও তাহার সজল দৃষ্টির ভিতর দিয়া বুঝি ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছিল……ধীরু আর ভাবিতে পারিল না নিজের অক্ষমতা আজ তাহাকে নির্ম্মম ভাবে পীড়ন করিল। তাহার বন্ধু “মণির” একদিনের একটা কথা আজ কাঁটার মতন তাহার বুকে খচ্ করিয়া উঠিল। “ভবঘুরে না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ্ ধীরু, দাদাদের উপর অতখানি ভরসা রাখিস্‌নি; চিরদিন কেউ তোকে দেখবে না।” সেদিন ধীরু তাচ্ছিল্য ভাবে কথাটা উড়াইয়া দিয়া ভাবিয়াছিল, তাও কি কখনো সম্ভব? মার পেটের ভাই ভাইকে দেখবে না! এ বলে কি? মানব-চরিত্রের কুটিলতা তখনও তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কল্পনার রঙ্গীন তুলি দিয়া সে তাহার মনের গায়ে রংয়ের পর রং ফলাইয়া চলিয়াছিল। মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন ইচ্ছা অবাধ আনন্দে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছে…… কিন্তু আজ?—ধীরু আর ভাবিতে পারিল না;…সে যেন একটা স্বপ্ন; বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, হয় তো কোন কালেও ছিল না। সে কেবল জোর করিয়াই এতদিন একটা এতবড় মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া নিজের সঙ্গে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি তাহার বন্ধু মণি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এই কয়লার খাদে না পাঠাইত, যদি মণির মামা দিনু ঘোষাল তাহাকে একটু স্থান না দিত, তবে হয় ত অনাহারে কোন গাঁছতলায় তাহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইত; অথবা চির প্রশ্রয়-প্রাপ্ত দুরন্ত অভিমান তাহাকে আত্মহত্যার উপায় করিয়া দিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিত।

মণির মামা দিনু ঘোষাল এখানে রেজিং কণ্ট্রাক্টার। ধীরু তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেছে। বেতন উপস্থিত কিছুই ধার্য্য হয় নাই—সামান্য কিছু হাত-খরচা পাইবে মাত্র। তবে টিকিয়া থাকিতে পারিলে ধীরুর মত পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী লোক ভবিষ্যতে যে বেশ উন্নতি করিতে পারিবে, সে কথার “ঘোষাল মশাই” খুব জোর গলায় ধীরুকে আভাস দিয়াছেন।

ধীরু “ঘোষাল মশায়ের” বাসায়ই খায় ও সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে কাজ করিতে থাকে। কর্ম্ম অবসানে আপনার ছোট্ট নির্জ্জন ঘরখানির ভিতর আসিয়া বসিয়া থাকে; আর ভাবে, কতদিনে তাহার এই দুঃখের দিন ঘুচিবে। সে খাদের অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না; কারণ, এখানকার বাবুদের সঙ্গ তাহার ভাল লাগে না। তাহারা সকলেই প্রায় নিত্য সন্ধ্যায় দল বাঁধিয়া মদ খায়, নানাপ্রকার কুৎসিত আলোচনা করে এবং প্রায়ই একটা ভাঙ্গা তবলা ও অল্পদামের হারমনিয়ম সংযোগে নানা ভঙ্গী সহকারে বেসুরো কর্কশ আওয়াজে চীৎকার করিয়া তাহাদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সান্ধ্য আমোদ উপভোগ করে।…কিন্তু কি করিয়াই বা ধীরু এমন ভাবে সুধু আপনাকে লইয়া আপনি এই বিদেশে মন বসাইয়া থাকিতে পারিবে…তা ত সম্ভব নয়…তবে?

পশ্চাতে শব্দ হইল “এ ছোটা বাবু”—ধীরুর চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিল “ঘোষাল মহাশয়ের” পাঁড়ে ঠাকুর তাহাকেই ডাকিতেছে। ধীরু উঠিয়া নিকটে যাইতেই সে ভাঙ্গা হিন্দি আধ-বাংলায় মাথা ঝাঁকাইয়া চোখ মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিল—“দিদিমণি বল্লে, চা তোয়ারি হোইয়ে গেল…আপ্‌নে খাবে এস।”—“চল”—বলিয়া ধীরু “ঘোষাল মহাশয়ের” বাসার দিকে চলিল।

ধীরুকে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী জগত্তারিণী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিলেন—“জল না খেয়েই কোথায় গেছলে ধীরেন?”

ধীরু অপ্রস্তুত ভাবে কহিল, “আজ আর তেমন ক্ষিদে নেই মামিমা। তাই নদীর ধারে বসে ছিলাম।”

জগত্তারিণী হাসিয়া কহিলেন—"সেই ত কখন দুটি ভাত মুখে দিয়েছ, এখনও ক্ষিদে হয় নি? তুমি বাপু বড্ড লজ্জা করছ। একে ত মাছ তরি তরকারি তেমন ভাল মেলে না; তার ওপর যদি লজ্জা কর, তাহ'লে কিন্তু দু দিনেই শরীর আধখানা হয়ে যাবে।···আর মণি এসে বলবে মামি তার বন্ধুকে না খেতে দিয়েই এই হাল করেছে!"

ধীরু ঘাড় হেঁট করিয়া হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে না, লজ্জা ক'রব কেন, যখন এখানে থাক্‌তে হবে, তখন ক'দিন লজ্জা·····"

জগত্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"হাঁ বাবা, লজ্জাটজ্জা ক'রো না। মণি যেমন ছুটীতে বেড়াতে এসে, চেয়ে চিন্তে নিয়ে আপনার বাড়ীর মত খায়-দায় থাকে, তুমিও তেমনি ক'রো। তুমি তার বন্ধু—মণির মতনই আমাদের ঘরের ছেলে·····দেখ কথায় কথায় বুঝি চা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল···ও রাধি···তোর ধীরুদাকে···ওমা "ধীরুই" মনে পড়ে ···তোর ধীরেন দা'কে চা আর খাবার দিয়ে যা।"

ধীরু হাসিয়া কহিল—"আমাকে সকলে ধীরু বলেই ডাকে, আপনিও তাই বলেই ডাকবেন।"

জগত্তারিণী হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা।—কিন্তু ছেলেরা বড় হ'লে আবার ছেলে-বেলার "ডাকনাম" পছন্দ করে না।"

একটি ১৮।১৯ বছরের শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার মেয়ে একরাশ এলো চুলের বোঝা পিঠে ফেলিয়া একটা রেকাবির উপর এক বাটি চা ও কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। জগত্তারিণীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"চা'টা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মা।"

"তাহলে গরম করে আনলি না কেন, ঠাণ্ডা চা মানুষে খেতে পারে? মেয়ে যেন সং!"

রাধিকা একটু অপ্রস্তুত ভাবে ধীরুর দিকে চাহিতেই, ধীরু বলিয়া উঠিল—"থাক্, থাক্, দেখি, ঠাণ্ডা হয়নি বোধ হয়।"

রাধি ধীরুর হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়া খাবারটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। খানিকটা খাইয়া ধীরু বলিল—"না, ঠিক আছে! কিন্তু খাবার আমি খেতে পারব না, ওটা তুমি নিয়ে যাও।" বলিয়া সে রাধিকার দিকে চাহিল। রাধিকা দেয়াল ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরুর কথার প্রত্যুত্তরে সে কি বলিল, ধীরু তাহা শুনিতে পাইল না···শুধু দেখিল একটা অভিমানভরা দৃষ্টি আর উত্তপ্ত ওষ্ঠের মৃদু কম্পন।

জগত্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"না···না···আবার নিয়ে যাবে কি? ভারি ত জিনিষ···দুখানা নিমকী আর একটু হালুয়া। নাও খেয়ে বাপু, ওতে আর অসুখ করবে না, ঘরের জিনিষ···"

ধীরু ইতস্ততঃ ভাবে কহিল—"না, তার জন্য নয়··· তবে···"

ধীরুকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া জগত্তারিণী কহিলেন—"সত্যি বাপু···আর আমি এত পর পর ভাবা ভালবাসি না।" ধীরু এই স্নেহের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া জলপানান্তে কহিল—"সত্যি, আমার বিকেলে জল খাওয়া অভ্যেস নেই···দুবেলা পেটভরে দুটো ভাত খেলেই···ব্যস নিশ্চিন্ত!"

ধীরুর এই স্বল্প কথায় জগত্তারিণী তাহার সরল মনের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু একটু ব্যথাও অনুভব করিলেন সেইখানে, যেখানে নারীধর্ম্ম সহানুভূতি-গলিত তরল ধারায় অন্তরের অন্তস্তল ধৌত করিয়া সমস্ত বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছ। জগত্তারিণী রাধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"যা দুটো পাণ এনে দে। দাঁড়িয়ে আছে ত দাঁড়িয়েই আছে!"

রাধি লজ্জিতভাবে চলিয়া গেল। ধীরু একটু সঙ্কুচিত-ভাবে কহিল—"আচ্ছা মামীমা, একটা বিষয়—"

ধীরুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জগত্তারিণী ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"কি কথা বাবা?"

"আচ্ছা, আপনার জামাই কি অন্য কোথাও কাজ-কর্ম্ম করেন?

জগত্তারিণী বাম হস্তে কপালে এক চাপড় মারিয়া কহিলেন—"পোড়া কপাল আমার—সে কথা বলব কি বাবা···এই মেয়েটা হয়েছে আমার কাল্। সাতটা নয় পাঁচটা নয় পেট-ধোয়া এই একটা মেয়ে···অত টাকা-পয়সা খরচ করে বে দিলুম···তা এমনি বরাত, জামাইটা একেবারে মানুষ নয়। তার ওপর শাশুড়ী মাগী দজ্জাল, জ্বালা দেয়·· মেয়েটার আমার·····"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল—"জামাই কি করেন?"

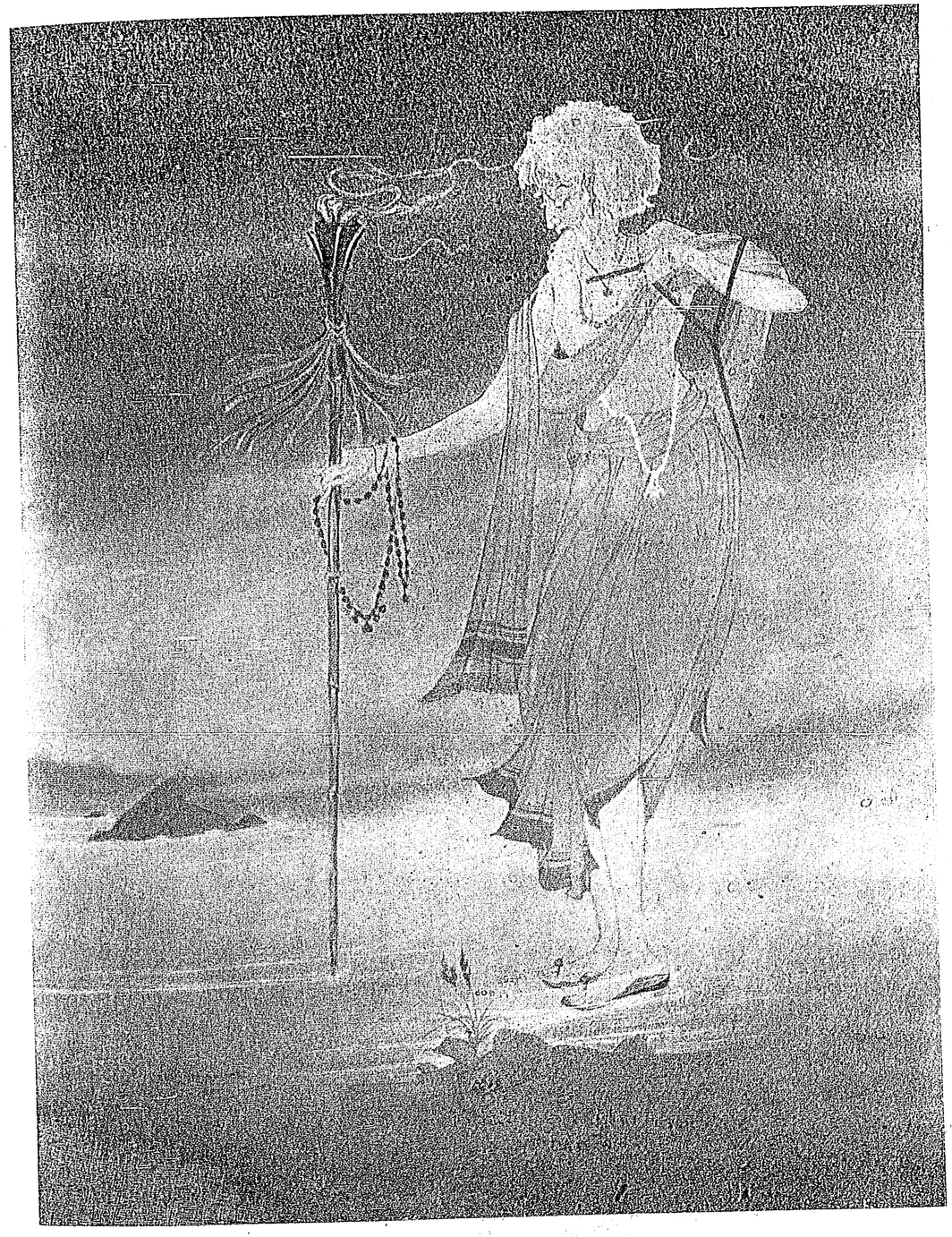

তুলসীদাস

শিল্পী—মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

জগত্তারিণী বিরক্তভাবে কহিলেন—"ছাই, তার মাথা আর মুণ্ডু করে! খায়-দায় আর নেশা ভাং করে। তার বাপ মিন্‌সে ছিল হাড়-কেপ্পন, চুরী-চামারী করে লোককে ঠকিয়ে কিছু যায়গা-জমী রেখে গেছে, তাই মা-বেটার চলছে।"

"এখানে সে আসে না?"

জগত্তারিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"পোড়া কপাল, এ পথ মাড়ায় না। শুনবে কি বাবা, মাগী নাকি বেটার আবার বিয়ে দেবে।...জামাইটাও নির্ব্বোধ গেঁয়ারের এক শেষ...ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ—সেও আবার তাতেই মত দিয়েছে।"

ধীরু ঘৃণাব্যঞ্জক বিরক্তি সহকারে কহিল—"আচ্ছা ত?"

রাধি পাণের ডিবায় কয়েকটা পাণ আনিয়া ধীরুর সম্মুখে আনিয়া দাঁড়াইল।

জগত্তারিণী কহিলেন—"পাণ কটা রেখে ঘরদোরগুলো পরিষ্কার করে ফেল মা!"

রাধিকা পাণের ডিবাটা ঠকাস করিয়া মাটিতে রাখিয়া বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

জগত্তারিণী রাগতভাবে কহিলেন—"কাজের ছিরী দেখলে গা জ্বলে যায়! আর একটু হলেই ত পাণগুলো সব মাটিতে পড়ে যেত। যেমন বরাত...তেমনি বুদ্ধি-শুদ্ধি!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম...কর্ত্তা রাগী মানুষ, জামায়ের কথা পাড়লেই বলেন 'তার নাম আমার কাছে করো না, আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে, জামাই মরেছে'।"

ধীরু হাসিয়া কহিল—"সে কি একটা কথা হল!"

"বল ত বাবা, সত্যিই ত আর তাই নয়। তবে মেয়ে ছেলে যদি সোয়ামীর ঘর না কর্‌তে পেলে, তাহলে তার জন্মই যে বৃথা।"

"তা ত বটেই!" ধীরু ভাবিতেছিল, রাধির দুঃখের জীবনটা, তার স্বামীর নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার কথা! রাধির দুরদৃষ্ট ধীরুর নির্ম্মল সরল চিত্তের উপর শারদাকাশের গায়ে কাল রেখার মত একটা মলিন দাগ আঁকিয়া দিল। সে অন্যমনস্কভাবে কহিল—"তা বটে! আমায় যে একটু চুণ দিতে হবে! এ দেশের পাণগুলো বড় ঝাল।"

"পাণে চুণ কম দিয়েছে বুঝি? ও রাধি...রাধি... ধীরুকে একটু চুণ দিয়ে যা! আচ্ছা না হয় আমিই দিচ্ছি—" বলিয়া জগত্তারিণী তাঁহার স্থূল দেহ বাঁকাইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই, রাধিকা একটা পাণের বোঁটার মাথায় চুণ আনিয়া ডিবার উপরে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ধীরু কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া একমনে এতক্ষণ পূর্ব্বকথাই ভাবিতেছিল, হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে কহিল—"আমি ভাবছি, ছেলেটাই বা কোন্ হিসেবে রাজী হল?...তারও ত একটা কর্ত্তব্য..."

বাধা দিয়া জগত্তারিণী কহিলেন—"এই যে চুণ দিয়েছে। দেখ্‌ত রাধি বামুন ঠাকুর উনুনে আঁচ দিলে কি না! আজকাল পাঁড়ে কাজকর্ম্মে বড্ড গা ঢিল দিয়েছে বাপু!"

রাধিকা এক পাশে দাঁড়াইয়া তখন দেয়ালের গায়ে আঁচড় কাটিতেছিল। একটা মুখভঙ্গী করিয়া সে বিরক্তভাবে কহিল—"হ্যাঁ গো, দিয়েছে।"

"তবে এক কাজ কর্। নুনীয়া কর্ত্তার সঙ্গে হাটে গেছে, ফিরতে ত দেখছি দেরী হচ্ছে। তুই ততক্ষণ আলোগুলোতে তেল ভরে ঠিক করে রাখ্, সন্ধ্যে ত হয়ে এল!"

বিরক্তভাবে রাধি কহিল—"এক দণ্ডও মা মানুষকে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না ...এটা কর্...সেটা কর্...আমি পারব না এত...ভারী কি না হ্যাঁ!" মুখভার করিয়া রাধি দুপদাপ শব্দে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

জগত্তারিণী ধীরুকে কহিলেন—"দেখলে বাবা, আস্ত পাগল! কি যে ওকে নিয়ে করব, তা আর ভেবে পাই না!"

ধীরু একটু হাসিল, কোন কথা কহিল না।

নুনীয়া চাকর মাথায় কাঁকা, হাতে তেলের বোতল লইয়া উঠানে আসিয়া হাঁকিল—"মাইজী!" পশ্চাতে ঘোষাল মহাশয় একটা ময়লা নেকড়ায় বাঁধা মাছের পুঁটুলী হাতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"কই গো"—

জগত্তারিণী মাথার কাপড়টা খানিকটা টানিয়া দিয়া দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়া উঠিলেন; এবং উঠানে নামিতেই, ঘোষাল মহাশয় বিরক্তভাবে কহিলেন—"তোমার নড়তে চড়তেই আধঘণ্টা—এই নাও...মাছ আর মেলবার উপায় নাই—হাটে গেলেই কি আর না গেলেই কি...মিছে পয়সা খরচ।"

জগত্তারিণী কহিলেন—"কি আনলে?"

"গোটাকতক মাগুর" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় মাছের পুঁটুলীটা জগত্তারিণীর হাতে দিয়া ঘরের দিকে যাইতেই

জগত্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"দাঁড়াও, হাতে একটু জল দিই……"

ধীরু এতক্ষণ চুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি, আপনি যান্।"

"ওমা, তুমি দেবে কি! অঃ রাধি! মেয়েটার যেন ভীমরতি হয়েছে।" জগত্তারিণী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে যাইতেই, ঘোষাল মহাশয় বিরক্তভাবে কহিলেন—"মেয়েটা কোন্ চুলোয় গেল? অ-রাধী ··রাধী···"

ভিজা কাপড়ের এক প্রান্ত দ্বারা যৌবনোন্নত বক্ষ ঢাকিয়া থপ্‌থপ্ শব্দে রাধি ঘোষাল মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া কহিল···"কি? আমি গা ধুচ্ছিলাম!"···তার এলাইত চুল পিঠের উপর ছাপাইয়া পড়িয়াছে, আর্দ্র বসনের ভিতর দিয়া তাহার পরিপূর্ণ দেহের পূর্ণ শ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! রাধি একবার অবনত দৃষ্টিতে আড়চোখে ধীরুর দিকে চাহিয়া তাহার সমুন্নত বক্ষের উভয় পার্শ্বের কাপড় টানিয়া দিল!

ঘোষাল মহাশয় বিরক্তভাবে কহিলেন—"এতক্ষণ সময় পাসনি···আমায় একটু জল দে হাত পা ধুতে।"

"দিচ্ছি, ওই ত বারান্দায় বালতীভরা জল রয়েছে!"

রাধিকাকে উঠান হইতে বারান্দায় উঠিতে দেখিয়া ধীরু একটু কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। রাধি জল লইয়া যাওয়ার সময়, বর্ষাশেষে বিদ্যুতের মত তাহার চঞ্চল চক্ষের একটা অগ্নিবাণ ধীরুর দিকে হানিয়া দিয়া গেল। বেচারা ধীরু পেরেকে ঠোকা ছবির মত দেয়াল ঠেশ দিয়া নতমুখে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘোষাল মহাশয় হাত পা ধুইয়া বারান্দায় আসিলেন; এবং ধীরুকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন ধীরেন, বোস! চা খেয়েছ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কেমন লাগছে হে তোমার এ যায়গা?"

"মন্দ নয়, তবে—"

বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় তাঁহার টাক-মাথায় জলের হাত বুলাইয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, একটু রুক্ষ বটে! পাহাড়ে যায়গা কি না···কিন্তু স্বাস্থ্য বেশ ভাল, কি বল?"

ধীরু মুখ না তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল—"তা ভালই!"—

নুনীয়া এক হাতে একটা হেরিকেনের আলো, অপর হাতে হুঁকা কলিকা লইয়া বারান্দায় আসিতেই, ঘোষাল মহাশয় সাগ্রহে কহিলেন—"দে বাবা, একটু তামাক খাওয়া যাক্। আজ বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে ধীরেন, বোস, একটু গল্প করা যাক্!"

ধীরু বড় বিপদের মধ্যেই পড়িল! অনেকক্ষণ হইতেই যাইবে যাইবে ভাবিয়াও এতক্ষণ কেন যে যাইতে পারে নাই ইহার স্পষ্টতর মীমাংসা সে করিতে পারিল না। উপস্থিত যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও ঘোষাল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ধীরুকে পুনরায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসিতে হইল! দীনু বাবু এক রাশ ধূম ছাড়িয়া কহিলেন—"তা বাবাজী, তোমার স্বভাব চরিত্র দেখে আমরা বড়ই খুসী হয়েছি! তোমার মামীমা বলেন, এমন নম্র ধীর ছেলে আর হয় না। তোমার নামটা তোমার স্বভাবের পরিচয় বটে!"

ধীরু নতমুখে তাহার নখের কোণ দাঁতে কাটিতে লাগিল!

দীনুবাবু পুনরায় কহিলেন—"শুনতে পাই তুমি না কি বড় লজ্জা কর···লজ্জাটজ্জা আমার এখানে তোমার করতে হবে না বাপু!"

মৃদু হাস্যে ধীরু কহিল—"আজ্ঞে না—লজ্জা কি?"

"না, তাই বলছি! আর কাকে দেখেই বা লজ্জা করবে?···রাধি একরত্তি মেয়ে···ওকে আবার···হ্যাঃ!" বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন। পরে কহিলেন—"আর যে কাজ তুমি করছ, যদি উন্নতি চাও, তাহলে চক্ষুলজ্জাটা একেবারে ভুলে যেতে হবে বাপু! দেখতেই ত পাচ্ছ, যত সব ছোট-লোক কুলী মজুর নিয়ে কারবার! ওদের দিনরাত চাবুকের ওপর রাখতে হবে, না হলে কাজে ফাঁকী দেবে। ওদের মেয়ে-মদ্দ সব পাজী! আর এদেশের লোক—এই যত সব খাদ-মুনীস দেখছ, এদের বিশ্বাস নেই! বেটারা মাইনে পায় ২০ টাকা, কিন্তু হলে কি হয়, মাসে ২০০৲ টাকা চুরী করে। আর বছরে একটা করে ধান জমী কিনছেই!"

ধীরু ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের মুখের পানে চাহিল।

"হ্যাঁ, থাকতে থাকতেই তুমি দেখতে পাবে! তাই বলি, সব দিকে নজর রেখে মন দিয়ে যদি খাট আর টিঁকে থাক, তাহলে তোমার উন্নতি ঠেকায় কে? তবে প্রথমটা একটু কষ্ট স্বীকার করে পরিশ্রম করা, কাজকর্ম্মগুলো ভাল করে শেখা দরকার!"

ধীরু আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে কহিল—"আজ্ঞে, তা ত বটেই!"

রাধি এক পেয়ালা চা ও জলখাবার আনিয়া দীনুবাবুকে দিতেই, তিনি কহিলেন—"খাবারটা নিয়ে যা মা, এখন কিছু খেলে রাত্রে আর খেতে পারব না!"

রাধি মৃদু হাসিয়া কহিল—"আজ দেখছি, তোমাদের সকলেরই পেটে ক্ষিদে কম! কি যে এমন ওবেলা খেয়েছ, তা ত জানি না বাপু! খাবারগুলো মিছেই করা হল।"

ঘোষাল মহাশয় চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া কহিলেন—"কেন ধীরেনও খায় নি না কি?"

"না খাওয়ারই মতন!" উদাসভাবে কথা কয়টা বলিয়া রাধি ধীরুর দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল! ধীরু জানিল, আবার একটা কৈফিয়ৎ দিবার সময় উপস্থিত! কাজেই ঘোষাল মহাশয়ের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া সে নিজেই বলিল, "সকালে কি বিকেলে কোনও দিনই আমার জল খাওয়ার অভ্যেস নেই!"

ঘোষাল মহাশয় চায়ের পেয়ালা নামাইয়া কহিলেন—"কিন্তু বাপু, এখানে তা করলে চলবে না। যেমন খাটতে হবে, খেতেও হবে তেমনি। না হলে শরীর টেঁকবে কেন? এই যে দেখছ, এত বয়সেও আমার শরীর খাড়া আছে, সে কেবল খাওয়ার জোরে!"

রাধিকা পাণের ডিবায় পাণ দিয়া গেল। একসঙ্গে ২।৩টা পাণ মুখে পুরিয়া দীনুবাবু কহিলেন—"নাও হে, পাণ খাও ধীরেন!"

"আজ্ঞে, পাণটা আমার বেশী খাওয়া অভ্যেস নেই, আমি খেয়েছি।"

"চুণ দিতে ভুলে গিছলুম" বলিয়া রাধি এক টুকরা ছেঁড়া পাণের উপর খানিকটা চুণ রাখিয়া গেল। পাণ চিবাইতে চিবাইতে দীনুবাবু কহিলেন, "দেখ ধীরেন, মানুষের অদৃষ্ট যে কখন ফিরে যায়, তা সে নিজেও বুঝতে বা জানতে পারে না!"

ধীরু কহিল—"নিশ্চয়!"

"আজ হয়ত তুমি মনে করছ যে রোদে পুড়ে কয়লার ময়লা ঘাঁটাই সার হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়! এতে তোমার যা জ্ঞান হচ্ছে, তার দাম ঢের বেশী। ছমাস বাদে বুঝতে পারবে—তোমার কদর কত বেড়ে গেছে। আমি জোর করে বলতে পারি—ভবিষ্যতে তোমার যথেষ্ট উন্নতি হবেই হবে। কদিনই বা এসেছ এখানে, এর মধ্যে তোমার কাজ-কর্ম্ম দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি। আমি সে কথা "মণি"কেও লিখে দিয়েছি। আর না হবেই বা কেন? যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ, বেশ চালাক চতুর বুদ্ধিমান, একবার দেখলেই তোমরা যা শিখতে পারবে, আমাদের পাঁচবারেও তা হবে না! আর বাপু···আমারও বয়েস হয়েছে···কাজ-কর্ম্মগুলো যদি শিখে নিতে পার···" দীনুবাবু আর একটা পাণ মুখে দিয়া ডাকিলেন—"ওরে নুনীয়া, আর এক কলকে তামাক দিয়ে যা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত বটেই" বলিয়া ধীরু উঠিয়া দাঁড়াইতেই, দীনুবাবু কহিলেন—"কি—যাচ্ছ না কি? আর রাত্তির করে এখন কোথায় যাবে?"

ধীরু উঠানে নামিয়া কহিল—"কোথাও না···এইখানেই একটু"···বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল!

জগত্তারিণী এতক্ষণ পাঁড়ে ঠাকুরকে রন্ধন ব্যাপারে উপদেশ দিতেছিলেন; আসিয়া দেখিলেন ধীরু নাই। একটু বিস্মিতভাবে ঘোষাল মহাশয়কে বলিলেন—"ধীরেন চলে গেছে? কখন গেল?"

"এই ত·· কেন?"

"না···এমনিই···বেশ ছেলেটি কিন্তু; যেমন কথাবার্ত্তায়, তেমনি স্বভাব-চরিত্রে। এই কদিনের ভেতরই ওর ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। জামাই হতচ্ছাড়ার কথা শুনে কত দুঃখ করতে লাগল। বল্লে, এমন সহায় থাকতে সে কি না চুপ করে বসে থাকে—"

ঘোষাল মহাশয় মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"বলবে না? সৎবংশের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে···বুদ্ধি শুদ্ধি আছে···তা বলবে না? এখানে এসেছে না হয় বাড়ী থেকে রাগ করে··· নানা ঝঞ্ঝাটে···কিন্তু বড়ঘরের ছেলে ত বটে!" জগত্তারিণী আর কোন কথা কহিলেন না। ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া ঘরে গেলেন এবং জামাটা গায়ে দিয়া, আলমারীর ভিতর হইতে একটি ছোট বোতল জামার ভিতর লুকাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই জগত্তারিণী কহিলেন—"আবার এখনই বেরোনো হচ্ছে? একদিনও ফাঁক যাবার যো নেই···বুড়ো হলে, মরতে বসেছ, আর কেন? সকাল সকাল ফিরো!" দীনুবাবু ততক্ষণে লম্বা পা ফেলিয়া একেবারে বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

৫

প্রাশীয়া

প্রাশীয়া সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রায় তিনভাগের দু'ভাগ জুড়ে বসে আছে। লোকসংখ্যাও এই অঞ্চলেরই সবচেয়ে

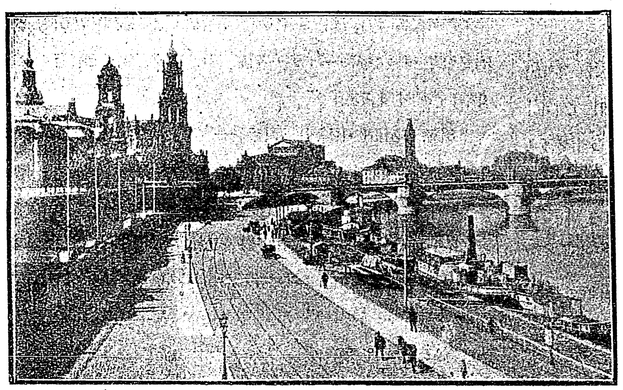

ড্রেসডেন্ শহর

বেশী এবং এরা সকলেই প্রায় প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত। ফ্রান্স্ ও বেলজিয়মের সীমান্ত স্পর্শ করে প্রাশীয়া বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে উত্তর য়ুরোপ ঘুরে নব পোল্যাণ্ডের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত! দক্ষিণে একে বেষ্টন করে আছে জেকোশ্লোভাকীয়া, আষ্ট্রীয়া, এবং সুইস্জার্ল্যাণ্ড! উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বাঞ্চলের বিশাল বালুভূমি অরণ্যময়; কিয়দংশ শস্য উৎপাদন ও আলুর চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেকালের দাঙ্গাবাজেরা এই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন এবং একালের দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ সৈনিকদের জন্মভূমিও হচ্ছে এই প্রাশীয়া!

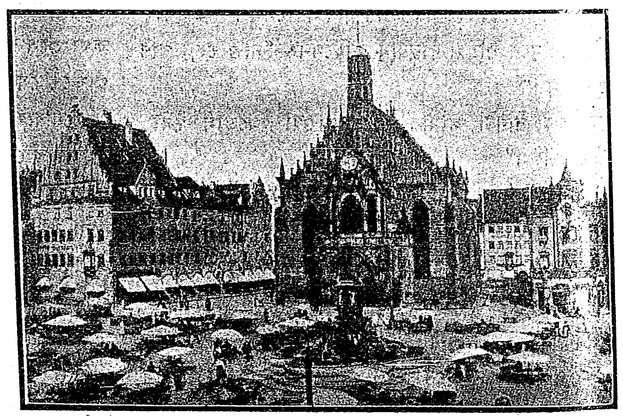

ন্যুরেম্বার্গ শহরের বাজার

প্রাশীয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে কতকটা পার্ব্বত্য-প্রদেশ বলা যেতে পারে। এই অঞ্চলই হচ্ছে জার্ম্মাণীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান। কয়লার খনি এবং লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার এইখানেই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে আলুর চাষ, আখ এবং বীটপালঙের চাষ ও চিনির কারখানা আছে। সমুদ্রের ধারে জলের উপর একদল জেলে তাদের বড় বড় ডঙীতে বাস করে। এরা খুব কষ্টসহিষ্ণু জাত। উত্তর সাগর ও বল্টিক সমুদ্র মন্থন ক'রে এরা এদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যের বর্ষণও প্রাশীয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ আছে। রাইণের উপত্যকা স্বভাবের শোভার জন্য বিখ্যাত! ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কলকারখানার সংশ্রব থাকা সত্ত্বেও ওয়েষ্টফেলিয়া তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটুকু এখনও হারায় নি। সাক্সেন্ওয়াল্ডও নৈসর্গিক্ দৃশ্যবৈভবে নিতান্ত দীন নয়। জগদ্বরেণ্য মনিষী বিসমার্ক এই স্থানে বহুদিন যাপন করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে 'হার্জ' পর্ব্বতমালা। খুব বেশী উঁচু না হ'লেও এই পর্ব্বত-শ্রেণীর বিবিধ মনোহর বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়! স্থানে স্থানে মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী আপন হাতে চমৎকার উদ্যান রচনা করে রেখেছেন

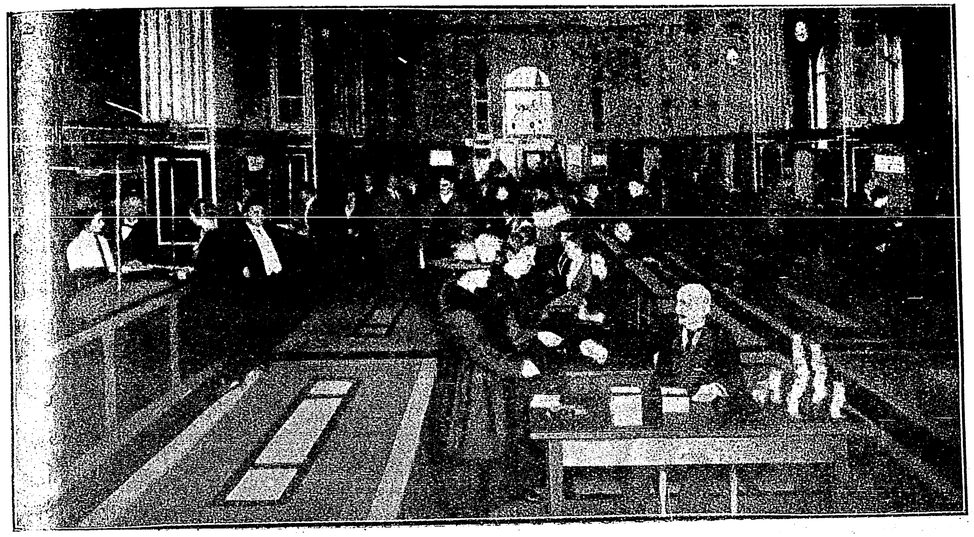

বার্লিণের সেভিংস্ব্যাঙ্ক

চাষাদের 'বর কনে' ও তাদের সঙ্গী এবং সহচরীরা

এই পর্ব্বতের প্রীতিভরা শান্ত সুন্দর অন্তঃপুরে। নিদাঘ তাপ হ'তে জুড়াবার জন্য ধনী জার্ম্মাণ পরিবারেরা এইখানে আসেন বায়ু সেবন করতে!

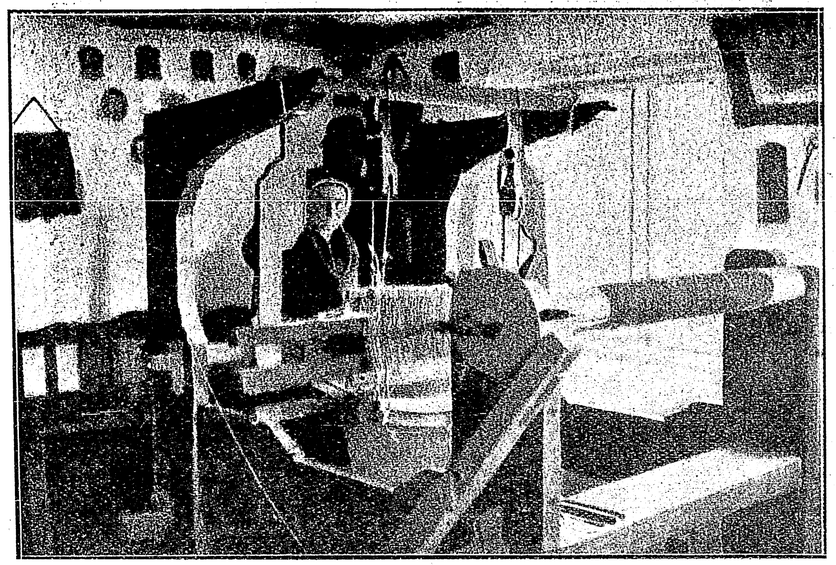

আঁশের কাপড় বোনা

আরও দক্ষিণে শাইলেশীয়ায় 'জায়েণ্ট্' পর্ব্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এরই চারিদিকে যেসব বনরাজি-বিভূষিত বহু-তটিনী-সেবিত অসংখ্য উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়, তারা এক-একটি যেন কোন দক্ষ চিত্রকরের তুলিতে আঁকা দৃশ্যপটের মতো সুন্দর! এখানে ওয়েণ্ডিশ্ বলে লুপ্তপ্রায় বহু প্রাচীন জার্ম্মাণ জাতির অস্তিত্ব আজও দেখতে পাওয়া যায়। এরা এখনও তাদের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের পোষাক পরিচ্ছদ পরে, সেই পুরাতন আচার ব্যবহার মেনে চলে ও সেই সাবেক ভাষাতেই কথা কয়!

গাছের আঁশ ছাড়ানো

প্রাশীয়ার প্রধান শহর 'বার্লিন' একেবারে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত বলে এর মধ্যে বিজ্ঞানকে দেখতে পাওয়া যায় চারিদিকে, প্রাচ্যকে খুঁজে পাওয়া শক্ত! প্রাশীয়ার প্রাচীন শহরগুলি সুন্দর। আধুনিক শহরগুলি একেবারে নেহাৎ যেন কলে তৈরী! তথাপি হিডেলবার্গ, হাইম্, ম্যারীয়েনবার্গ, ও ড্যানজিগ্ প্রভৃতি শহরগুলি এখনও প্রাশীয়ার নয়, সমগ্র জার্ম্মাণীর গৌরব স্বরূপ। হাম্বার্গ, ব্রেম্‌ন ও লুবেক্, জার্ম্মাণীর এই তিনটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহরও প্রাশীয়ার অঙ্গসংলগ্ন।

স্যাক্সনী

জনসংখ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রলেও স্যাক্সনী আকারে জার্ম্মাণীর এক-পঞ্চম ভাগেরও কম। স্যাক্সনীও নিতান্ত অনুপযুক্ত বলে এখানে কুটীর-শিল্পের প্রচলন খুব সচ্ছল। এরা উপার্জ্জনও করে বেশী এবং খরচও ক'রে বেদরদে! কেবলমাত্র 'ওর' পর্ব্বতস্থ পল্লীটি চাষবাসের দেখতে পাওয়া যায়। এস্থানটি অত্যন্ত জনাকীর্ণ বলে দারিদ্র্যের দারুণ অভাবও এখানে বিদ্যমান। শিক্ষার উন্নতির দিক দিয়ে স্যাক্সনী অন্য সকল প্রদেশকে এগিয়ে গেছে। এখানে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার অতি সুন্দর সুব্যবস্থা আছে। জার্ম্মাণীর এই যন্ত্র-শিল্প-শিক্ষালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। এই সকল শিক্ষালয়ের ছাত্রেরা ব্যবসায়

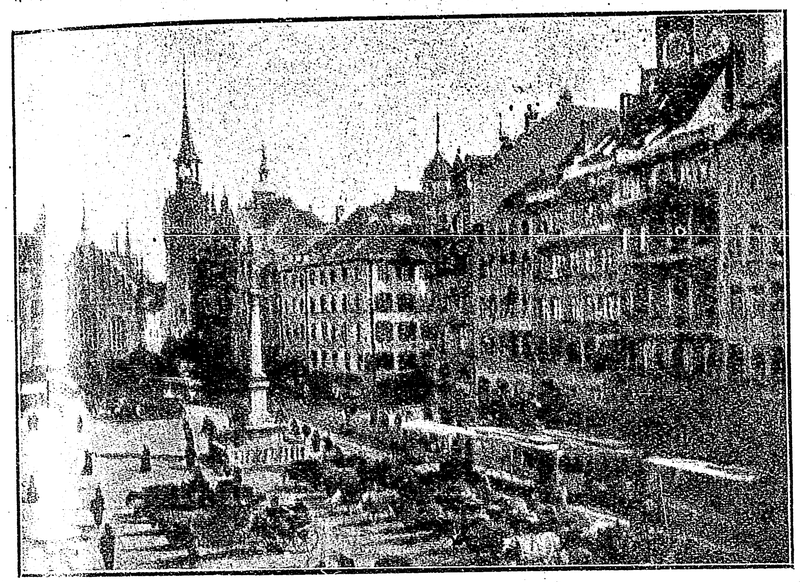

মিউনিক্ শহরের এক অংশ

জার্ম্মাণীর একটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কলকারখানা-প্রধান স্থান। লৌহ প্রভৃতি খনিজ ধাতুর ব্যবসায়, সুতা, মোজা, গেঞ্জি, ছিটের কাপড় ও অন্যান্য বিবিধ বস্ত্রশিল্পের কারখানা এবং চীনেমাটির ও কাঁচের জিনিসের কারবারই এখানে খুব বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসীরাও অধিকাংশই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী; তবে দীর্ঘকাল-ধরে' সমাজতন্ত্র বা সমষ্টিবাদের প্রবল আন্দোলনের প্রভাবে এরা উপস্থিত প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মেই অনাস্থাবান্ হ'য়ে উঠেছে। স্যাক্সনীর লোকের অবস্থা বেশ

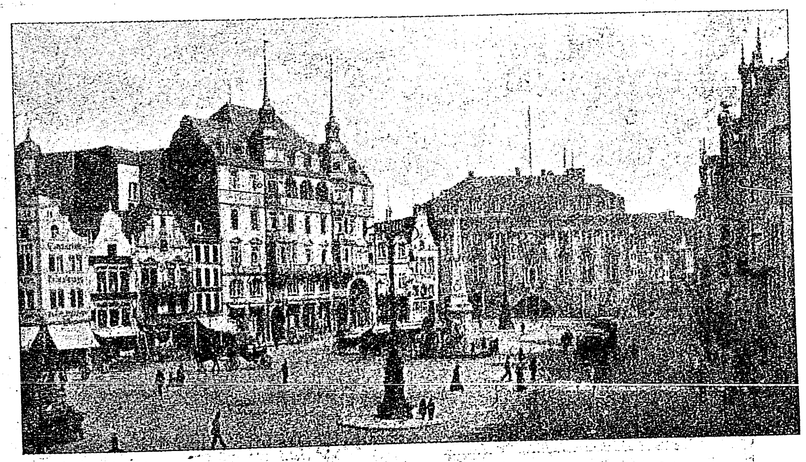

বীথোভেনের জন্মভূমি 'বন্' শহর

সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার শিল্প-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ পারদর্শী হ'য়ে ওঠে।

ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরের একদিক

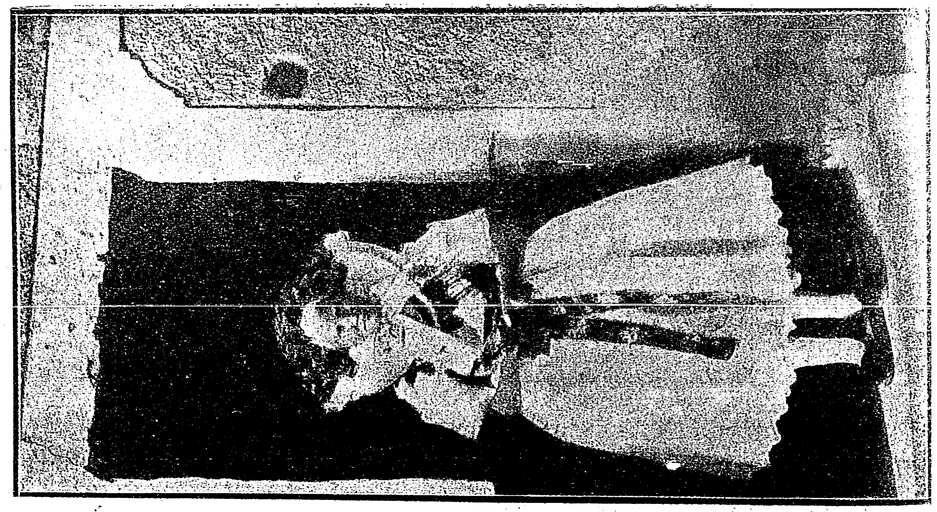

শ্রীওয়ালের সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী

স্যাক্সনীর প্রধান শহর 'ড্রেস্‌ডেন'। এখানে প্রবাসী ইংরেজ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের সংখ্যা জার্ম্মাণদের চেয়েও বেশী। কিছুদিন ড্রেস্‌ডেনে থাকলে আর ড্রেস্‌ডেন ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না।

উৎসব দিনের বাদকেরা

স্যাক্সনীর আর একটি প্রধান শহর হ'চ্ছে—লাইপ্‌জিগ। ড্রেস্‌ডেন্ শ্রেষ্ঠ শহর হলেও লাইপ্‌জিগের লোকসংখ্যা অনেক বেশী। এখানে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পুস্তক মুদ্রণ প্রকাশ ও বিক্রয় সংক্রান্ত এমন কি বই বাঁধাইয়ের কাজের জন্যও লাইপ্‌জিগের প্রসিদ্ধি আছে। এছাড়া জার্ম্মাণীর সকলের চেয়ে যে বড় আদালত বা 'হাইকোর্ট' তা' লাইপ্‌জিগেই অবস্থিত।

এখানে ইংরেজ ছেলে-মেয়েদের পড়বার জন্য একাধিক ইংরাজী ইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। বিগত মহাসমরের আগে এই সব প্রবাসী ইংরেজ ও আমেরিকানরা অনেকেই জায়গা জমী কিনে বাড়ী ঘর তৈরী করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে দিয়েছিল। সমস্ত জার্ম্মাণ রাজ্যে কোথাও ড্রেস্‌ডেনের মতো এমন সর্ব্বরকমে সুন্দর শহর আর দেখতে পাওয়া যায় না। এমন একটা সূক্ষ্ম শ্রী এই শহরের আছে যা মানুষকে তার অজ্ঞাতসারে একান্ত মুগ্ধ করে ফেলে!

উৎসব-প্রাঙ্গণে নৃত্যাভিলাষিণীগণ (নৃত্যের পূর্ব্বে তাদের স্ব স্ব জাতীয় পোষাক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে কি না তার পরীক্ষা হচ্ছে!)

উট্রেস্বার্গ্

আকার ও লোকসংখ্যার অনুপাতে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে উট্রেস্বার্গ তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। এটি একটি আরামপ্রদ পাহাড়ী দেশ। কন্স্টান্স্ হ্রদের উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত! দুর্ম্মুখ-স্বভাব কিন্তু সুজন শ্বোয়াবীয়ানরা এইখানকারই অধিবাসী। এরা বড় প্রত্যুৎপন্নমতি ও ধূর্ত্ত লোক, অথচ এদের মতো এত ভাবপ্রবণ জাতও আর দেখা যায় না। সৎকার্য্যে এরা সর্ব্বদাই অগ্রণী।

আঁশের পাঁজ

উট্রেস্বার্গের অধিবাসীরা সকলেই যোদ্ধা। এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আপনাদের বীর্য্যবলে ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে এসেছে। এ স্থানটিকে কবি ও ঔপন্যাসিকের কল্পিত কাহিনীর মতো স্বপ্নমাধুরীময় বলে মনে হয়। এখানে এমন একটি ছোটখাটো পাহাড় নেই যার উপরে একটি দুর্গ বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় না! হোহেন্ষ্টাউফেন্ পর্ব্বতের শিখরদেশে পরিবার যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর জয়শ্রী বরণ করে সুখ-সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছিল —যারা স্বধর্ম্মাশ্রিত পুণ্য রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে একটির পর একটি ক'রে সব অসামান্য সম্রাট যুগিয়ে এসেছিল, যারা জার্ম্মাণীকে বহু বিভক্ত করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছিল, যারা বিশ্বরাজ্যের দুঃস্বপ্ন দেখে ইটালীকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছিল, তারাই এখানকার মানুষ! সে যাই হোক —তাদের সর্ব্বদোষ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ওই উট্রেস্বার্গের অধিবাসীদের যে চারিত্রিক বিশেষত্ব—সেই ছিল জার্ম্মাণীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রধান উৎস। তাদের রাজসভা—কি সুদূর দক্ষিণ ইটালী, কি সিসিলী—সর্ব্বত্রই শিক্ষা সাহিত্য ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান হ'য়ে উঠে এক একটা নবীন আলোক জেলে দিয়েছিল যে তার কিরণচ্ছটায় সমগ্র য়ুরোপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আবার সেই মশালের আলোক-শিখাতেই তারা য়ুরোপে আগুন ধরিয়েও দিয়েছিল।

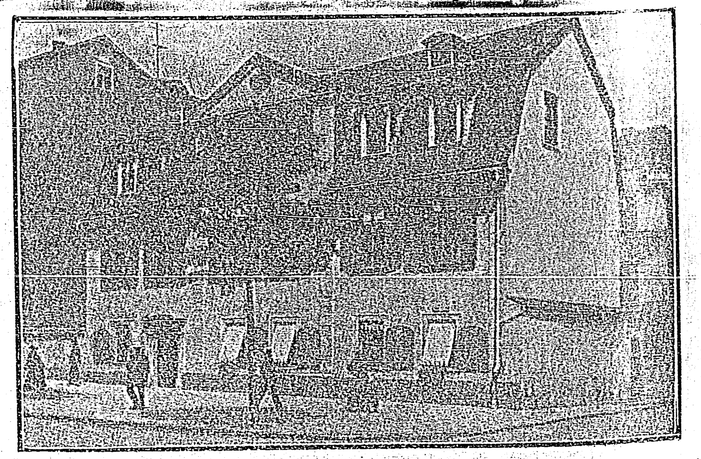

কবি শীলারের বাসগৃহ

'জোলার্ণ' পর্ব্বত-শৃঙ্গের বেলেপাথরের বেদীর উপর যে নব-নির্ম্মিত বিরাট ও বিস্ময়কর দুর্গ এরই ক্রোড়ে জগদ্বিখ্যাত হোহেন-জোলার্ণ রাজবংশের সম্রাটেরা লালিত-পালিত হয়েছিল। আজ ভাগ্যচক্রের দুর্নিবার দুর্বিপাকে তারাও অধঃপতিত।

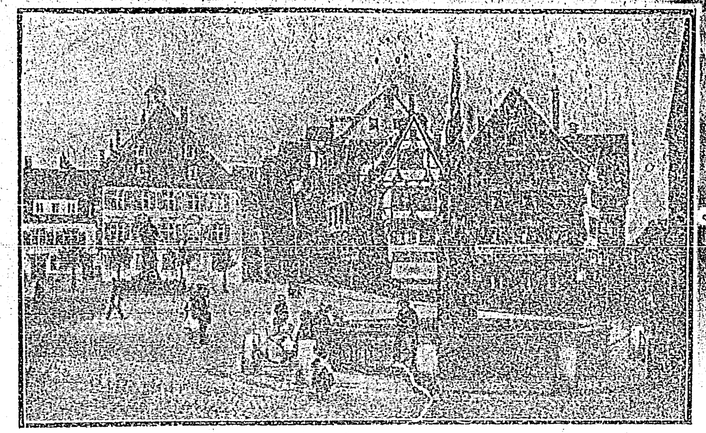

উট্রেস্বার্গের প্রাচীন উল্ম্ শহর

অস্ত্র রণদক্ষতা ছাড়াও শ্বোয়াবীয়ানরা অন্যান্য দিকেও তাদের প্রতিভার বিকাশ দেখিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করেছে। মুখে তীক্ষ্ণধার স্বরূপ ছিল এরাই এবং দর্শন-বিজ্ঞানের গবেষণা ও অনুসন্ধানেও তাদের সুযশ বিস্তারের এরাই ছিল বাহন। বিশ্বব্যাপী। Albertus Magnus, Paracelsus, প্রভৃতি মনীষীরা এই শ্বোয়াবীয়ানদেরই পুত্র। এই দেশেই Kepler, Hegel, Schelling প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদেরই কবি ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত Schiller, Wieland ও Uhland, বীরত্ব-গৌরবের দিনে জার্ম্মাণ তরবারীর দিগন্তবিস্তৃত জ্ঞান

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

১

তব অপরূপ রূপ যে জেনেছে মনে,
সে তোমারে আত্মদান করেছে গোপনে—
নিশ্চয় নিশ্চিত ইহা। বাহিরের চোখে
কতটুকু দেখা যায় আঁধার-আলোকে,
কতটুকু যায় চেনা? তাই ত সকলে
তোমারে, হে প্রিয়তম, হিমাচল বলে।
সৃষ্টির মঙ্গল-মূর্ত্তি দধিপাত্র শিরে
শিবেরে করিয়া কোলে পালিছ পৃথ্বীরে;
বহাইয়া সুরধুনী পুণ্য বক্ষসুধা
পিয়ায়ে নিখিল জীবে পুষিছ বসুধা;
রুক্ষ কাঠিন্যের বর্ম্ম দেখিয়া নয়নে
সে তোমার বাহু-রূপ সমাধি-শয়নে
সর্ব্বকালজয়ী দেহ! শৃঙ্গবাহু তুলি'
ডাকিছ সন্তানে তব স্বর্গদ্বার খুলি'।

২

কঠোর-কঠিন অঙ্গ প্রস্তর আকার,
তবু তার প্রাণ আছে করে তা স্বীকার
শিশুছাড়া সর্ব্বজনে যেবা চক্ষুষ্মান
যদিও আপাত-দৃশ্যে সে শুধু পাষাণ।
আরো বড় হবে যবে মানব-শৈশব
দৃষ্টি-অন্তরালে যবে শিখি অনুভব
হেরিবে নূতন চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি খুলি'
সেদিন তব এ বাহ্য আবরণ ভুলি'
স্বরূপ দেখিবে তব ভবিষ্য-মানব;
ধ্যানমূর্ত্তি হেরি তব হইবে নীরব
আজিকার অবিশ্বাসী; বন্দিবে বিস্ময়ে
তোমার ও পাদদেশ ভক্তিভরা ভয়ে।
হে তাপস হে সুন্দর হে চিরমঙ্গল,
সেদিনের কথা ভাবি চোখে আসে জল।

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিশ্র ভৈরবী—ভৈরোঁ—তেতালা।

গিরি গোবর্দ্ধন হৃদি বৃন্দাবন
সেবাকাঙ্ক্ষিত হে চিরবাঞ্ছিত
প্রকট সোই তব মম প্রার্থন অব
রূপ ধিয়ানে আবো প্রাণে
আশা করত হুঁ পিয়াস বুঝাউঁ
তব মূরত স্মর বিনতি তাপ হর
তরসত তন মন হৃদি বৃন্দাবন্

কুঞ্জনচারী বসো মুরারী।
অতুলিত শোভা জগমনলোভা!—
নবঘন মূর্ত্তি কীয়ো পূর্ত্তি।
চিত্ত উদাসী প্রেম বিলাসী;
তব পদ মাগি সব সুখ ত্যাগি।
ন কছু সুহাবে আশ মিটাবে;
যাত হুঁ বারি বসো মুরারী॥

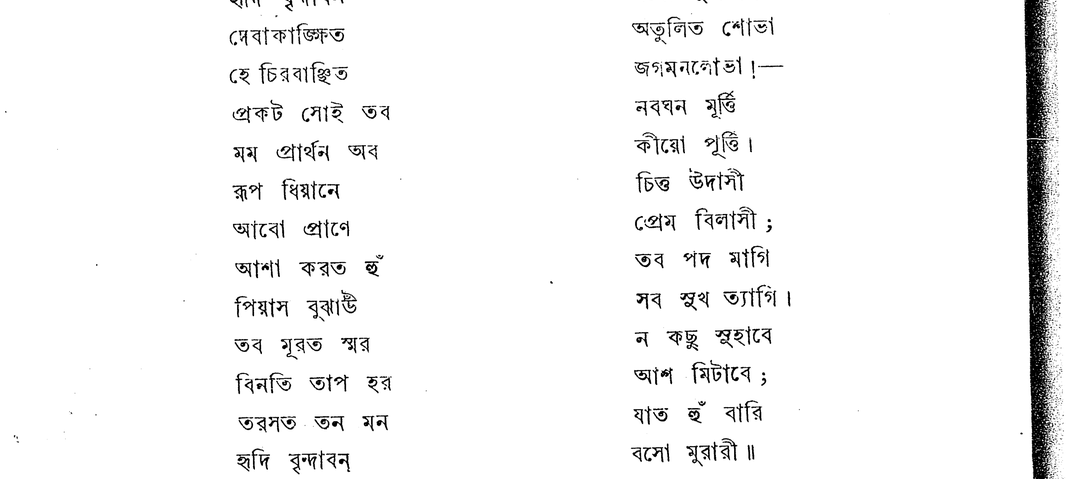

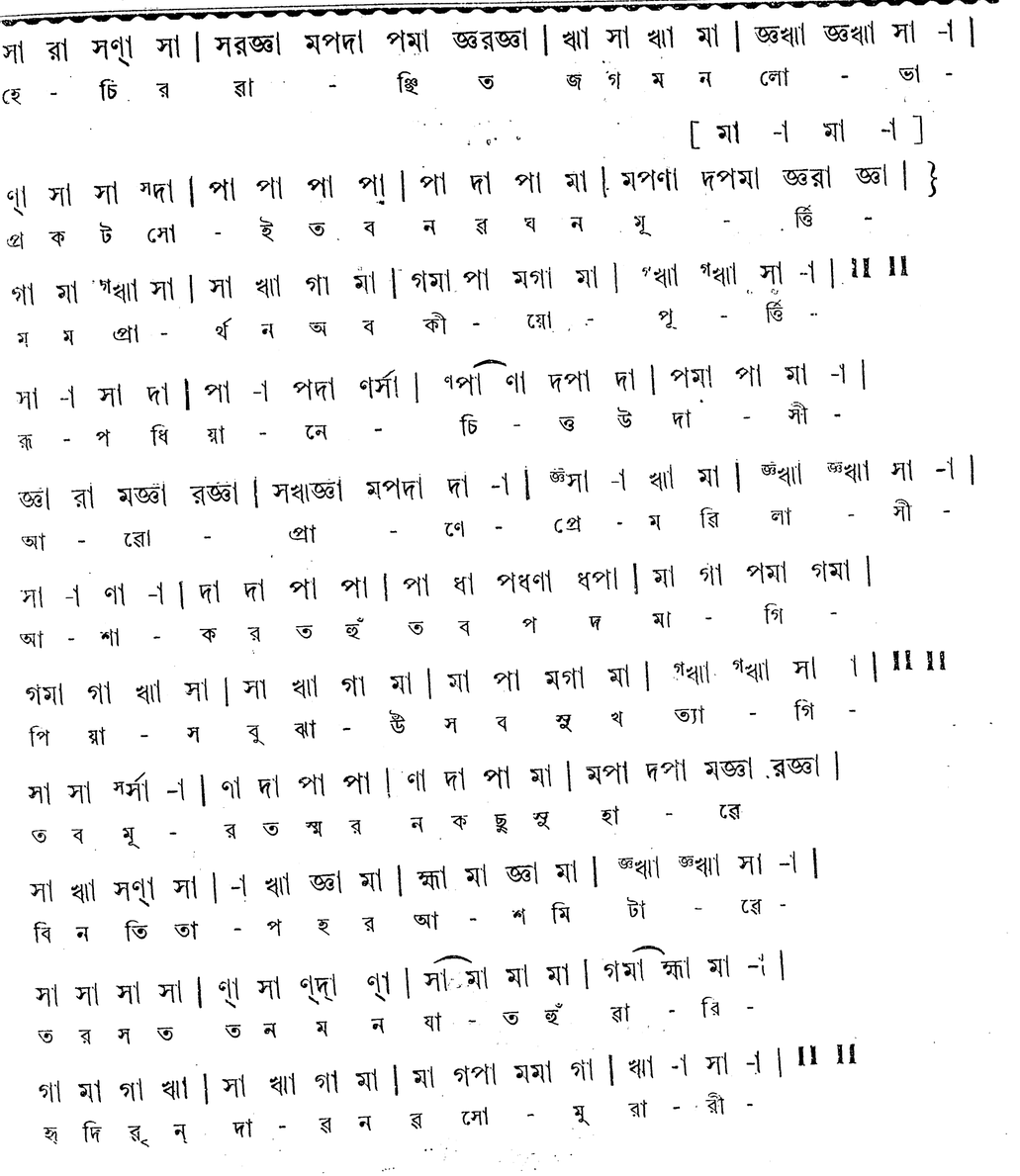

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিশ্র ভৈরবী—ভৈরোঁ—তেতালা।

গিরি গোবর্দ্ধন কুঞ্জনচারী
হৃদি বৃন্দাবন বসো মুরারী।
দেবাকাঙ্ক্ষিত অতুলিত শোভা
হে চিরবাঞ্ছিত জগমনলোভা!—
প্রকট সোই তব নবঘন মূর্ত্তি
মম প্রার্থন অব কীয়ো পূর্ত্তি।
রূপ ধিয়ানে চিত্ত উদাসী
আবো প্রাণে প্রেম বিলাসী;
আশা করত হুঁ তব পদ মাগি
পিয়াস বুঝাউ সব সুখ ত্যাগি।
তব মূরত স্মর ন কছু সুহাবে
বিনতি তাপ হর আশ মিটাবে;
তরসত তন মন যাত হুঁ বারি
হৃদি বৃন্দাবন বসো মুরারী॥

II ধ্‌া ণ্‌া ণ্‌া সা | সা -া সা সা | সা -া রা সন্‌া | সরা গা মা -া |
গি রি গো - র - র্দ্ধ ন কু - ঞ্জ ন চা - রী -

গা মা গরা গা | সা -া রা গা | সা রা গা মা | গরা গা রসা -া | I
হৃ দি বৃ ন্‌ দা - ব ন ব সো - মু রা - রী -

সা ঋা সঋা জ্ঞমা | মা -া মা মা | মপা মদা পমা জ্ঞরা | জ্ঞা রা মজ্ঞা রজ্ঞা |
দে - বা - কা - ঙ্ক্ষি ত অ তু লি ত শো - ভা -

সা রা সণ্‌া সা | সরজ্ঞা মপদা পমা জ্ঞরজ্ঞা | ঋা সা ঋা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া |
হে - চি র বা - ঞ্ছি ত জ গ ম ন লো - ভা -

[মা -া মা -া]

{ ণ্‌া সা সা সদা | পা পা পা পা | পা দা পা মা | মপণা দপমা জ্ঞরা জ্ঞা | }
প্র ক ট সো - ই ত ব ন ব ঘ ন মূ - র্ত্তি -

গা মা গঋা সা | সা ঋা গা মা | গমা পা মগা মা | গঋা গঋা সা -া | II II
ম ম প্রা - র্থ ন অ ব কী - য়ো - পূ - র্ত্তি -

সা -া সা দা | পা -া পদা র্ণসা | ণপা ণা দপা দা | পমা পা মা -া |
রূ - প ধি য়া - নে - চি - ত্ত উ দা - সী -

জ্ঞা রা মজ্ঞা রজ্ঞা | সঋজ্ঞা মপদা দা -া | জ্ঞসা -া ঋা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া |
আ - বো - প্রা - ণে - প্রে - ম বি লা - সী -

সা -া ণা -া | দা দা পা পা | পা ধা পধণা ধপা | মা গা পমা গমা |
আ - শা - ক র ত হুঁ ত ব প দ মা - গি -

গমা গা ঋা সা | সা ঋা গা মা | মা পা মগা মা | গঋা গঋা সা -া | II II
পি য়া - স বু ঝা - উঁ স ব সু খ ত্যা - গি -

সা সা সর্সা -া | ণা দা পা পা | ণা দা পা মা | মপা দপা মজ্ঞা রজ্ঞা |
ত ব মূ - র ত স্ম র ন ক ছু সু হা - বে

সা ঋা সণ্‌া সা | -া ঋা জ্ঞা মা | হ্মা মা জ্ঞা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া |
বি ন তি তা - প হ র আ - শ মি টা - বে -

সা সা সা সা | ণ্‌া সা ণ্‌দ্‌া ণ্‌া | সা মা মা মা | গমা হ্মা মা -া |
ত র স ত ত ন ম ন যা - ত হুঁ বা - রি -

গা মা গা ঋা | সা ঋা গা মা | মা গপা মমা গা | ঋা -া সা -া | II II
হৃ দি বৃ ন্‌ দা - ব ন ব সো - মু রা - রী -

তক্ষশিলা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ

প্রথম অধ্যায়

পথে

শ্রাবণ মাসের ২৯শে তারিখ শুক্রবার রাত্রি ৮টার সময় হাওড়া হইতে পাঞ্জাব মেলে স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশ্যে তক্ষশিলা অভিমুখে রওনা হইলাম। তক্ষশিলার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর, শুনিয়াছি। আমার তৃতীয় মাতুল মহাশয় সরকারী প্রত্নবিজ্ঞান-বিভাগের কার্য্য-ব্যপদেশে তক্ষশিলায় অবস্থান করেন। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন; এখন সপরিবারে পুনঃ কর্ম্মস্থানে যাইতেছেন। সেই সঙ্গে আমিও যাইতেছি।

প্রথম রাত্রি

যথাসময়ে পাঞ্জাব মেল তাহার 'মোহন বাঁশী' বাজাইয়া, ঘর্ঘর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, রাশি রাশি ধূম্রকুণ্ডলী উদ্গীরণ করিতে করিতে বিশাল দেহ লইয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিল। বাহিরে জমাট অন্ধকার, মনের মধ্যেও অন্ধকার; প্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সমস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া—কে জানে কত দিনের জন্য, অথবা চিরদিনের জন্যই না কি—ভারতের সুদূর প্রান্তান্তরে চলিয়া যাইতেছি। জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে মনের উপর যে কতটা আঘাত লাগে, তাহার অভিজ্ঞতা-লাভ জীবনে ইতিপূর্ব্বে আরও একবার ঘটিলেও আঘাতের পরিমাণটা এইবারই যেন কিছু বেশী বোধ হইল। সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে আর এক দিন বাঙ্গলার কোন্ সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট বিদায় লইয়া যখন নৌকাযোগে ধীরে পল্লী-নদীর বক্ষ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন অন্যূন পঞ্চাশৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—প্রবল বারিপাতের মধ্যেও তীরে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায়—সজলনেত্রে আমাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে করুণ বিদায়-দৃশ্য আজ থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতে লাগিল। এ দৃশ্য বাঙ্গালী-মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইতে পারে, সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ।

মনের এইরূপ চঞ্চল অবস্থায় চোখে ঘুম বড় আসিল না। কিছুক্ষণ উন্মুক্ত জানালা দিয়া উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দুই পাশে অন্ধকার বিজড়িত বিটপী-শ্রেণী, তাহার ফাঁকে ফাঁকে কখন জোনাকির মত দুই একটা আলোক, আর মাঝে মাঝে এক একটি আলোকোজ্জ্বল ষ্টেশন,—চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুখ দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে ক্বচিৎ কখন দেখা-সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এই অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় কখন্ যে বাঙ্গালার সীমানা ছাড়াইয়া বিহারের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহা হৌক, রাত্রির শেষ দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ভোরে জাগিয়া দেখি, পাটনা সিটী ষ্টেশনে আসিয়াছি। ইত্যবসরে মনটাও তাহার প্রাথমিক চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া সুস্থির হইয়া আসিয়াছে। রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া বর্দ্দিতে গলার গোড়াটা বড় ছম্-ছম্ করিতেছিল। কথা কহিতে যাইয়া দেখি, কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিছু গরম চা পান করিয়া গলাটা একটু ঝালাইয়া লওয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন

পাটনা ছাড়াইলেই দুই দিকে কেবল দিগন্তবিস্তৃত বিশাল মাঠ,—তাহাতে বাঙ্গলার মত ধান-পাট নাই। অধিকাংশ জমিতেই কেবল গম ও ভুট্টার চাষ। মাঝে মাঝে সারি সারি অসংখ্য ঊর্দ্ধশীর্ষ তালবৃক্ষ। স্থানে স্থানে মাটীর দেওয়ালোপরি নির্ম্মিত খোলার ঘর সমন্বিত এক একখানি ছোট গ্রাম। ক্রমশঃ বৃহৎ বৃহৎ আম্রবাগান চোখে পড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে দেখিলাম, বহুবিস্তীর্ণ ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানি করিয়া রোপা ধানের ক্ষেত; তাহাতে চারিদিকে আল বাঁধিয়া জল রাখা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের মত বর্ষা-প্লাবিত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র একখানিও দৃষ্টিগোচর হইল না।

দেখিতে দেখিতে বৃহৎ শোণ নদ অতিক্রম করিলাম। শোণ নদের উপরিস্থ সেতুটি সুবিখ্যাত সাড়া-সেতুর ন্যায় আড়ম্বরবহুল না হইলেও দৈর্ঘ্যে বোধ হয় কম হইবে না। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ, স্ফীত-যৌবন বিশাল শোণ নদের ঈষৎ আবিল জলরাশি উভয় কূল প্লাবিত করিয়া ধীর-মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে নদের মধ্যখানে একখানি গ্রাম,—ঠিক যেন দ্বীপের মত জলের উপর ভাসিতেছে—মনোরম দৃশ্য!

এইরূপে দক্ষিণে ও বামে নানা বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা ৯টায় মোগলসরাই জংশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের টিকেট—ভায়া মোগলসরাই—সাহারাণপুর; কাজেই মোগলসরাইতে পাঞ্জাব মেল বদল করিয়া আউধ-এণ্ড-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িতে মিনিট কুড়ি দেরী—আহারের জন্য কিছু ডালপুরী, তরকারী ও কুঁজো ভরিয়া জল লওয়া গেল। ৯৷৷০ টায় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মোগল সরাইয়ের পরের ষ্টেশনই ৮কাশীধাম। এইবার বিহার ছাড়িয়া ক্রমশঃ যুক্তপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতেছি। মিনিট দশেকের মধ্যেই গঙ্গার উপরিস্থ সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। মরি, মরি, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!—জীবনে আর কখন দেখি নাই, দেখিবও না। বর্ষা-সমাগমে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত উত্তরবাহিনী ভাগীরথী কাশীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া তর-তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। তটোপরি নবোদিত সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত অসংখ্য বিচিত্র সৌধমালা। তন্মধ্যে শত শত অর্দ্ধমগ্ন দেউলের গর্ব্বোন্নত চূড়া। মাঝে মাঝে সুরম্য সোপানাবলী,—তদুপরি স্নান-রত অসংখ্য নরনারী,—যেন শিল্পীর সযত্ন-অঙ্কিত একখানি ছবি—অপরূপ দৃশ্য! সমগ্র নগরীটি যেন গঙ্গার মধ্য হইতে উঠিয়াছে। এ কি যথার্থই বাস্তব জগতের স্থূল দৃশ্য, না কল্পনালোকের কোন অলীক চিত্র! হে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! হে ভারতের তীর্থ বারাণসী! হে জগতের ঈশ্বর বিশ্বনাথ!—তোমাদের শত শত প্রণাম!!

কাশী ষ্টেশনে গাড়ী মাত্র দুই মিনিট থামিলেও গঙ্গাজল স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল,—অবশ্য জনৈক পাণ্ডার কৃপায়। পরের ষ্টেশন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে আর কিছু পানীয় জল ও কাশীর উৎকৃষ্ট আমের আচার লইয়া তৎসহ মোগলসরাইয়ের ডালপুরী ও নিরামিষ কুমড়ার তরকারীর সদ্ব্যবহার করা গেল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ী অপেক্ষা আউধ-এণ্ড-রোহিলখণ্ডের গাড়ী অনেক অনুন্নত। অল্পবিস্তর ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে ও কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে শুনিতে হিন্দুস্থানের বিশাল প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। আমাদের কামরায় আর একজন বাঙ্গালী,—মোগলসরাইতে উঠিয়াছেন,—লাক্সারে গাড়ী বদল করিয়া দেরাদুন যাইবেন।

প্রতাপগড়ে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১২টা। অত্যধিক গরম বোধ হইতে লাগিল। চলন্ত ট্রেণে বাতাস পাওয়া যায়; কাজেই ততটা কষ্ট বোধ হয় না। গাড়ী হইতে নামিয়া পানিপাঁড়ের প্রদত্ত জল দ্বারা মাথাটা ধুইয়া ফেলিয়া কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলাম। এই গ্রীষ্মের দিনে রেলকর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ষ্টেশনেই জল দিবার অতি সুবন্দোবস্ত করিয়া যাত্রীসাধারণের, বিশেষতঃ দূরগামী যাত্রীদের, বড়ই উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক ষ্টেশনেই পানিপাঁড়েরা "বাবুজি, পানিমে সুরাই ভরকে লিয়ে" বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া জল দেয়; দুই একটা পয়সা দিলে খুসী হইয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের কোন রেল ষ্টেশনেই এমন সুবন্দোবস্ত নাই। প্রতাপগড়ে বেশ সস্তা ছোট ছোট আম পাওয়া গেল,—প্রতিটা মাত্র ৫ পয়সা। এবার বাঙ্গলায় আম অত্যন্ত মহার্ঘ। কিছু আম এবং ছোট খোকাটির জন্য কিছু গরম মহিষ-দুগ্ধ ক্রয় করিয়া লইলাম। গরুর দুধ মিলিল না!

প্রতাপগড়ের পর কয়েক ষ্টেশন ছাড়াইলে দেখিতে লাগিলাম, স্থানে স্থানে গাছের সঙ্গে সারি সারি কুব্জপৃষ্ঠ, বৃহদাকার উট বাঁধা রহিয়াছে;—কোথাও মাঠের উপর দীর্ঘ-গ্রীব সারস পাখীগুলি ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতেছে; আবার কোনখানে স্থূলকায় মহিষগুলি দলে দলে কর্দ্দমাক্ত জলের মধ্যে শরীর নিমজ্জিত করিয়া মাত্র নাসিকাগ্র বাহির করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে মাঠের শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা ৩৷৷০টায় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ওয়াজেদ আলী শার লক্ষ্ণৌ,—মানস-নয়নে কত দৃশ্য দেখিলাম, মনে কত ইতিহাস জাগিল।

"ক্বগতা ধরণীপালাঃ সসৈন্য বল বাহানাঃ।
বিয়োগ সাক্ষিনী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥"

সমস্ত দিন এক ভাবে বসিয়া থাকিতে কোমর লাগিয়া

আসিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়া কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া শরীরটা একটু ঝাড়িয়া লইলাম।

লক্ষ্ণৌ ছাড়াইলে আবার দুই ধারে কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত অকর্ষিত ভূমি; মাঝে মাঝে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের ঝোপ মিলিয়া সমগ্র প্রান্তর ভরিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। একখানিও শস্যক্ষেত্র দেখিলাম না। ক্বচিৎ কোথাও বিশাল মাঠের কোন প্রান্তে দুই একখানি গ্রাম অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এমনি মাঠের উপর দিয়া ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল।

দ্বিতীয় রাত্রি

সাহাজানপুর যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! তার পর, জানি না কখন, একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,—ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে জাগিয়া দেখি, মোরাদাবাদে পৌঁছিয়াছি। রাত্রি তখন ১০টা। 'ঠাণ্ডি পাণি', 'গরম চা', 'সোডা লেমনেড্', 'ডাল-রুটী-পুরী',—আর তৎসহ 'হিন্দু ওয়াস্তে,' 'মুসলমান ওয়াস্তে',—ইত্যাদি চীৎকার, এবং মিঠাইওয়ালা, ফলওয়ালা, চুড়িওয়ালা, ছুরী-কাঁচিওয়ালা, খেলনাওয়ালা, ঘটি-বাটিওয়ালা, প্রভৃতি ফেরিওয়ালাদের বিবিধ প্রকার স্বর মিলিয়া এক অভিনব ঐক্যতান-বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কান ঝালাপালা করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এক একজন ফেরিওয়ালা নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য-সামগ্রীতে সাজাইয়া ঠিক যেন এক একখানা প্রতিমার চালীশুদ্ধ কাঠামো মাথায় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও নানারূপ সুরতানলয়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করিতেছে। সে কাঠামোয় দুনীয়ার কি যে আছে, আর কি যে নাই, বলা কঠিন। বাসনওয়ালারা নিকেলের কলাইকরা ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট পিতলের ঘটি, বাটি, গ্লাস, থালা প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া অনবরত হাঁকিয়া যাইতেছে। জিনিষগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর,—ঠিক রৌপ্য-নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। এই মোরাদাবাদী বাসনের খুব প্রসিদ্ধি আছে। মিঠাই-বিক্রেতারা মিঠাই-বোঝাই এক একখানা গাড়ী ঠেলিয়া ঠেলিয়া ট্রেণের কামরার কাছে আনিতেছে। তাহাদের মুখোচ্চারিত নাম শুনিয়া, অথবা চাক্ষুষ দেখিয়াও দুই একটি ব্যতীত কোন মিঠাইয়েরই 'কুলশীল' বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হৌক্, একটা বিষয় খুবই লক্ষ্য করিলাম। এক একজন ফেরিওয়ালা যেরূপ গুরুভার বোঝা মাথায় করিয়া, অথবা গাড়ী ঠেলিয়া বৃহৎ ট্রেণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনবরত যাওয়া-আসা করিতেছে, সেরূপ বোঝা আমাদের বঙ্গদেশের পাঁচজনেও লইয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। মোরাদাবাদে আবার এক প্রস্থ ডালপুরী-তরকারী কিনিয়া লইয়া রাত্রির আহার কার্য্য সমাপ্ত করা গেল।

মোরাদাবাদের পর হইতে অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গরমটা একটু কম বোধ হয় বটে, কিন্তু কোন ষ্টেশনে থামিলেই কেমন একটা গরমের গুমোট চারিদিক হইতে যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এই ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ইচ্ছা ছিল, সাহারানপুরের পর গাড়ী যখন যমুনা অতিক্রম করিবে, তখন জাগিয়া থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিব। কিন্তু কখন্ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জাগিয়া দেখি, সাহারানপুর ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছি; রাত্রি তখন ৪টা। ৩।টায় গাড়ী সাহারানপুর ত্যাগ করিয়াছিল।

সাহারানপুর হইতেই গাড়ী নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের লাইনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার যুক্তপ্রদেশের সীমানা ছাড়িয়া পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল।

তৃতীয় দিন

আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শিশির-সিক্ত সবুজ গম ও ভুট্টা-ক্ষেত্রগুলি নানা প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষের সমবায়ে চতুর্দ্দিকেই বেশ একটা সজীবতার সৃষ্টি করিয়াছে। আম্বালায় পৌঁছিয়াই দেখি, পূর্ব্বদিনের মোগলসরাইয়ে পরিত্যক্ত পাঞ্জাব মেল এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী, প্রভৃতি হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর পাঞ্জাব মেল সোজা উত্তর দিকে, শিমলার পথে, কাল্‌কা-অভিমুখে চলিয়া গেল; আর আমরা ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আম্বালার পরেই সুপ্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ আমাদের

চোখে পড়িল। কখন সমান্তরালভাবে, কখন বা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আবার আসিয়া এই ইতিহাস-বিশ্রুত প্রাচীন পথটি সমস্ত রাস্তাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল, অথবা আমরাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলাম। ক্রমে শিমলা শৈলের দক্ষিণ-দিকস্থ অস্পষ্ট পর্ব্বতাবলী দৃষ্টিগোচর হইল। আম্বালার পর হইতে গাড়ীতে একটু একটু করিয়া ভিড় হইতে লাগিল।

গাড়ী ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি বন্য হরিণ চলন্ত ট্রেণ দেখিয়া মাঠের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটি সুদৃশ্য নীলকণ্ঠ ময়ূর পুচ্ছ মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইবার একটি একটি করিয়া পাঞ্জাবের পঞ্চ নদ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় লুধিয়ানা ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ পরেই সর্ব্বপ্রথম সাতলেজ (শতদ্রু) পার হইলাম। রেলওয়ে সেতুর পাশাপাশি কিয়ৎ দূরেই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সেতু। তাহার উপর দিয়া মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, গরু, সমস্তই যাতায়াত করিতেছে।

বেলা ৯টায় জলন্ধর সিটী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আবার সেই ডালপুরী-তরকারী দিয়া ভোজন-কার্য্য সমাধা করা গেল। জলন্ধরের কয়েকটা ষ্টেশন পরে বিয়াস ষ্টেশনের অদূরে বিয়াস (বিপাশা) নদী উত্তীর্ণ হইলাম। এখানেও গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড্ পূর্ব্বের মতই পাশাপাশি সেতুর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গরম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায়ই কখন্ একটু ঘুম আসিয়াছিল; জাগিয়া দেখি, অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বেলা তখন ১০টা। অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। আজ দুই দিন স্নান হয় নাই, রাত্রিতে ঘুম হয় নাই, অভ্যস্ত আহার হয় নাই। এঞ্জিনের ধূমে স্বেদ-সিক্ত মুখমণ্ডল, জামা, কাপড়,—সমস্তই কালিময় হইয়া গিয়াছে। শারীরিক ও মানসিক একটা বড় অস্বাভাবিক ভাব বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, একটা পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কিন্তু এত আর দেশ-ঘর নয় যে, পুকুর মিলিবে! কাজেই "যস্মিন দেশে যদাচার"—এই নীতি-বাক্যই শিরোধার্য্য করিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া ষ্টেশনের একটা কলের নীচে মাথাটা রাখিয়া সেই ধূলি-কালি-কয়লা-মাখা রুক্ষ চুলগুলি ধুইয়া কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া একরূপ সজল মাথা লইয়াই গাড়ীতে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম।

অমৃতসরের পর হইতে ভিড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃহদাকার পাঞ্জাবিগণ, বিশেষতঃ দীর্ঘ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত আকালী শিখেরা মাথায় বৃহৎ পাগড়ী, গায়ে সার্ট, ওয়েষ্ট্ কোট, কোট, পরিধানে ঝুলমুল ঢিলা পাজামা, পায়ে বৃহৎ জুতা, ও কটিতে কোষবদ্ধ কৃপাণ লইয়া আরও বৃহদাকার হইয়া এক একজন একাই পাঁচজনের স্থান জুড়িয়া বসিতে লাগিল, এবং নিজেদের মধ্যে অবিশ্রাম অবোধ্য ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিল। ইহাদের আলাপ-প্রলাপের উৎস কি কেবল রেল-গাড়ীতে আসিলেই খুলিয়া যায়? আমরা তাহাদের কথাবার্ত্তায় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহারা বীরের জাতি। এই সেদিনও ইহারা ধর্ম্মের জন্য, স্বাধিকারের জন্য সম্পূর্ণ অহিংসভাবে যেরূপ অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কেবল দুর্ল্লভ নহে—তুলনাশূন্যও বটে। শ্রদ্ধায় ইহাদের প্রতি মস্তক অবনত হইতে লাগিল।

অমৃতসরের পর হইতে আবার সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ মাঠ,—দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত, মাটীর গৃহ-পরিপূর্ণ দুই একখানি গ্রাম কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

বেলা ১২টায় লাহোরে পৌঁছিলাম। আর সেই যথাপূর্ব্ব 'ঠাণ্ডিপানি,' 'সোডা লেমনেড্',—'গোস্ত রোটী,' 'ডাল-পুরী,' 'আলু-ছোলে'—'হিন্দু ওয়াস্তে,' 'মুসলমান ওয়াস্তে,' ইত্যাদি চীৎকার। আমাদের কামরার নিকট দিয়া একজন অল্পবয়স্ক ফেরিওয়ালা বিকৃতস্বরে ডাকিয়া যাইতেছে, "মিঠা সেউ—পেচ্ছে পেচ্ছে।" "পেচ্ছে পেচ্ছে" কিরে বাপু? হরি হরি, পয়সা পয়সা!

পাটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাস্তায়ই ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে বুঝিলাম,—এই সব স্থানে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে হিন্দু এবং মুসলমানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। ইহাতে একটা বিষয় খুবই লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে এখনও সামাজিক ব্যবস্থায় ততটা শৈথিল্য আসে নাই; বোধ হয়, এই সব প্রদেশে এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলাদেশের মত অলিতে গলিতে তথাকথিত

সাম্যবাদী এবং উদারনৈতিকের উদ্ভব ও উপদ্রব হয় নাই। দেখিয়া মনে একটু আনন্দই হইল। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া সামাজিক আচার-ব্যবহারে বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলিয়া যাইবে, ইহা যেমন কখনও সম্ভবপর নহে, তেমনি, বোধ হয়,—কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয়ও নহে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলাদেশের সাম্যবাদী ও উদারনৈতিক দল কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য অস্পৃশ্য অখাদ্য ভোজনে পটু,—কিন্তু বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায় সাম্য ও উদারনীতি অবলম্বন জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব,—সৎসাহস এবং তেজস্বিতা আবশ্যক হইলেই তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শনে তৎপর; তখন সঙ্কীর্ণতা এবং কুসংস্কার তাহাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলে!

লাহোর ছাড়িয়াই যখন রাবি (ইরাবতী) নদী পার হইলাম, তখন দেখিলাম, নদীতে বন্যা হইয়া লাহোরের উত্তরাঞ্চল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে; রাস্তা-ঘাট-মাঠ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে; অনেক দালান-কোঠার মধ্যে জল গিয়াছে; বহু গো-মহিষ মৃতাবস্থায় জলের উপর ভাসিতেছে। বন্যা তখন কিছু কমিয়া আসিয়াছে, তাহা জলের দাগ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। লাহোর ষ্টেশনে একখানা খবরের কাগজ কিনিয়াছিলাম; তাহাতে দেখিলাম, কয়েক দিন পাঞ্জাবে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়াতে এই বন্যা হইয়াছে। পাঞ্জাবে এত অধিক বৃষ্টি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আর হয় নাই।

লাহোরের পর হইতে গাড়ী ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্যার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া চলিয়াছি। গরমটা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রাস্তা যেন আর ফুরাইতে চাহে না। যাহা হৌক্, বেলা ২টায় ওয়াজীরাবাদের পর চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদী উত্তীর্ণ হইলাম।

খড়িয়ান নামক একটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া আসিতেই দুই ধারে নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু পাহাড় চোখে পড়িতে লাগিল। বেলা ৪টার পর ঝিলাম ষ্টেশনের নিকট ঝিলাম (বিতস্তা) নদী অতিক্রম করিলাম। আমাদের সঙ্গী গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ পূর্ব্ববৎই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঝিলাম সহরটি এই অঞ্চলের একটি বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর। সহরের নীচে দিয়াই নদীটি প্রবাহিতা! নদীতে বড় বড় বোঝাই নৌকা; জলের মধ্যে বহু বৃহৎ বৃহৎ পার্ব্বতীয় কাষ্ঠ ভাসমান রহিয়াছে।

ঝিলামের পর কিছুদূর পর্য্যন্ত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র। তার পর যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, দূরবর্ত্তী পাহাড় সকল ততই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক অথচ সুগভীর পার্ব্বত্য নদী ও গহ্বর সকল পার হইতে হইতে চলিলাম। তারপর,—তারপর কেবল পাহাড়, পাহাড়, পাহাড়! সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে কেবল উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরমালা। এইবার গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা' ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। হয়ত কিছুক্ষণ আগে যে স্থান দিয়া আসিয়াছি, একটু পরেই আবার ঘুরিয়া ঠিক সেই স্থানের কিছু উপরে উঠিয়াছি। দুইধারে উত্তুঙ্গ পাহাড়-শ্রেণী,—মধ্য দিয়া রাস্তা কাটিয়া লাইন বসাইয়া গিয়াছে; ইহারই উপর দিয়া পাহাড়ের ক্রোড় ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া গাড়ী কখন পশ্চিম, কখন দক্ষিণ, কখন পূর্ব্ব, কখন উত্তরমুখী হইয়া ধীর অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। ক্রমে পর পর পাহাড় মধ্যস্থ ছোট ছোট দুইটা সুড়ঙ্গ (টানেল) পার হইলাম। তখনও বেলা আছে; কিন্তু সুড়ঙ্গের মধ্যে জমাট অন্ধকার,—পাঁচটা অমাবস্যা রাত্রি একত্র করিলেও বোধ হয় এত অন্ধকার হয় না। এই বিজন, দুর্গম, বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যেও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ আমাদের পরিত্যাগ করে নাই। কখন পাহাড়ের গা' ঘেঁসিয়া, কখন বা পাদদেশ দিয়া সমান্তরাল ভাবে, বা রেল লাইন অতিক্রম করিয়া এদিক ওদিক আঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইয়া আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে এক একখানি ছোট গ্রাম,—যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী শৈল-ক্রোড় হইতে সযত্নে কাটিয়া বাহির করিয়াছে। ভাষায় সে দৃশ্য বর্ণনা করিয়া বুঝান অসম্ভব। পাহাড়-বেষ্টিত উপত্যকার মাঝে মাঝে :এক একটি ছোট ষ্টেশন। এই নির্জ্জন শৈলস্তূপরাশির মধ্যে কোথা হইতে যে যাত্রী আসিয়া এই সব ষ্টেশনে সমবেত হয়, বুঝিতেই পারিলাম না।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। দূরে দূরে শৈল-ক্রোড়স্থিত দুই একখানি পল্লী-কুটীর হইতে কোন পাঞ্জাবী বধূর প্রজ্জ্বলিত সান্ধ্যদীপশিখা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সে অস্পষ্ট আলোক হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যাইয়া প্রবেশ করিল,—প্রিয় জন্মভূমির মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া গেল। কোথায়

শস্য-শ্যামল বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্র; আর কোথায় প্রস্তরময়, বন্ধুর, নীরস, উত্তুঙ্গ শৈলস্তূপরাশি! ইহারই মধ্য দিয়া, আগত-প্রায় অন্ধকার রাত্রি সম্মুখে করিয়া যেন নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত কোন্ অজ্ঞাত দেশে ছুটিয়া চলিয়াছি! এ যাত্রার পরিসমাপ্তি কোথায়—কতদূর?

তৃতীয় রাত্রি

মান্দ্রা নামক পার্ব্বত্য জংশন ষ্টেশনটিতে যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর কয়েকটি ষ্টেশন পরে রাওলপিণ্ডি। মান্দ্রার পর হইতে গাড়ী পাহাড়রাশি ছাড়াইয়া সমতল উপত্যকার বক্ষ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার,—দুই চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। তথাপি জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলাম। কেবল দূরে দূরে গর্ব্বোন্নতশীর্ষ শৈলস্তূপরাশি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছে, অনুমানে বুঝিয়া লইতে লাগিলাম। রাওলপিণ্ডি যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি ৮টা। রাওলপিণ্ডিতে গাড়ী দুই ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিবে। গাড়ীর মধ্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। গাড়ী থামিতেই নামিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি যাইয়া পাথর-কুচি-আচ্ছাদিত প্লাট্‌ফর্ম্মের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম,—বড় আরাম লাগিল। একটু পরেই আহার্য্যের অন্বেষণে উঠিয়া পড়িলাম! কিন্তু ক্রমাগত দুই দিন ডালপুরী খাইয়া ভেতো বাঙ্গালী মুখটা যেন ভাত-ভাত করিতেছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, চা' প্লেটের এক প্লেট করিয়া ভাত ।/০ আনায় পাওয়া যায়। ঐরূপ পাঁচখানা প্লেটের ভাতেও বোধ হয় একজনের উদরের এক কোণাও ভরিবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া আবার সেই ডালপুরীর শরণাপন্নই হইতে হইল।

রাত্রি ১০॥টায় রাওলপিণ্ডি ত্যাগ করিয়া আবার সেই পাহাড়বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। পিণ্ডির পরের ষ্টেশন গোলরা। গোলরা এই অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পার্ব্বত্য ষ্টেশন। সমুদ্র-বক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা ২০০০ ফিট। কাজেই এই গোলরা পর্য্যন্ত চড়াই, অর্থাৎ ক্রমশঃ উচ্চ ভূমি; তৎপর হইতেই উৎরাই,—ক্রমশঃ নিম্ন ভূমি। রাওলপিণ্ডি হইতে গোলরা মাত্র নয় মাইল। অথচ চড়াই ঠেলিয়া এই পথ অতিক্রম করিতে কলিকাতা মেলেরও প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। আর একটা ষ্টেশন পরেই ট্যাকশিলা (তক্ষশিলা)।

গোলরার পর হইতে গাড়ী অধিকতর দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। যথা সময়ে পরবর্ত্তী ষ্টেশন সাংজানি ছাড়াইলাম। আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ট্যাক্‌শিলা পৌঁছিব। গাড়ী কখন উপত্যকার উপর দিয়া, কখন উপত্যকা-মধ্যস্থিত গভীর খাতের ভিতর দিয়া অপেক্ষাকৃত প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, গাড়ী পাহাড়-নিম্নস্থ একটা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতেছে। মিনিট খানেক লাগিল; কাজেই সুড়ঙ্গটি নেহাৎ ছোট নহে, মনে হইল। সুড়ঙ্গ পার হইয়া মিনিট দশেকের মধ্যেই তক্ষশিলায় আসিয়া পৌঁছিলাম,—অকূলপাথারে কূল পাইলাম। রাত্রি তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে।

ট্যাক্‌শিলা ষ্টেশনে গাড়ী ১০ মিনিট থামে। ভাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। মিউজিয়মের অফিস হইতে আগেই লোক আসিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। কাজেই জিনিষপত্র, লটবহর লইয়া আমাদের আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। ষ্টেশন হইতে অফিস অর্দ্ধ মাইলেরও কম। সুতরাং সে রাত্রির মত আর পল্লী মধ্যস্থ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে না যাইয়া অফিস-সংলগ্ন গৃহেই রাত্রি যাপন করিব,—এই ইচ্ছায় জিনিষ পত্র ও কুলি এবং অন্যান্য লোকজনসহ আমরা ষ্টেশন ছাড়িয়া সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে দীপালোকে পথ দেখিয়া দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আজ তিন দিন ক্রমাগত গাড়িতে চড়িয়া প্রায় দেড় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করার পর পদব্রজে এই পথটুকু ভ্রমণ বড়ই আরামপ্রদ লাগিল। কিন্তু শরীর তখনও ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে,—মনে হইল যেন গাড়িতেই চলিতেছি। মিনিট পনেরর মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া তাড়াতাড়ি বিনা বাক্যব্যয়ে শুইয়া পড়িলাম। সেই পশ্চিমদেশীয় কঠিন, ইতস্ততঃ গ্রন্থিবিশিষ্ট, অনাচ্ছাদিত খাটিয়া ('মঞ্জি') আজ কুসুম শয্যাপেক্ষাও কোমল বলিয়া বোধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি, আমরা চতুর্দ্দিকে পাহাড়-পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত এক অতি মনোহর উপত্যকায় আসিয়া পড়িয়াছি।

(ক্রমশঃ)

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

"বউ মা—"

"যাই বাবা—"

বধূ বাসনগুলা রন্ধনগৃহে গুছাইয়া রাখিতেছিল, তখনও সিক্ত বসনখানা ছাড়িতে পারে নাই। শ্বশুরের আহ্বান কাণে আসিবামাত্র সে বাসনগুলি তেমনি অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইল।

শ্বশুর উপেন্দ্রনাথ বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের আসনে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। পুত্রবধূ তখনও সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করে নাই দেখিয়া তিনি রুদ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—"এখনও কাপড় ছাড় নি মা? এমনি করে শেষটায় একটা গুরুতর অসুখ না বাধিয়ে দেখছি ছাড়বে না। নিজে তো ভুগবেই, আমাকেও ভুগিয়ে মারবে।"

বধূ লজ্জিতা ও কুণ্ঠিতা হইয়া উঠিল; মুখখানা নত করিয়া ধীর স্বরে বলিল, "এই যে বাবা, এখনি গিয়ে ছাড়ছি, আপনি ডাকছেন শুনে তাড়াতাড়ি করে—"

বাধা দিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না মা, আমার দরকারটা এমন বিশেষ কিছু জরুরী নয় যে, তোমায় ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়েই তা শুনতে হবে। আমি ভেবেছিলুম, তোমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাই কয়েকটা কথা বলব বলে ডেকেছিলুম। যাও, তুমি আগে ভিজে কাপড়-খানা ছেড়ে এসো, তার পরে কথা হবে এখন।"

ধীরপদে দেবী চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে সিক্তবস্ত্র ছাড়িয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া শ্বশুরের কাছে ফিরিয়া আসিল।

আজ প্রথম এই বুঝি শ্বশুরের দৃষ্টি বধূর বহুতালি-যুক্ত বস্ত্রখানার উপর পড়িল। তাই তিনি বিস্ময়ে সেই দিক পানেই চাহিয়া রহিলেন,—হাতের হুঁকা হাতেই রহিয়া গেল।

তাঁহার সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া দেবী আরও বেশী রকম কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল; দুই একটা তালি লুকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল, "না বাবা, ভাল কাপড়ও আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়া কি না,—এইটেই হাতের কাছে পেলুম, তাই পরলুম।"

অতিধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উপেন্দ্রনাথের বক্ষ চিরিয়া বাহির হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, "তাই হোক মা, তোমার কথাই সত্য হোক, ভগবান যেন সেই আশীর্ব্বাদই করেন।"

কথাটার মধ্যে কি ছিল তাহা দেবী বেশ বুঝিতেছিল। যত লজ্জার বোঝা তাহার মাথায় আসিয়া চাপিল। জানিয়া শুনিয়া সে এত বড় একটা জীবন্ত মিথ্যাকে অনায়াসে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিল। আর তাহার অমন জ্ঞানী শ্বশুরও সে কথা মিথ্যা জানিয়াও সত্য বলিয়া অতি সহজেই মানিয়া লইলেন। কিন্তু জোর করিয়া মিথ্যাকে সত্য বলায় যে একটা বেদনা অনুভব করা যায়, সেটা তাঁহার কণ্ঠস্বরে ঝরিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কেন ডেকেছিলেন বাবা?"

সেই মনের কোণে হঠাৎ-লুকাইয়া-পড়া কথাটীকে স্মরণ করিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, সে একটা কথা আছে মা। এখন এখানে একটু বসতে পারবে কি,—এতটুকু ছুটি তোমার হবে কি?"

বধূ উত্তর দিল, "পারব বাবা, এখন আমার তেমন বিশেষ কাজ কিছু হাতে নেই।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে একটু বসো। এই পত্র-খানা আজ এসেছে, পড় দেখি।"

পত্রের পানে তাকাইয়াই বধূর মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

উপেন্দ্রনাথ বধূর সে ভাব লক্ষ্য করিলেন,—শান্ত স্বরে বলিলেন, "নাও মা, পত্রখানা বেশ করে একবার পড়। তারপর আমার যা কথা তা আমি পরে বলব এখন।"

দেবী কম্পিতহস্তে পত্রখানা তুলিয়া লইল।

উপেন্দ্রনাথ বেদনাভরা হাসি হাসিয়া ব্যথাভরা স্বরে বলিলেন, "আর কেন মা চেষ্টা কল্যাণী, ছেঁড়া তার আর

কি জোড়া লাগে? যে তার একবার কেটে গেছে, তাকে হাজার জোড়া দাও সে আবার কেটে যাবেই। তুমি মা মঙ্গলময়ী—সংসারের মঙ্গলই তোমার ইচ্ছা। তোমার এই মঙ্গলেচ্ছা তোমায় যে একেবারে অপমানের নিম্নস্তরে ফেলে দিচ্ছে, সেটা কি বুঝতে পারছ না মা, সেটা কি দেখতে পাচ্ছ না? কাকে তুমি আপন করতে যাচ্ছো মা? যে সব বুঝেও অবুঝের ভাণে চলে গেল, তাকে? আমি তোমাকে যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে বউ মা?"

দেবী পত্রখানা ভাঁজ করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে রাখিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেন বাবা, বুঝে উঠতে পারছেন না কেন?"

উপেন্দ্রনাথ হতাশ দৃষ্টিতে শুধু পুত্রবধূর অনিন্দ্যসুন্দর সরল পুণ্য-মণ্ডিত মুখখানির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দেবীর কণ্ঠে অনেকখানি জড়তা আসিয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আমার অপরাধ হয়েছিল বাবা, আপনার আদেশ না শুনে আমি দিদিকে পত্র দিয়েছিলুম; কিন্তু এ অপরাধ কি এতই গুরুতর হয়েছে বাবা, যে মার্জ্জনা করতে পারবেন না? আপনার মুখ দিনরাত বিষণ্ণ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝি কত দুঃখ করে—এই সব দেখে আমার মনে হল, আমিই আপনাদের মিলনের সেতু হই না কেন। তাঁরা আপনার কাছে আসুন, আপনার ছেলের সঙ্গে আবার আপনার মিলন হোক। বড়দি এসে বসুন, আমি তাঁর সেবার ভার আমার হাতে নেব, ছেলেপুলে দেখব, এই আনন্দ কল্পনা করে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলুম। এ আমি আমার ক্ষুদ্র মেয়েবুদ্ধিতেই করেছিলুম বাবা, আমি জানতে পারি নি যে এতে—"

বাধা দিয়া ধীর স্বরে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না মা, এ তোমার অসৎবুদ্ধি-প্রণোদিত নয়, সৎবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েই তুমি এ কাজ করেছ,—এর ফল যে কি হবে অতদূর তুমি বুঝিতে পার নি। কিন্তু জানো কি মা, শ্রীবৎস রাজার ঘরে যখন শনির কোপদৃষ্টি পতিত হয়েছিল, তখন চিন্তারাণীর হাত হতে পোড়া শোলমাছটাও পালিয়েছিল। আমার এখন শনির দশা, সোণা ধরব—হয়ে যাবে ছাই; শক্ত করে বাঁধন দিতে গেলে উল্টে সেই বাঁধন নিজের গলায় আসে। আমার নামে এখন যা করতে যাবে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

দেবী বলিল, "কিন্তু বাবা, রাজা শ্রীবৎসও তো আবার সুসময় পেয়েছিলেন, যা তাঁর হারিয়েছিল সবই আবার পথ চলার সময় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, আপনি কেন আপনার সেই হারান দিনটীকে কুড়িয়ে পাবেন না? মানুষের চিরদিন যে সমান যায় না এ কথা আপনিই তো বরাবর বলে আসছেন বাবা। আপনারই কি এমনি দিন যাবে? আশা রাখুন, হঠাৎ কোন দিন সেই শুভক্ষণটী এসে পড়তে পাবে—যেদিন আপনার বড় ছেলে স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে আপনার এই পর্ণ-কুটীরেই ফিরে আসবেন—আপনার এই শূন্য গৃহ পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

উপেন্দ্রনাথ গম্ভীর হাসিলেন—"বালিকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। জানো মা, যদি তারা আসতেও চায়—"

তিনি থামিয়া গেলেন, মুখ ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবী উৎসুক হইয়া বলিল,—"তবে কি বাবা?"

উপেন্দ্রনাথ তেমনি হাসিয়া বলিলেন, "আর কি এ ঘরে তাদের জায়গা দিতে পারব মা?"

ব্যগ্রকণ্ঠে দেবী বলিল, "কেন তাদের জায়গা দিতে পারবেন না বাবা?"

সে কথার উত্তর না দিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তারা এখানে আসতে চাইবেও না মা। কলিকাতার সেই বাড়ী-ঘর, জাঁক-জমক ফেলে তারা আসবে এই পল্লীগ্রামে, এই কুঁড়ে ঘরে? এ যে ঘুমিয়ে স্বপ দেখা বউ মা, এ কখনও কি সম্ভব হতে পারে?"

তর্ক করা দেবীর স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষ যদি ননদিনী হইত, সে দু'কথা বলিলেও বলিতে পারিত; কিন্তু এ যে পূজনীয় শ্বশুরের কথা। সে উত্তর না দিয়া তাঁহার কথাই মানিয়া লইল। মনের মধ্যে জাগিতেছিল—জগতে অসম্ভবই বা কি। যাহা একেবারে অচিন্তনীয়, তাহাও যখন ঘটিয়া যায়, তখন তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসা তো অসম্ভব নয়।

একটুখানি নীরব থাকিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এদিকে সংসারের অনাটন নিত্য বেড়ে চলেছে,—সত্যকে পড়াতেও তো আর পেরে উঠছি নে। খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে,—কি যে করি, তা কিছু ঠিক করতে পারছি নে।"

স্বামীর প্রসঙ্গে দেবীর মুখ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। সে মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া অনাবশ্যক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া হাতের শাঁখার ময়লা পরিষ্কারে ব্যাপৃতা হইল।

চিন্তিতমুখে উপেন্দ্রনাথ কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "এই যে তার মাস গেলে বারটা করে টাকা—এ আমি দিই কোথা হতে? যদিও সে একটা টিউশানি যোগাড় করে কিছু উপায় করছে—তাতে তো কলকাতায় মেসে থেকে পড়া চলে না। এই—মাস গেলে বারটাকার ভাবনা আমার আগে, মাসের প্রথম দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি সামনে অন্ধকার—টাকা কোথায় পাব? এই টাকার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার দেহ গেল। তাই ভাবছি, ওকে আর পড়াব না। আর পড়িয়েই বা লাভ কি, কি বল মা?"

দেবীর গৌরবর্ণ মুখখানা সিঁদূরের মত লাল হইয়া উঠিল। অথচ উত্তর না দিলেই নয়। যতক্ষণ না উত্তর দেওয়া যাইবে, উপেন্দ্রনাথ এমনি জিজ্ঞাসুভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিবেন। তাই সে থামিয়া কাসিয়া উত্তর দিল, "তা বই কি।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপনে ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বি-এ পাশ করেছে, এম-এ না হয় নাই পড়লে। একটা বছর পড়েছে,—ধরলুম, সে টাকাটা আমার জলে ফেলাই হয়েছে। আর একটা বছর বাকি আছে একজামিন দেবার। এই একটা বছর মাত্র মাসে বার টাকা করে দেওয়ার অভাবে তার পড়াটা মাটী হয়ে গেল।"

পুত্রের বিষণ্ণ মুখখানার কথা কল্পনা করিয়া পিতার স্নেহকোমল বুকটা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তখনই তিনি সে করুণ ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তা হোক, আমার মত গরীব পিতার সন্তান যখন সে—জীবনে এমন অনেক ক্ষতিই তাকে সইতে হয়েছে, আরও সইতে হবে। তার বাপ যখন অপারগ, তখন তার না পড়াই ভাল। সামনে পূজো আসছে, এই ছুটিতে সে বাড়ী এলে তাকে আমি এই কথাটা বুঝিয়ে বলে দেব। সে আমার বাধ্য ছেলে, আমার কথা রাখতে সে তার জীবনে খুব বড় ক্ষতিও সহ্য করতে পারবে বলেই জানি,—সে জিতেন নয়।"

কথায় কথায় সেই সংসার ও সমাজত্যাগী ছেলের কথাই মনে পড়ে। যতই তাহাকে দূরে রাখিতে চান, সে ততই সকলের মাঝে স্ফুট হইয়া উঠে।

যে কাছে থাকে তাহার জন্য মন তত অধীর ব্যগ্র হইয়া উঠে না—যতটা যে একেবারে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহার জন্য মন তত বেশী অনুভব করে। কাছে যে থাকে সে সহজলভ্য, না ডাকিতেই সাড়া দেয়, কাছে আসে। কিন্তু দূরে যে চলিয়া যায়, সে সাড়া দিবে না, কাছে আসিবে না, তাই মনও অবিশ্রান্ত তাহাকেই পাইতে চায়।

দেবী উঠিবার কোন একটা ওজোর খুঁজিতেছিল। উপেন্দ্রনাথ তাহার সে অকারণ ব্যস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিলেন, "পূজোর পর হ'তে সত্য একটা কোনও কাজের ঠিক করে নিক, নইলে আমার দ্বারা আর সংসার চালানো সম্ভবপর নয়। চোখে ভাল দেখতে পাই নে,—লোকের বাড়ী পূজো করা যা অভ্যেস হয়ে গেছে, তা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আর করতে পারি নে। আর এ কাজও যে বেশী দিন করতে পারব তা বোধ হয় না, দেহ ক্রমেই অপটু হয়ে পড়ছে। বয়েস যাচ্ছে বই ঘুরে তো আসছে না মা! আর কি এখন খাটতে পারা যায়? তোমার অদৃষ্টও এ সংসারে এসে মন্দ ফলই দিলে মা, কোথায় তোমায় আনলুম—"

নিজের প্রসঙ্গে দেবী সজাগ হইয়া উঠিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলবেন না বাবা; আপনি আমার অদৃষ্ট মন্দ বলছেন, আমার অদৃষ্ট যেমন এমন আপনি আর কারও দেখান দেখি। আপনার মত শ্বশুর যার, ঠাকুরঝির মত ননদ যার, তার অদৃষ্ট মন্দ এ কথা বলা সাজে না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়াছিল—আর তাহার স্বামীর মত স্বামী যার, কিন্তু ছিঃ, সে কথা কি বলা যায়?

শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি পুত্রবধূর মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া উপেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যাও মা, তোমার অনেক কাজ আছে এখনও, আর তোমায় দেরী করাব না, অনেকক্ষণ তোমায় বসিয়ে রেখেছি, এতক্ষণে হয় ত তোমার সব কাজ হয়ে যেত।"

দেবী উঠিতে উঠিতে বলিল, "কাজ করতে আর এমন বেশীক্ষণ কি লাগে বাবা। ভারি তো কাজ, কখন শেষ হয়ে যায়, সারাদিনটা কেমন করে কাটবে ঠিক পাই নে।"

সে রন্ধনগৃহের দিকে চলিয়া গেল।

(২)

বহুকাল পূর্ব্বে উপেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য করিয়া গৃহলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। তখন জ্যেষ্ঠপুত্র জিতেন্দ্রনাথ সপ্তদশ-

বর্ষীয়, সত্যেন্দ্র পঞ্চম বর্ষীয় ও কন্যা ভবানী এক বর্ষ বয়স্কা মাত্র!

তখনও এই পরিবারের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি, বাগান, পুষ্করিণী, বাড়ীতে ধানের গোলা, ঢেঁকিশালা, গোয়ালভরা গরু সবই ছিল। ইহা ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে উপেন্দ্রনাথ পুরোহিত ছিলেন; ইহাতেও তাঁহার লাভ হইত বড় কম নয়।

সুতরাং পত্নীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের অনেক বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইলেন না। কন্যাদায়গ্রস্তেরা যেমন আশান্বিতভাবে আসিয়াছিল, তেমনি নৈরাশ্য লইয়া তাহাদের ফিরিতে হইল। উপেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা অচল অটল রহিল, তিনি কিছুতেই তাঁহার মৃতা পত্নীর ত্যক্ত আসনে কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না।

জিতেন্দ্রনাথ যে সময়ে আই-এ পড়িতে গেলেন, সেই সময়ে ঢাকা জিলার একটী জমিদারের একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এ বিবাহে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন।

জমীদার মহাশয় সপরিবারে কলিকাতাতেই বাস করিতেন, দেশের সহিত সম্পর্ক তাঁহার খুবই কম ছিল। বিশেষ সুবিধা হইল—জিতেন্দ্রনাথ সেখানে থাকিয়া কলেজে যাতায়াত করিতে পারিতেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় জামাতার সকল ভার লইয়াছিলেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন।

জিতেন্দ্রের স্ত্রী মায়া যখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, সেই সময় উপেন্দ্রনাথ তাহাকে একবার নিজের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। সঙ্গে দুইজন পরিচারিকা আসিয়াছিল। ইহাদের বনিয়াদী ধনী চালে উপেন্দ্রনাথ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভবানী তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, বাড়ীতে অন্য মেয়ে আর কেহই ছিল না। তিনি নিজেই সমস্ত কাজ সত্য ও ভবানীর সাহায্যে কোনরূপে সারিয়া লইতেন। মায়া রন্ধন করা দূরে থাক, সামান্য কোন কাজও জানিত না। যদিও সে শিশু ননদ বা বালক দেবরের কাজ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কোন কাজে হাত দিতে যাইত, দাসী দুইটী হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িত। বাধ্য হইয়া উপেন্দ্রনাথকে নিজে রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করাইতে হইত। যে আরামটুকু পাইবার জন্য তিনি পুত্রবধূকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সে আরাম পাওয়া দূরে থাক, এ যেন আরও অশান্তিকর হইয়া উঠিল। এত করিয়াও তিনি তবু কম কথা, কম নিন্দা শুনেন নাই।

মায়া এখানে এক সপ্তাহের বেশী থাকিতে পারে নাই। এখানকার জল বাতাস তাহার মোটে সহ্য হইত না, দিনরাত গায়ে জামা আঁটিয়া, পায়ে জুতা ষ্টকিং দিয়াও সে সর্দ্দির হাত এড়াইতে পারে নাই। এক সপ্তাহের মধ্যে একটা দিনও তাহার মাথাধরা ছাড়ে নাই; কাজেই জিতেন্দ্রনাথ পিতাকে বলিয়া স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর মায়া বয়স্থা হইলে উপেন্দ্রনাথ আরও এক বার তাহাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়ার পিতা সুবিনয় বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি জানেন বেহাই, মায়ার মত মেয়ে আপনাদের ওই নোংরা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মোটে টিঁকতে পারবে না। কেবল ওরই জন্যে আমি আমার জন্মভূমির মায়া পর্য্যন্ত ছেড়েছি। একবার নিয়ে গিয়ে দেখেছেন তো, তার শরীর ভারি খারাপ হয়ে যায়। আর যে কাজকর্ম্মের জন্যে নিয়ে যাবেন, তাও জানে না সে,—কিছু করতে পারে না। ঝাঁটা কি করে ধরতে হয়, উনান কি করে ধরাতে হয়, এ শিক্ষা যার নেই, সে আপনাকে রেঁধে ভাত খাওয়াবে, এ মনেও ঠাঁই দেবেন না। পাড়াগাঁয়ে গেলে তার চেহারা যেন আধখানা হয়ে যায়। সে ধাক্কা সামলাতে তার ছয়মাস সময় লাগে। তাই আমি ভাবছি, তার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। ভগবান করুন, জিতেন মানুষ হোক, এখানে কাজকর্ম্ম করুক, আপনারাও এখানে থাকবেন, মায়াও গিয়ে আপনাদের কাছে থাকবে। আরও একটা কথা, সে এখন পড়ছে, এবার ম্যাট্রিক দেবে, এই সামনে তার একজামিন। এখন কোথাও একটা দিনের জন্যে গেলে, ওর একটা বছর একেবারে মাটি হবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস অতি কষ্টে রোধ করিয়া ছেলের পিতা ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবেন না। সত্যর বিবাহ তিনি গরীবের ঘরেই দিবেন, যে মেয়ে সর্ব্বাংশে তাঁহার ঘরের উপযুক্ত হইতে পারিবে।

জিতেনের পড়ার খরচ যোগাইতে ইতিপূর্ব্বে জমীজমা সবই গিয়াছিল। পুত্রের বিবাহে তিনি একটী পয়সা পণ লন নাই; সুতরাং বন্ধকী জমীগুলা একেবারেই হাতছাড়া

হইয়া গেল। আশা ছিল, ছেলেটী মানুষ হইবে, দুই পয়সা ঘরে আনিবে, তাঁহার সংসারে অনাটন-ক্লেশ কখনই হইবে না। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিলেন না,—পিতা যখন বাড়ী আসিবার জন্য পত্র দিতেন, তখন একটা না একটা ওজর করিতেন।

এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল—জিতেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। সুবিনয়বাবু কন্যা-জামাতাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য এক বন্ধুর সহিত বিলাত পাঠাইয়া দিয়া, তাহার পর বেহাইকে একখানা পত্র দিয়াছেন, ও এই কার্য্যের জন্য বারবার ক্ষমা চাহিয়াছেন।

এই পত্রখানা উপেন্দ্রনাথের বক্ষে বজ্রের সমান বাজিল। তিনি বদ্ধদৃষ্টিতে শুধু সেই কালসম পত্রখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন,—এ কথা যে সত্য, ইহা যেন তাঁহার বিশ্বাসও হইতেছিল না।

ইহার বৎসরখানেক আগে জিতেন্দ্রনাথের একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। উদাসীন উপেন্দ্রনাথ পৌত্রী মুখ দর্শন করিতে যান নাই, অথবা তাহাদের কোন সংবাদাদিও নেন নাই। যখন শুনিলেন, পুত্র-পুত্রবধূ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য ইউরোপে চলিয়া গিয়াছে, তখন সে মেয়েটী কোথায় আছে জানিবার জন্য তাঁহার মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল।

গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন সে তাহার দাদামণি ও দিদিমার কাছে রহিয়াছে। এই সময় পৌত্রীটিকে একবার দেখিবার বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল; অনেক ভাবিয়া তিনি মনের ইচ্ছা মনেই রাখিলেন।

ভবানীকে অষ্টম বৎসরে তিনি গৌরীদান করিয়াছিলেন। ভগবানের একটা নিয়মে যাহার এক দিক ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার একে একে সকল দিকই ধ্বসিয়া পড়ে। উপেন্দ্রনাথেরও হইয়াছিল তাই। ভবানীর এ বিবাহে সুধা উঠে নাই, উঠিয়াছিল গরল। ভবানীর স্বামী সংস্কৃত টোলে পড়িয়াছিল, ইংরাজিও জানিত। চেহারাটা তাহার সুন্দর ছিল, সংসারে মা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। অবস্থা তাহাদের বেশ উন্নতই ছিল। গৃহস্থ ঘরে সচরাচর এইরূপ দেখিয়াই লোকে কন্যাদান করে। সব রকমেই ছেলেটী বাহির হইতে দেখিতে ভাল ছিল। তথাপি উপেন্দ্রনাথ সুখী হইতে পারিলেন না; কারণ, জামাতার যে চরিত্র-দোষ ছিল, তাহা তিনি বিবাহের পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। জামাতার চরিত্র অল্প বয়সেই দূষিত হইয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুশ্চরিত্রতা আরও বাড়িতেছিল বই কমে নাই। শ্বাশুড়ী বালিকা বধূকে নির্য্যাতন করিতেন বড় কম নয়। তাহার অপরাধ—সে তাহার দুশ্চরিত্র স্বামীকে সৎপথে ফিরাইতে পারে নাই। এই অপরাধে ভবানী শ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল।

এই মেয়েটীর মুখের পানে তাকাইয়া স্নেহময় পিতা উপেন্দ্রনাথ অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার শ্বাশুড়ী কিছুতেই এই দুর্ব্বিনীতা অপয়া বধূকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। ইহার মূলে একটী সত্য গোপন ছিল। তিনি আরও কিছু অর্থ পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু উপেন্দ্রনাথের আর অর্থ দিবার সামর্থ্য ছিল না। এই কন্যাটীর বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাকে বাগান পুষ্করিণী সবই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল,—বাস্তুভিটাখানা ছাড়া আর তাঁহার কিছুই ছিল না।

কেবলমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রটীকে লইয়াই তিনি সুখে ছিলেন। সত্য যথার্থই এ পর্য্যন্ত পিতার খুব বাধ্য হইয়া চলিতেছিল,—কখনও পিতার অমতে সে কোন কাজ করে নাই। পাছে তাহার কোনও ব্যবহারে পিতার বুকে আঘাত লাগে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

কিছুকাল আগে তাহার কলেজের প্রফেসর শান্তিময় বাবু নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে চাহিয়াছিলেন,—সত্য পিতার মত না পাইলে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না জানাইয়াছিল। তাহার অমতের কারণ জানিতে পারিয়া শান্তিময় বাবু উপেন্দ্রনাথের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ মলিন হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িলেন, এ বিবাহ হইতে পারে না।

এ বিবাহে সত্য অনেকটা সাহায্য পাইত, এবং যথার্থ কথা বলিতে কি, সে শান্তিময় বাবুর কন্যা নলিনীর প্রতি কতকটা আকৃষ্টও হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পিতার অমত জানিতে পারিয়া—যখন শান্তিময়বাবু আসিয়া তাহাকে বিবাহের কথা বলিলেন, তখন সে স্পষ্টই অস্বীকার করিল।

শান্তিময়বাবু বলিলেন, "এ রকম ঘটনা প্রায়ই হচ্ছে যে,

ছেলে বাপকে না জানিয়েই বিয়ে করে,—বাপও কিছুকাল পরে ছেলেকে ক্ষমা করেন। তুমি বিয়েটা করে ফেল,—তোমার বাপ এখন একটু মনোকষ্ট পেলেও, পরে তোমায় তাঁকে ক্ষমা করতেই হবে।"

কিন্তু তথাপি সত্য রাজি হইতে পারিল না। সে বেশ জানিত, তাহার স্থিরবুদ্ধি, জ্ঞানবান পিতা মুখে কিছুই বলিবেন না, কিন্তু অন্তরটা তাঁহার এ আঘাতে একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। পিতার অন্তরে যাহাতে ব্যথা লাগে, তাহা করিতে সে মোটেই সম্মত ছিল না। তাই সে স্পষ্টতঃই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

ইহার কিছুদিন পরেই তাহার দেবীর সহিত বিবাহ হইল।

দেবী উপেন্দ্রনাথের জনৈক বাল্যবন্ধুর কন্যা। তাঁহার অবস্থাও অনেকটা উপেন্দ্রনাথের সমান ছিল; তাই বিনা আপত্তিতে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

দেবী নামে শুধু দেবী নয়, কার্য্যেও সে দেবীই ছিল। সে যদিও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ছিল, গৌরাঙ্গিনী ছিল না, তথাপি তাহার মধ্যে অসীম সৌন্দর্য্য ছিল। তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য মুখে ফুটিয়া উঠিত; তাই তাহার মুখ এত সুন্দর।

সে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াই সকলকে তাহার আপনার করিয়া লইয়াছিল। শ্বশুর, স্বামী, ননদিনী সকলেই তাহার গুণে বশ হইয়া পড়িয়াছিল। পাড়ার লোকে শতমুখে এই বউটীর সুখ্যাতি করিত।

কর্ম্মে আলস্য তাহার এতটুকু ছিল না। যদিও সে পিত্রালয় হইতে গা-সাজানো গহনা পাইয়াছিল, তথাপি এক দিনের জন্য তাহা তাহার গাত্রে উঠে নাই। শুধু দুইগাছি লাল শাঁখা তাহার প্রকোষ্ঠ দুটি শোভিত করিতেছে। সত্য এক দিন স্ত্রীকে অলঙ্কার পরিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। দেবী অন্যের কাছে যেমন এ কথা হাসিয়া চাপা দিয়া যাইত, সত্যের নিকট তাহা পারে নাই। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, "এখন আমায় গহনা পরতে অনুরোধ করো না। যখন সে দিন আসবে তখন আমি গহনা পরব।"

এই একটা কথাতেই সত্য নীরব হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, "তাই ভাল দেবী, গহনা পরার সময় আগে আসুক, তার পর তুমি গহনা পরো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, সে দিন যেন শীঘ্র আসে,—আমি যেন খুব ভাল হয়েই এম-এ পাসটা করতে পারি।"

তাহার একান্ত লক্ষ্য ছিল এম-এ পাসের দিকে। সে তাই প্রাণপণ যত্নে লেখাপড়া করিতেছিল। (ক্রমশঃ)

প্রবাসী

শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী

ভাই প্রদোষ,

বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে যখন বাংলা মায়ের শান্তিপ্রিয় নন্দদুলাল ছেলের নাম ঘুচিয়ে যোদ্ধৃবেশে বেরিয়ে পড়লুম, তুমি বোধ হয় তখন মোটেই আশ্চর্য্য হও নি। আশ্চর্য্য হ'বার কিন্তু কোন কথাই নেই, কারণ, আমার অন্তরের সব গোপনতম চোরাগলির খোঁজ তুমি জান। আমার এ তিরিশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কেমন ক'রে আমায় চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, তা' তো তুমি বেশ জানো। মনে পড়ে, গ্রামের ইস্কুলের পণ্ডিতমশাইএর ক্লাশ পালিয়ে, ঘোষালদের চণ্ডীমণ্ডপের পেছনের আমগাছটার উপর উঠে, সারাদিন বসে থাকা, নষ্টচন্দ্রের দিন যদুখুড়োর বাড়ীর আকগাছ কাটতে গিয়ে ধরা পড়া, আর মনে পড়ে, নন্দখুড়োর মেয়ে চন্দনার কাছ থেকে নুন চেয়ে নিয়ে কাঁচা পেয়ারা চিবান। সে অতি বাল্যের স্বপ্নময় সুখ-স্মৃতির কথা মনে করে এখনো এ মরু-প্রান্তরের পর্ণকুটীরে বাঙ্গালার শ্যামলসুষমাবর্দ্ধিত সন্তান চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। কোথায় আমার সেই ক্ষুদ্র পল্লীভবন, এখনো যখন ধূলিস্নিগ্ধ বেলাশেষ-ছায়ায় রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—মনে পড়ে আমার বাংলার

তুলসীতলার সে ক্ষুদ্র প্রদীপ, সে সায়াহ্নের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, সে শান্ত-শীতল গৃহাঙ্গনে ঠাকুরমার বেঙ্গমাবেঙ্গমীর গল্প। বাংলার মাঠের সে শ্যামলিমা, রসদাত্রী বাংলা মায়ের সে অফুরন্ত শস্যসম্ভার, ঝাউগাছের আড়ালে কোকিলের সে অন্তরস্পর্শী গীতরস, দীঘির বুকে বুকে পদ্মপাপড়ীর আকুলীব্যাকুলী খেলা, মাঠে মাঠে শান্ত-সন্ধ্যার সে মেদুর বায়ুপ্রবাহ—সব আমার কাছে স্বপন-মায়ার মতো! কিন্তু সে কি শুধু স্বপ্ন? আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই তো সে শ্যামল সুষমার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি।

সেদিন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। ইস্কুলের পণ্ডিত মশাইকে বই ছুঁড়ে মেরেছিলাম বলে কাকার কাছে যথেষ্ট মার খেলাম। হাত-পাগুলো যেন ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বৈঠকখানার ঘরে এক কোণে বসে বসে ভাবছিলাম—কেমন করে পণ্ডিতের টিকিটা একেবারে সমূলে তুলে নিয়ে আসা যায়। আঠার বছরের ষণ্ডা ছেলে আজ এমনি করে মার খেয়ে নিজের অপমানের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরছিলুম। মনে হচ্ছিল—যেন সবগুলো শিরার ভিতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তধারা ছুটে বেরুতে চাচ্ছিল। দূর—কি হ'বে এ গাঁয়ে থেকে। বেরিয়ে পড়লুম,—দক্ষিণপাড়ার রাস্তাটা ধরে ইষ্টিসানের দিকে রওনা হলুম। রাতের আঁধারে চারদিক যেন ধ্যানীবুদ্ধের মতো মৌন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক এ মৌন নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছিল। দুলে-পাড়ার পাশের রাস্তাটায় পড়তেই দেখলুম, কেরোসিনের ডিপেটা হাতে করে কে যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাবলুম বুঝি চক্কোত্তি মশাই তাঁর দৈনিক আহার্য্যের খোঁজে বেরিয়েছেন। সাম্‌নে এগুতেই দেখলুম চন্দনা। আমার মাথার বিদ্রোহী রক্তচাপ যেন তালে তালে নেচে উঠল, এ দশবছরের মেয়েটার কাছে আমার অপমানিত কৈশোর যেন রুদ্ধ অপমানে গর্জ্জে উঠল। মনে হচ্ছিল, নিজেকে নিজেই থেঁৎলে মাটীর ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে চন্দনার কাছে থেকে নিজেকে লুকুই।

"রবিদা, তুমি? এ রাত্রে চল্লে কোথায়?"

কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করলাম। চন্দনা আবার ডেকে বল্লে, "ও রবিদা, শুন্‌চ; এ রাত্তিরে বুঝি মামীমাকে ভাঁড়িয়ে তাস পিটাতে চল্লে?" বুঝলাম, আমার অপমানের কথা সে জানে না। বল্লুম, "কে চন্দ, এই যে তোর কাছেই যাচ্ছিলুম। সেই যে কাল তোর কাছে টাকাগুলো রেখেছিলাম দিতে পারিস? বড্ড দরকার রে!"

অনেক কথার পর চন্দনাকে বুঝালাম যে ষ্টেশনে কলিকাতা-যাত্রী কারুর কাছে পাড়ার ছেলেদের জন্যে একটা ফুটবল আন্‌তে দেওয়ার জন্য টাকা চাচ্ছি। বল্লুম, "ভাখ তুই ভাবিস্‌নে, কালই আবার ব্যাঙ্কের টাকা ফিরিয়ে দোব।"

"বেশ তো তুমি, দিলুম আর কি না ঠাট্টা? তোমার জিনিস তুমি নেবে, আমার ভা—রী তো বয়ে গেছে!"

সেই দিন কলিকাতা চলে এলুম। ভোরের বাতাসে যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, বাইরে তাকিয়ে দেখি, কোথায় আমার দূর-প্রসারী শ্যামলমাঠ, কোথায় আমার চণ্ডীমণ্ডপ, কোথায় আমার বেতসকুঞ্জ। এ যে সব নূতন—ভয়ানক নূতন। সব কথা মনে পড়ল। পল্লীমায়ের ক্ষীর-সমুদ্রের সুধা-ধারায় আমার জন্ম, পল্লীমায়ের স্নেহ-সরস প্রেমধারায় আমি বর্দ্ধিত, কলিকাতার তীব্র উত্তেজনা আমায় পাগল করে দিলে। শেয়ালদায় নেমে পড়লুম, কই কাউকেই তো দেখ্‌তে পেলুম না। আমার ছোট্ট গ্রামটীতে তো ভোর বেলা উঠেই চাটুজ্জে মশাই, গোপালখুড়ো, দুলে-পাড়ার যাদব—সবাইর পরিচিত মুখ দেখ্‌তে পেতাম। সবাইর সাথে দু'চারটে কথা বল্‌তে বল্‌তে পুকুর-ঘাটে মুখ ধু'তে যেতাম। কই, এখানে তো সে স্নেহ-সরস কুশল-প্রশ্ন নেই। এ তো বড্ড নূতন। আমার কান্না এল,—যে রাগের মাথায় সব ভুলে বসেছিলুম, এখন সব মনে হ'তে লাগ্‌ল। ভয়ে শিউরে উঠলুম। কান্নায় চোখে জল ভরে এল। * * *

* * * তার পর দু'বছরে জীবনের কত পরিবর্ত্তন হ'ল, কেমন করে বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিলুম, সে কথা আমার নিজেরই মনে নেই—কেবল এক দিন শুন্‌লুম মেসোপোটেমিয়ায় যেতে হ'বে।

* * *

* * * *

করাচী থেকে জাহাজটা ছাড়লে। হ্যাভার-স্যাক থেকে চুরুটটা বের করে ধরিয়ে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। পাশে একটা সাহেব হ্যাট্‌টা তুলে বল্লে, "হাউ স্প্লেন্‌ডিড্!" সত্যি, সন্ধ্যার এত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য কোন দিনই দেখি নি। বাংলার

সবুজ ঘাসের শিশির-ভেজা বুকের উপরে রূপার স্রোতের মতো জোছ্‌নার অপূর্ব্ব মাধুরী দেখেছি, কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের উঁকিঝুঁকি, আর সে জোছনার মাঝে ছোট্ট ছোট্ট কুটীরের আলো দেয়ালীর আলোকমালার মতো ফুটে উঠতে দেখেছি। কিন্তু সে যেন মায়ের হাসির মতো স্নিগ্ধ, তরুণীর দৃষ্টির মতো স্বচ্ছ, শিশুর হাসির মতো মধুর। সাগরের এ নিবিড় সৌন্দর্য্য আমার কাছে চির-নূতন। বহুদূর পর্য্যন্ত সার্চ্চলাইটের আলোয় ভ'রে গেছে, ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলির উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। আলো-আঁধারে, আকাশে-সাগরে সে এক বিরাট আলিঙ্গন।

ল্যান্স-নায়েক অপূর্ব্ব এসে পাশে দাঁড়াল, বল্লে, "মিটার, জোছ্‌না দেখেছ এমনি কোথাও?" বল্লুম, "বাংলার জোছ্‌না দেখেছি—সেও তো অম্‌নি।" "বটে! সমুদ্দুরের বুকের উপর চাঁদের আলো—তা'র চেয়েও সুন্দর?" চারদিক্ থেকে হুহু করে বাতাসের ঝাপটা আসছিল, সাহেবটা ম্যাকিন্‌টস্ জড়ায়ে চুরুট ফুঁকছিল, আর মাঝে মাঝে শিস্ দিয়ে বুঝি বা কোন প্রেমিকার উদ্দেশে সুর নিবেদন করছিল।

বাস্‌রায় পৌঁছুলুম—সে দিন শুক্রবার। দূর থেকে মস্‌জিদের গম্বুজ, মিনার দেখা যাচ্ছিল। ছোট্ট ছোট্ট অপ্রশস্ত গলি। দু'ধারে প্রকাণ্ড জোয়ান আরবী লোকগুলোর আঙ্গুর, আপেল, বেদানার দোকান। তাদের ঢিলা পা'জামা, তার উপর লম্বা কুর্ত্তা। কোমরে লম্বা ভোজালী। শীর্ণ বাঙ্গালী দেখা যাদের অভ্যাস, এ পৌরুষমূর্ত্তি তা'দের কাছে একটু নূতন বলেই মনে হ'ল। মার্চ্চ করে সহরের বাইরে ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম,—দূরে ইউফ্রেটীসের রূপালী জলরাশি প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে চিক্‌চিক্ করছিল। ইউফ্রেটীসের ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের খেজুর-গাছের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাতাগুলি রুদ্ধ আক্রোশে যেন গর্জ্জে উঠছিল। অপূর্ব্ব বল্লে, "বাস্‌রায় এলাম, বাস্‌রাই গুলাবই দেখ্‌লুম না এ পর্য্যন্ত!" প্রাইভেট অমর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অতি ধীরে বল্লে, "বটেই তো, ভাবছিলাম কোথায় "শিরিষপুষ্পাধিকৌ সৌকুমার্য্যে বাহু তদীয়ৌ" দেখ্‌ব—না দেখ্‌লুম, কতকগুলি শালকাটের মতো বিরাট বাহু; বাঃ বাঃ—ওর এক চাপড়েই যুদ্ধতৃষ্ণা একেবারে Freezing pointএ।"

* * * দু'বছর কেটে গেছে। আমরা তখন বাগদাদের পাঁচ মাইল দূরে একটা গাঁয়ে—টাইগ্রীসের তীরে। প্রথম যখন এ মরুপ্রান্তরে পদার্পণ করে এর শুষ্ক প্রাণধারা দেখেছিলাম, তার পর থেকে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। এখন রীতিমত আরবীতে পরিষ্কার কথা বল্‌তে পারি। জ্যাক্‌সন্ সাহেব তাই আমায় দোভাষি বলে ডাকেন। কাজ-কর্ম্মও এখন নেই তেমন—কারণ, বিলেতে না কি এখন শান্তির চেষ্টা হচ্ছে—যুদ্ধও থেমে এল। তাই নিত্যি বিকেলে টাইগ্রীসের তীর ধরে বেড়াই, দূরে খেজুর-পাতার ফাঁকে ফাঁকে মস্‌জিদের মিনার বৈকালিক সূর্য্যের আগুন-রাঙ্গা কিরণে ঝল্‌সে উঠে। দলের পর দল উট-আরোহী যাত্রী বাগ্‌দাদের পথ ধরে চ'লে যায়। বহুদিন পর প্রবাসী পথিক শান্ত-শীতল গৃহকোণের অপূর্ব্ব মাদকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কত কথা বলে যায়। কেউ বা মুসাফের দেখে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে, কেউ বা দুনিয়ার ফেরদৌস হিন্দুস্থানের বাসিন্দা দেখে মেহেরবাণী করে বিদেশবাসের জন্য সহানুভূতি জানায়।

সেদিন আকাশে-বাতাসে আকুলী-ব্যাকুলী খেলা। টাইগ্রীস যেন তা'র পূর্ণ যৌবন-গরিমায় স্ফীত হয়ে উঠেছে,—তালগাছের মাঝ দিয়ে যেন সহস্রশীর্ষ সাপের ক্রুদ্ধ আস্ফালন। বাতাসে ধূলোয় মিশে মস্‌জিদের আকাশস্পর্শী মিনারটাকে ছেয়ে ফেলেছে। পায়ে চলার পথের ধারে গুচ্ছেগুচ্ছে আঙ্গুর-ভরা ক্ষেত। থোপা থোপা আঙ্গুরের গুচ্ছ বাতাসে কেঁপে কেঁপে গাছের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছিল। ক্যাম্পে ফের্‌বার জন্য হোঁচোট খেতে খেতে পা চালিয়ে চল্‌ছিলাম; ধূলোময় বাতাসের ঝাপ্‌টা নাক মুখ ভরিয়ে দিলে। মাঝে মাঝে টাইগ্রীসের দম্‌কা হাওয়ার স্নিগ্ধ সুবাস। রাস্তা ছেড়ে একটা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম—অদূরেই একটী ছোট্ট কুটীর, ভাবলুম্ একটু দাঁড়াই—বাতাসটা থেমে যাক্।

ওয়াটার-প্রুফটা কাঁধে ফেলে গাছটার নীচে বসে পড়্‌লাম। কাছেই আরবী কুটীর। পেছনে ছোট্ট একটু বাগান,—আঙ্গুর, ডালিম প্রভৃতি ফলের গাছে ভরা। পাশে ছোট্ট একটুখানি কুয়া। দক্ষিণে ছোট্ট গাছের সাথে একটা উট বাঁধা—আর পাশে সতেরো আঠারো বছরের একটী আরবী মেয়ে। উট্‌টা শুধুই মাটীতে শুয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিল; আর সে মেয়েটি কেবলই তাকে দাঁড় করাবার জন্য গলার দড়িটা ধরে টান্‌ছিল।

ঠোঁট উল্টিয়ে মেয়েটা পরিষ্কার আরবীতে বল্লে, "দূর কম্‌বখ্‌ত্, উঠে দাঁড়া লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ার কোথাকার।" জানোয়ারটা কিন্তু শুধুই মুখ মাটিতে থুবড়ে পড়ে রইল। মেয়েটা তার মিঠে গলায় চেঁচিয়ে গৃহাভ্যন্তরের মাকে ডেকে বল্লে, "আম্মা, এ দুষ্‌মণটা কিন্তু এক্ষুণি মার খাবে, এই ছাখো, এটা কেবলি বৃষ্টিতে ভিজ্‌বে।" বৃষ্টির জলে সুন্দরী তরুণীর রুক্ষ বিপর্য্যস্ত কেশরাশির মাঝ দিয়ে জলের ধারা পড়্‌ছিল, আর রাগে তার শুভ্র নিটোল গণ্ড লাল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্লে, "উঠ্‌বিনে ফেরব্বাজ, রাখ্—" ঘরের ভিতর থেকে দুর্ব্বল কণ্ঠে মা ডেকে বল্লে, "রোশেনা, খোদার কশম্, মারিস্‌নি কিন্তু ওকে।"

চোখ ফিরাতেই মেয়েটীর দৃষ্টি আমার দিকে পড়্‌ল। লজ্জায় তার মাথাটা নুয়ে রইল; আর মাঝে মাঝে সে উট্‌টাকে তোল্‌বার জন্য মুখের দড়িটা ধরে টান দিতে লাগ্‌ল। আমার মাথায় কি যেন ঢুক্‌ল—আমি এগিয়ে গেলুম। মেয়েটা আমায় দেখে সরে দাঁড়াল। আমার যুদ্ধ-সজ্জা দেঁখে সে ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিলে। আমি বল্লুম, "উট্ কি আর এম্‌নি টেনে তোলা যায়—?" হাতের batonটা দিয়ে উট্‌টাকে দুটা আঘাত করতেই সেটা উঠে দাঁড়াল। সেটাকে টেনে নিয়ে আমি একটা ছোট চালা ঘরে বেঁধে দিলুম। মেয়েটা তার কুন্দফুলের মত মুখটা তুলে, আড়চোখে কৃতজ্ঞনেত্রে আমায় দেখে নিল। বল্লে—"বহুৎ তক্‌লিপ্ দিচ্ছিল এ বেয়াদপ জানোয়ারটা—দুষ্‌মণ।" তার পর ঢোঁক গিলে সরমজড়িত স্বরে বল্লে, "সাহেব, আপনি কি লড়াইতে এসেছেন, লড়াইর খুনখারাবী বড্ড ভয়ানক।" বল্লুম, "লড়াই তো থেমে এসেছে, বেহুদা খুনও থেমে এল আর কি!"

"আপনার ঘর?"

"হিন্দুস্তান, পাঞ্জাব মুলুক, মেরা নাম মীর হবিব।"

* * * *

সেদিন নওসেরা থেকে ৭০ নম্বর রাজপুত রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছুবার কথা। আমি ও অপূর্ব্ব ভোর-বেলা বেরিয়ে পড়লুম,—কাজকর্ম্মও নেই কিছু,—প্যারেড করাও হ'য়ে গেছে। ভোরের বাতাস আরবের শুক্‌নো মাটীর উপর লুটোপুটী খাচ্ছিল,—দাড়িম-পাতার ফাঁকে সূর্য্যের অগ্নিবৃষ্টি। অপূর্ব্ব তা'র সাহেবী কায়দায় বার্ম্মা চুরুটের ধুঁয়া কেবলি আমার মুখের উপর দিচ্ছিল। বল্লুম, "ছাখো, এবার কিন্তু বাংলা মুখো মন টান্‌চে।"

অপূর্ব্ব বল্লে, "বটে, বড্ড একা পড়ে গেছ,—এবার বুঝি সংসারী হ'তে চাও, Old boy, তাই বল—"

"Nonsense, বাড়ী ছেড়েছি কি আজ? সেও তো কতদিন হ'ল! আর লড়াই ফড়াই ভালো লাগে না।"

"কিন্তু যাই বল, আমার কিন্তু বেশ লাগছে! কেমন কঠোর উদ্দাম জীবন, জীবনের সব মধুই যেন পাচ্ছি, অবশ্যি——"

ধমক দিয়া বল্লুম, "Shut up"; অপূর্ব্বের মুখ থেকে একবার কথা আরম্ভ হ'লে তা'কে থামান মুস্কিল।

রাস্তার মোড় ঘুরে আমরা রোশেনাদের কুটীরের কাছে এসে পৌঁছুলাম। দেখ্‌লাম—রোশেনা কুয়া থেকে জল তুল্‌ছে। তার রুক্ষ কেশপাশ বাতাসে উড়ে উড়ে মুখ ছেয়ে পড়েছে। ক্ষীণ দেহলতা কলসীর ভারে বেতস-পত্রের মত নুয়ে পড়েছে। অপূর্ব্ব সাথে আছে বলে রোশেনার পরিচয় গোপন কর্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটা আরম্ভ করে দিলুম। কারণ, অপূর্ব্ব যদি বুঝ্‌তে পারে—এ তরুণী আমার পরিচিতা, তবে ক্যাম্পে গিয়ে সে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল বাধাবে। কিন্তু আমার এ হঠাৎ তড়িৎগতি অপূর্ব্ব যেন বুঝ্‌তে পার্‌লে; বল্লে, "কি হে, হঠাৎ যে একেবারে double march, বলি একটু ধীরেই হাঁটো না বাপু—এতো আর কুট-এল্-আম্‌রাতে যেতে হচ্ছে না"—হঠাৎ একটু থেমেই রোশেনাকে দেখে অপূর্ব্ব চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "রবি, eyes front"। আমি যেন কিছুই বুঝি নি ভাব দেখিয়ে একটু তিক্ত স্বরে বল্লুম, "কি আবার হলো, কোথায়? কি যে বল্‌চ।"

"ন্যাকা আর কি! ছাখই না বাপু একটু চোখটা মেলে, তা'র পর তো হাঁ করেই থাক্‌বি জানি।"

রোশেনার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বল্লুম, "ছাখো, এ কিন্তু বাংলা মুলুক নয় যে মেয়ে দেখ্‌লেই হাঁ করে থাক্‌বে। অসভ্যতা করেচ কি আরবীদের হাতে একেবারে শেষ।"

"রোসো, হাজার জঞ্জালের মাঝে একটী বাস্‌রাই গুলাব—তা'ও বুঝি তোমার সইছে না! বেশ আছ যা হো'ক তুমি!"

আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে রোশেনার দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়্‌ল। দেখ্‌লুম, মুখের আনন্দ-উৎফুল্ল সে ভাব আর

নেই। কি চিন্তায় যেন সে অনুপম মুখকান্তি মলিন হ'য়ে গেছে। একরাশ শিউলীর মত শুভ্র পেলব সে মুখখানি দুনিয়ার কোন ভাবনায় যেন মুস্‌ড়ে গেছে। দেখ্‌লুম, সে যেন কিছু বল্‌তে চায়—কিন্তু আমরা যে অনেক এগিয়ে গেছি। অপূর্ব্ব মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চাইছিল ও আপন মনে অনবরত ব'কে যাচ্ছিল।

এগারোটায় সে দিন ক্যাম্পে ফিরে এলুম। নওশেরা থেকে বাঙ্গালী বন্ধুরা আমাদের জন্য অনেকগুলো রুমাল পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে রুমালের বাণ্ডিলগুলো খুল্‌ছিলাম আর বাংলার কথা ভাব্‌ছিলাম। জানি এ সমুদ্র পেরিয়ে দেশে কোন বন্ধনই আমার নেই। আরবের ধূধূ করা মাঠ ও বাংলার অনন্ত-প্রসারী শ্যামলিমা আমার কাছে সব সমান। কিন্তু তাই ব'লে কি সেটা ভোলা যায়? এক একটী রুমাল খুলে বের কর্‌ছিলুম, আর আমার বাংলার ছবি চোখের উপর ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে রুমালগুলির উপর হয়তো বাংলার স্নেহপ্রবণ কত তরুণ-তরুণীর হস্তস্পর্শ পড়েছে, তা'দের অঙ্গ-সুষমা এখনও যেন সেগুলোর গায়ে গায়ে জড়িত রয়েছে। প্রবাসী বন্ধুদের জন্য এ স্নেহের দানে তা'দের স্নেহশীতল স্পর্শ যেন আমি বুক দিয়ে অনুভব কর্‌ছিলাম। পাইপটা ফুঁকতে ফুঁকতে অপূর্ব্ব এসে দাঁড়াল—প্যাণ্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে। পেছন ফিরে পবিত্র তা'র বৌদির চিঠি পড়্‌ছিল। ঠাকুরপো বাংলার মধুময় গৃহকোণ ছেড়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অগ্নিবুকে আশ্রয় নিয়ে আপন মনের মানুষটী এখনো খুঁজে পেলে কি না—বৌদি তাই জান্‌তে চাইছেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে পবিত্র বল্লে, "অপূর্ব্ব, বৌদি কি লিখেছে জানিস্—Right girl খুঁজে পেলুম কি না"——

অপূর্ব্ব বল্লে, "আর তুমি পেয়েছ! কেবলই থাক্‌বে কোণ-ঠাসা হ'য়ে ঘরে বসে।—ছাখ্—রবিকে জিজ্ঞেস্ কর, আজ কি ক'রে এলুম!"

পবিত্র জিজ্ঞাসুভাবে আমার পানে তাকাল। যে জিনিষটা গোপন রাখ্‌তে চাই, সেইটেই যেন সব কথার ভেতর দিয়ে কেবল আত্মপ্রকাশ কর্‌তে চায়;—আমি বড্ড মুস্কিলে পড়ে গেলুম; বল্লুম, "আমি ভাই গৃহহীন, সব-হীন—লাভ জিনিষটে আমার কুষ্ঠীতে নেই, তাই আমি কিন্তু আজ অপূর্ব্বের মতো কিছুই লাভ কর্‌তে পারি নি।"

"বটে, মরুভূমির ভেতর একটী ওয়েসিশ্—তা'ও তোদের চোখে পড়ে না—শুক্রাচার্য্যই বটে," এই বলে অপূর্ব্ব একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স টেনে নিয়ে বসে পড়্‌ল। পবিত্র চিঠিটা পকেটে পুরে অপূর্ব্বর হাত থেকে পাইপটা নিয়ে বল্লে, "কি দেখেছিস্ মিটার, বল্ না, আঙ্গুর? বেদানা? —না বাস্‌রাই গুলাব—"

অপূর্ব্ব যথেষ্ট রং ফলিয়ে রোশেনাকে দেখার কথা বল্লে। আমি চুপ্ করে রুমালগুলো ভাঁজ করা আরম্ভ করে দিলুম। মাঝে মাঝে রোশেনার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানির ছবি চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হয় তো বা তা'র কোন বিপদ-আপদ হয়েছে, রুগ্না মা হয় তো আরও কাতর হয়ে পড়েছে। রোশেনার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে এমনি কত কথা ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। পবিত্র অপূর্ব্বের কথা শুনেই চেঁচিয়ে উঠে বল্লে, "ইউরেকা, ইউরেকা—আরে তোদের তো একটা কথা বল্‌তেই ভুলে গেছি! কাল যখন দিলোয়ারা থেকে ফিরে আসি, তখন দেখ্‌লুম, একটী মেয়ে ঠিক অমনি একটী জায়গায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখ্‌ছিল। চুলগুলি তার সে কি কালো! আমায় দেখে মেয়েটী হঠাৎ বল্লে, 'সাহেব, তুমি কি হিন্দুস্তানের লড়াইর ফৌজ?' আরবী তো আর রবির মতো জানি নে, তাই একটু ঘাব্‌ড়েই গেলুম। মেয়েটী আমার উত্তর পেয়ে জিজ্ঞেস করলে যে, পাঞ্জাব মুলুকের মীর হবিবকে আমি চিনি কি না। তোরা চিনিস্? ও নামের কাউকে তো চিনি নে! ভাব্‌লুম, হয় তো হবিব সাহেব ৬০ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের হবেন। বল্লুম, তা'কে চিনি নে। মেয়েটী বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমায় সেলাম করে চলে গেল। হবিব নিশ্চয়ই ওর স্বামী। এটী নিশ্চয়ই তোদের সেই মেয়েটী—আচ্ছা, চোখ্ দুটো কি তার খুব ডাগর? হাত দুটী একেবারে খালি—নয়?" অপূর্ব্ব উৎসুক ভাবে বল্লে, "সত্যি, তাই—সেই মেয়েটীই বটে।" আমার দিকে ফিরে বল্লে, "কি বলিস্ রবি, অম্‌নি চেহারা নয়?"

আমি যদিও রোশেনাকে সব চেয়ে বেশী চিনি, তবু চুপ করে রইলুম। আমার বুকের ভেতর কি যেন একটা খোঁচা দিয়ে উঠ্‌ল। সরলা একটী মেয়ের কাছে নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়িয়ে তার হয় তো বিশ্বাসের উপর দাবী করেছি। হয় তো কোন অজানিত বিপদে পড়ে মেয়েটী সকাল-সন্ধ্যায়

আমার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। জীবনে কোন দিন কারুর স্নেহ পাইনি। মাঠে মাঠে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, ছোট-বেলা থেকেই কারুর একটী আদরের ডাক, স্নেহের স্পর্শ পাই নি। দেশের রম্য উৎসবানন্দের আবেষ্টন ছেড়ে যখন বিদেশের অগ্নিলীলার মাঝে ঝাঁপ দিলুম—তখন হয় তো একটী লোকও আমার কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নি, কেউ একটী মুখের কথা দিয়েও খোঁজ করে নি। এ কোন্ অজানা তরুণী তা'র স্নেহস্পর্শে আমায় টেনে নিতে চাইছে? বিধাতার সৃষ্টির বেদনা যাকে স্নেহহীন করে সৃষ্টি করেছে, এ ক্ষুদ্র প্রেমের সিংহাসনে সে বস্‌বে কোন্ সম্বল নিয়ে? ভাব্‌লুম, আজ বিকেলেই যাব সেখানে। কিন্তু রোশেনার কথা এ বিলাসী যুবকদের মধ্যে যে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, সেটা থেকে নিজেকে গোপন রাখ্‌তে হবে। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, যে মুহূর্ত্তে এ তরল-বুদ্ধি বিলাসীদের কাছে প্রকাশ হবে যে রোশেনা আমার পরিচিত, সেই মুহূর্ত্তেই জ্যাক্‌সন সাহেব জান্‌তে পারবেন;—তার পরিণাম ভাব্‌তেই আমি শিউরে উঠ্‌লুম।

পরদিন ভোর বেলা প্যারেডের পরেই একটু জ্বর জ্বর অনুভব কর্‌ছিলাম। কিন্তু শরীর অসুস্থ হ'লেও যেন রোশেনার কথা ভুল্‌তে পারছিলুম না। বুঝ্‌লাম্, নীড়হীন মুক্ত পাখী আজ স্নেহের খাঁচায় বদ্ধ হ'তে চলেছে। বেরিয়ে পড়্‌লুম—তখন বেলা আট্‌টা। ঝিকিমিকি দিয়ে রোদের চোখ-ঝল্‌সান আলো প্রভাতের শিশির-ভেজা ধূলোকে প্রাণ-বান্ করে তুল্‌ছিল।

কুটীরের পাশে এসে দাঁড়াতেই মনে হলো, বিধাতার কোন অভিশাপের রুদ্রলীলা যেন এ ক্ষুদ্র কুটীরের শান্তি হরণ করে নিয়ে গেছে। আঙ্গুর-গাছের আঙ্গুর-গুচ্ছ পেকে পেকে মাটিতে ঝরে পড়েছে, পাকা দাড়িম-ফলগুলো ফেটে গেছে—তাদের রাঙ্গা রাঙ্গা দানাগুলি রসে টপ্‌টপে হয়ে আছে। উট্‌টা যেন কত দিন খেতে না পেয়ে স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ। আমি গলাটা ঝেঁকে রোশেনার নাম করে ডাক দিলুম, কোন উত্তর পেলুম না। হাতের ছড়িটা রেখে আমি একটু ভেবে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। প্রদীপ্ত প্রায়াহ্নের রশ্মিরেখাও গৃহাভ্যন্তরের আঁধার দূর করতে পারে নি। ক্ষুদ্র গৃহাভ্যন্তর যেন দারিদ্র্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সে দারিদ্র্যের বিলাসশূন্য উপকরণের মাঝেও যেন কোন শান্তিময় কল্যাণ-শ্রীহস্তের চিহ্ন সব জায়গায় দীপ্যমান। মাটী দিয়ে তক্তপোষের মত উঁচু করা হয়েছে—তার উপর মলিন শয্যা। দেয়ালে একটা বহু পুরান তরবারী ও বড় একটা ভোজালী। আমি শঙ্কাকুল চিত্তে এ প্রাণহীন গৃহশয্যা দেখ্‌ছিলুম, ঘরের কোণ দিয়ে রোদের একটু ঝিকিমিকি আভা গৃহকোণের অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যকে স্ফুটতর করে তুলছিল। হঠাৎ দেখ্‌লাম, শয্যার এক প্রান্তে এলায়িত পল্লবের মতো রোশেনা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার বিস্রস্ত বসনাঞ্চল ভেদ করে অঙ্গের দীপ্ত আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। একরাশ কেশগুচ্ছ সে সুকুমার নগ্ন কণ্ঠকে ঢেকে শয্যাপ্রান্তে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তার অঙ্গ-সুষমা যেন এ কঠোর অযত্নে আরও বেড়ে উঠেছে। কোন্ সৃষ্টিকরের যাদুমন্ত্রের অমোঘ বলে যেন এ মূর্ত্তিমতী কুসুম প্রাণবতী হ'য়ে মরুপ্রান্তরে ফুটে উঠেছে। ডাক্‌লুম, "রোশেনা!"—রোশেনা হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌ল। এলায়িত কেশপাশ তার মুখ ঘিরে যেন কৌতুকহাস্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সে ত্রস্তগতিতে উঠে আমার হাঁটু জড়িয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। বিস্ময়ে আমি যেন স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম। মাটির উঁচু বেদীটার উপর বসে আমি তাকে বুকে তুলে নিলুম। পৃথিবীর শ্যামল বুকের উপর যেদিন থেকে বাসা বেঁধেছি, সেই দিন থেকে যে অবলম্বন পাই নি, আপনার বলে কাউকে পাইনি, বিদ্রোহীর মতো, উচ্ছৃঙ্খলের মতো তাণ্ডব হাস্যে সবভাঙ্গা বীরের মতো ঘূরে ঘূরে বেড়িয়েছি—আজ যেন আমার বুকের কাছে কোন যুগযুগের আপনার জন পেলুম। জীবনের এ নৃত্যদোদুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আজ যেন ক্লান্তিহারা, শ্রান্তিহারা কোন অমৃতময়ীর কোমলস্পর্শে আমার অন্তর-তলের শুষ্ক হৃদয়টী প্রাণরসে তাজা হ'য়ে উঠ্‌ল। বহুদিন পরে আমার রিক্ত, সবুজ চিত্ত কোন্ মায়াবিনীর মধুস্পর্শে সব পেয়েছির দেশে এসে উপস্থিত হ'ল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রোশেনা বল্লে যে, তা'র মা নেই। এ পৃথিবীতে তার অবলম্বন আর কেউ নেই। এ মরুভূমির উষ্ণ প্রান্তরে, এ তরুণী সাহারার বুকে ওয়েশিসের মতো পৃথিবীর নির্ম্মম উষ্ণতায় জ্বলে পুড়ে মর্‌বে। সে বল্লে—কেমন করে সে আমার কত খোঁজ করেছে। যেদিন সে কূয়ো থেকে জল তুল্‌ছিল, সেই দিনই তো তা'র মার অসুখ আরো বেড়ে ওঠে। আমজাদ্ এসে বলে যে, এ-যাত্রা আর মা বাঁচবে না—তবে খোদার মর্জ্জী। তার পর তো সে আমায় কত খুঁজেছে; কই, মীর হবিবের কথা তো কেউ বল্‌তে পার্‌লে না। কেঁদে কেঁদে আমার বুকে মুখ রেখে রোশেনা বল্লে—কেমন করে সে এ দুনিয়ার জঞ্জালের ভেতর থাক্‌বে?

বাংলার রবি—আজ আরবের মীর হবিব। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। জীবনের এ যে এক স্বপ্নময় রঙ্গীন অধ্যায় মিথ্যার আবরণে আরম্ভ হ'ল—কোথায় শেষ হ'বে এর বিচিত্র পরীক্ষা। অতীত, ভবিষ্যতের সহস্র ছবি চোখের উপর দিয়ে ছায়াচিত্রের মতো ভেসে গেল। যতদূর চোখ যায়, ভবিষ্যৎকে একটু ভেবে নিতে চেষ্টা কর্‌লুম,—কিন্তু কই, মিথ্যার স্থান তো তা'তে নেই! মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে ঢাক্‌তে পারি, কিন্তু অপরিসীম সত্যকে তো মিথ্যার তন্তুজাল দিয়ে ঘিরে রাখ্‌তে পার্‌ব না। একবার ভাবলুম যে অসহায়া বালিকাকে বুঝিয়ে দি যে, আমি মুসলমান হবিব নই,—আমি বাংলা মুলুকের হিন্দু যুবক রবি মিত্র। বুকের মধ্যে যেন কিসের খোঁচা অনুভব কর্‌ছিলুম,—কে যেন বল্‌ছিল, নিজে হাতে যে স্বর্ণশৃঙ্খল বেঁধেছি—তা' কি নিষ্ঠুরতার ছুরিকাঘাতে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া যায়—তার চেয়ে যে মরণও ভাল। রোশেনাকে কিছু বল্লুম না, বাজে কথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ভেবে সে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌ছিল! স্থির কণ্ঠে ডাক্‌লুম, "রোশেনা!"—উদ্বেল অশ্রু গোপন করে সে তার স্নিগ্ধ চোখ দুটী আমার উপর স্থাপন কর্‌ল। বল্লুম "রোশেনা, আমিই তো আছি—কি ভয়?" রোশেনা আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্লে, "সত্যি? আমার যে আর কেউ নেই। আমি কাউকে ছাড়া কেমন করে আমজাদ্, উমেদ্ এদের কবল থেকে মুক্তি পাব!" বুঝ্‌লাম—মাতৃহীন হ'য়ে কেন এর এত ভয়! "আমিও তো বড্ড একা, রোশেনা; এ দুনিয়ায় আমারও তো কেউ নেই—তোমায় আমিই নিলুম, নিত্যি এসে তোমায় দেখে যাব।"

"সে আর কদ্দিন, লড়াইর শেষে তো তোমারও যেতে হ'বে—"

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পলকে চোখের উপর আবার ভেসে উঠ্‌ল। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী পৃথিবী যেন চোখের উপর শত সৌন্দর্য্যে জ্যোতির্ম্ময়ী হ'য়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্তে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিলুম। রোশেনার কোমল হাত দুটী চেপে ধরে বল্লুম, "বেশ, তখনো আমি তোমারই থাক্‌ব।"

বিপদের অকূল সমুদ্রে যেন রোশেনা একটা অবলম্বন পেল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "সাচ্চা? মেরা দিল্—মেরা জান্—" আর কিছু সে বল্‌তে পারলে না, শুধু ধীর স্নেহে হাতের তামার আংটিটি আমার হাতে পরিয়ে দিল। তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে—আবার আস্‌ব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরের মুক্ত বাতাস আমার বন্ধন-গরিমায় আমায় অভ্যর্থনা করে নিলে। সে বাতাস ভেদ করে শুন্‌লাম্, "রবি মিত্র—চমৎকার!" হতাশ বিস্ময়ে দেখ্‌লুম—অদূরে—অপূর্ব্ব!

* * * * * *

প্রদোষ! এর পরের ইতিহাস তোমার কাছে কি লিখব ভাই? আমার জীবনের ঘটনা-বহুল ইতিহাসের রক্তরাঙ্গা পৃষ্ঠা উল্টাতে আমার নিজেরই যে ভয় হয়! আচ্ছা, ভগবানের সৃষ্ট জীব সবাই শুনেছি মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করতে চায়,—কেন বল্‌তে পার? আমার মনে হয় একবার অন্তর্যামীর পা' ধরে বলি, "প্রভু, এ মানব-জীবনের ক্রূর অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি দাও। পশুত্বও যে এর চেয়ে ঢের ভালো! ভগবান মানুষ যখন সৃষ্টি করেছেন, তাকে কেন মানুষই রাখ্‌লেন না, পশুত্বকেও কেন মানবতার সজ্জায় পৃথিবীর বুকের উপর ছেড়ে দিলেন? পৃথিবীর কলহাস্যময়ী সৌন্দর্য্য-সুষমার ভেতর তো পশুর স্থান নেই, ভগবানের সৃষ্টির সেটা যে হ'বে বিরাট অসামঞ্জস্য। সেদিন ক্যাম্পে ফিরে যে অবস্থায় পড়্‌লুম, তার ইতিহাস তোমায় দিতেও শিউরে উঠি। অপূর্ব্ব তার বন্ধুত্বের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে একটা নূতন ইতিহাস তৈরি কর্‌লে। মানুষের চাপা হাসির লাঞ্ছনায়, কদর্য্য ইঙ্গিতের আঘাতে যেন আর স্থির থাক্‌তে পারছিলুম না! যে দায়িত্বের গুরুভার বিদ্রোহী মাথাটা আপনার উপর চাপিয়ে নিলে, তার ভারেই যে আমি অস্থির! এ আঘাত আমি সইব কেমন করে? যাক্—সে দিনই খুব গুরুতর জ্বরে বিছানায় পড়লুম। একমাস চেতনা অচেতনার মাঝে জীবনের দোলা দুলছিল—কিন্তু সে শিথিল বন্ধন ছিঁড়ে ভেঙ্গে পড়েনি। বেঁচেই

মরার প্রতীক্ষায় রইলুম। রোগের দুরন্ত আক্রমণের মাঝে যখন চেতনা নেই, তখন সে অচেতন ঘোরে মনে হো'ত যেন বোর্খা-ঢাকা একখানা শুভ্র কুন্দফুলের মতো মুখ আকুল আগ্রহে আমার মুখের উপর ঝুঁকে বসে থাকৃত। তার হাতের স্পর্শে মনে হোত—যেন এক রাশ শিউলীর বোঝা। কিন্তু জ্ঞান হ'তেই দেখ্তুম—মাটীতে পড়ে আছি, রাগ্‌টা জড়ান, খাকী সার্ট গায়ে। এক মাস রোগ-ভোগের পর disabled হ'য়ে ফৌজ ছেড়ে চ'লে এলুম। জ্যাকসন সাহেব বিদায়ের বেলা গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, "মিটার, তুমি আমার বিশ্বাসের অমর্য্যদা করেছ, তুমি মিলিটারীর অনুপযুক্ত—কারণ সেটা নারীর প্রেম নয়! All right, good boy." এমন করে আমার কর্ম্মজীবনের যবনিকা-পাত হ'ল। আমার চলে আসার পরদিনই আমাদের রেজিমেণ্ট মার্চ্চের হুকুম পেয়ে কূট্-এল-আমারায় রওনা হ'ল। রোশেনা ছাড়া আরবের মরুভূমিতে আমার চেনা আর কেউ রইল না। অতি কষ্টে নিজকে টেনে রোশেনাদের কুটীরের পাশে এসে পৌঁছুলাম। আকুল আগ্রহে রোশেনা আমায় বুকে টেনে নিলে। শত প্রশ্নে আমায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে, বল্লে, "আমি ভাব্‌লুম, তুমি বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলেই গেছ! ইঃ—কি চেহারা হয়েছে! বেমারীর কথা তো আমায় জানাও নি?"

"তোমায় কেমন করে জানাই বল তো? আমার কলিজার ভেতর ঢুক্‌তে পার, তা' বলে কি ফৌজের ক্যাম্পে ঢুক্‌তে পারবে?" সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "দ্যাখো, তোমাদের ফৌজের কয়টা দুষ্‌মণের অত্যাচারে এমনি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম!" তার মাথাটার উপর হাত দিয়ে কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম। সে করুণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "এ বেমারীতে কে তোমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে—আর তো তুমি যাবে না—"

"না রোশেনা, আর তোমায় ছেড়ে যাব না, এবার পাখীর নীড়েই যে বাসা বাঁধ্‌লুম।"

হাসি-কান্নায় তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

দুটী বছর আমি বেদুইনের মতো মরুর বুকে বাসা বাঁধলুম। সকাল সাঁঝে দুটী কোমল হাতের স্নেহের স্পর্শে আমায় মনে করে দিয়ে যায় যে, এ দুনিয়ার বুকে আমি একা নই! সে স্নেহের মধুর স্পর্শে আমার চিত্ত-শতদল যেন দলে দলে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু মনে শান্তি কই? ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই, যেন প্রাণটা কি একটা অজানা আবেগ-আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ত। এ দুর্নিবার মিথ্যার জাল শেষ করে দিতে চাইছিলুম; কিন্তু রোশেনাকে হারাবার ভয়ে পেছিয়ে গেলুম। এ ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যাহ্ন-গরিমায় যখন একটী অবলম্বন পেয়েছি—কেমন করে তার বন্ধন ছিঁড়ে আবার পৃথিবীর বিরাট বুকে একা এসে দাঁড়াই। এ দোদুল দোলায় মনটা ও শরীরটা যেন একই সাথে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এক-একবার বাংলা মায়ের স্নেহ-আহ্বান আমায় পাগল করে দিত, আর এক-একবার এ মরু-কুসুমের দুর্নিবার আলিঙ্গন আমায় বেঁধে ফেল্‌ত। এ মরু-প্রান্তরে জীবনের যা' কিছু সম্বল, তা প্রায় এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে—তাই নির্ম্মম ভবিষ্যৎটা আরও কঠোর হ'য়ে চোখের উপর ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এ দ্বন্দ্বদোলায় রোশেনার স্নেহ-রসই আমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌ছিল।

ঘুস্‌ঘুসে জ্বরটা যেন সে দিন বেড়ে উঠ্‌ল। রোশেনা আমার এ রোগ-ক্লান্তি দেখে যেন মুসড়ে গেল। বল্লে, "তোমার মতো লোকের কি আর ফৌজে যাওয়া পোষায়? দ্যাখো তো কেমন জের্‌বার হ'য়ে এসেছ?" সে আমার আঙ্গুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ কর্‌লে। খানিকক্ষণ পরে বল্লে, "আচ্ছা, উট্‌টা বেচে ফেলা যায় না? কি বল?"

চম্‌কে উঠে বল্লুম, "কেন? কি হয়েছে?"

রোশেনা চুপ করে মাথা নীচু করে রইল। আবার বল্লুম, "কি হয়েছে বল তো? উট্ বিক্রী কেন?"

"তুমি কেবলই ভুগ্‌ছ, দাওয়াই-পত্তরও নেই কিছু—তুমি কেমন করে বাঁচবে—"

"পাগল আর কি? একটু জ্বর, তা'তে কি ছেলেমীটাই আরম্ভ করেছ!"

ক্রমশঃই দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম—রোশেনা যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। আর তেমনি করে সাঁঝে-সকালে সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে না—সে কেমন যেন সংসারী হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় তাকে ডেকে পাই নে—কোথায় যেন সে যায়। সে পুলকময়ী প্রতিমা আর যেন সে নেই—এখন সে গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছে। চিন্তা ও পীড়াতে মনটা যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ছিল। তার পর এ সব দেখে আমার মাথা যেন

কেমন হ'য়ে গেল। নিজেই বুঝতে পার্‌লুম না—কেমন করে খিট্‌খিটে হয়ে গেছি। সে দিন ঘরের দাওয়ায় বসে আঙ্গুরের গুচ্ছ থেকে আঙ্গুর ছাড়াচ্ছিল্লাম, দেখ্‌লুম—রোশেনা আমার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। হঠাৎ সাম্‌নে এসে বল্লে, "বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে গেছ, এখন একটু শুয়ে পড় দিকিনি!" সত্যি ভাল লাগ্‌ছিল না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। রোশেনা একবার এসে আমায় দেখে গেল। মনে মনে কত কথা ভাবছিলুম, তার আদি-অন্ত নেই। হয় তো রোশেনা জান্‌তে পেরেছে যে, আমি ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতক—তা'র সর্ব্বনাশ করেছি! হয় তো বা এ মরুর দুলালী খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে যেতে চাইছে।

হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসলুম। ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখ্‌লুম—আমজাদ্‌কে রোশেনা যেন কি বল্‌চে—চোখ-মুখে তার একটা ব্যগ্র আশঙ্কার ভাব। হাতে তার সে পুরান তরবারিটা। আমার চোখের সামনে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা সৃষ্টির অতলে তলিয়ে গেল। বুকের রক্তধারা খর-প্রবাহে শিরা-উপশিরা ভেদ করে যেন রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ফুটে বেরুতে চাইছিল! চোখের উপর অতীত ভবিষ্যৎ যেন ঘুলিয়ে গেল। বুঝলাম্—রুগ্ন আমাকে স্নেহের ভান করে ঘরে পাঠিয়ে, বিশ্বাসঘাতিনী আজ আরব যুবকের কাছে প্রণয়-নিবেদন করছে। মরুর বুনো পাখী আর খাঁচায় থাকৃতে চাইছিল না সে—আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রদোষ! তার পর আমি যেন ভাই পাগল হয়ে গেলুম। আমার যা' কিছু সম্বল, সব যেন অতলে তলিয়ে গেছে—তবে আমি উন্মাদ হয়ে উঠ্‌লাম। জীবনের শুষ্ক কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে কে আমাকে আর এমনি ক'রে বুকে টেনে নেবে। কত অসহায় আমি! দুনিয়ার যা' ঘাটের কড়ি তা'ও যেন আমার হারিয়ে গেল—কি সম্বল নিয়ে এ জীবনের যাত্রা-পথে রইব আমি?

রোশেনা যেন আমার অবস্থা দেখে কেমন হ'য়ে গেল। কত আকুল প্রশ্নে আমার শরীরের অবস্থা জান্‌তে চাইত, কিন্তু সে প্রশ্নে মন যেন আমার বিষিয়ে উঠ্‌ত। নিষ্ফল রোষে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌তাম। রোশেনার পাণ্ডুর মুখের উপর কে যেন কালি লেপে দিত।

সে সন্ধ্যায় রোশেনা বাড়ী নেই। আমি হিংস্র রোষে যেন পাগল হ'য়ে গেলুম। রিভলভারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পায়ে চলার পথের উপর ধীরে ধীরে পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌লুম। সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝ দিয়ে তালগাছের মর্ম্মর ধ্বনি কাণে এসে পৌঁছুচ্ছিল। মনে আমার যেন আগুনের খেলা। চাইছিলুম আমি সব ভুল্‌তে, কিন্তু—পারি কই? বনের পাখী আজ আমার হৃৎপিণ্ড টেনে তুলে নিয়ে গেছে—আমি বাঁচব কি দিয়ে? ধীরে হেঁটে বাড়ী-মুখে ফির্‌ছি—স্তব্ধ মরুর বুকে সন্ধ্যার আঁধার জমাট হয়ে আছে।

বাড়ীর কোণের ডালিম গাছটার কাছে এসেই থম্‌কে দাঁড়ালুম,—দেখ্‌লুম, মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমজাদ ও রোশেনা। আমজাদের হাত থেকে কি একটা জিনিষ যেন রোশেনা তু'লে নিলে। আমি পাগল হ'য়ে গেলুম! রুগ্ন, ক্লিষ্ট, চিন্তাদগ্ধ মাথার সবকটা শিরা যেন টন্ টন্ করে ছিঁড়ে গিয়ে মাথার ভিতর একটা তাণ্ডব উল্লাস আরম্ভ করেছে, চোখের তারাগুলো যেন আগুনের ফিন্‌কী হ'য়ে ছুটে বেরুতে চাচ্ছে। পার্‌লুম না আমি,—হাতের ভারী রিভলভার বের করলুম। কোন্ দানবের পিশাচলীলায় যেন এ ক্ষুদ্র মরু প্রান্তর কেঁপে উঠ্‌ল, সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকার যেন স্তব্ধ বিস্ময়ে গর্জ্জে উঠ্‌ল—ঘোড়ায় টিপ পড়ল ওঃ!! * * * * *

* * * * * *

প্রদোষ! আমারই রোগশান্তির জন্য বনের পাখিটী আমার তরবারী বিক্রী ক'রে আমজাদকে দিয়ে বাগ্‌দাদ থেকে ওষুধ আনিয়েছিল! সে দিন সন্ধ্যায় সে ওষুধটাই নিচ্ছিল সে। কেন জান? আমার এ দগ্ধ-জীবনটাকে আবার প্রাণরসে বাঁচিয়ে তুল্‌তে। আচ্ছা, প্রদোষ, হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলে কি বাঁচা যায়? কেন? আমি তো বেঁচেই আছি! * *

এখনো সাঁঝের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে—সে ছোট্ট কবরটীর উপর একটী আলো জ্বেলে দিয়ে বসে থাকি। ধূসর সন্ধ্যা আমার আশে পাশে জমাট হ'য়ে থাকে। বুক দিয়ে আমি কবরের ভেতর তা'র বুকের স্পন্দন অনুভব করি। লোকে জানে আমি পাগল সেপাই মীর হবিব—বাগ্‌দাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই; কিন্তু আমি জানি যে আমি বাংলারই প্রবাসী ছেলে—রবি মিত্র!

তোমার
রবি

একৃজামিনের পর

শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়

দুই মাস খুব কঠিন পরিশ্রম করে পড়া গেল। সারা দুটো বছর ধরে কি করেছি তারই হিসাব নিকাশ কর্‌তে হ'বে। মার্চ্চ একৃজামিন্ আরম্ভ হ'ল। দশদিনে শেষও হ'য়ে গেল। যতটা আশা করেছিলাম তা হ'ল না।

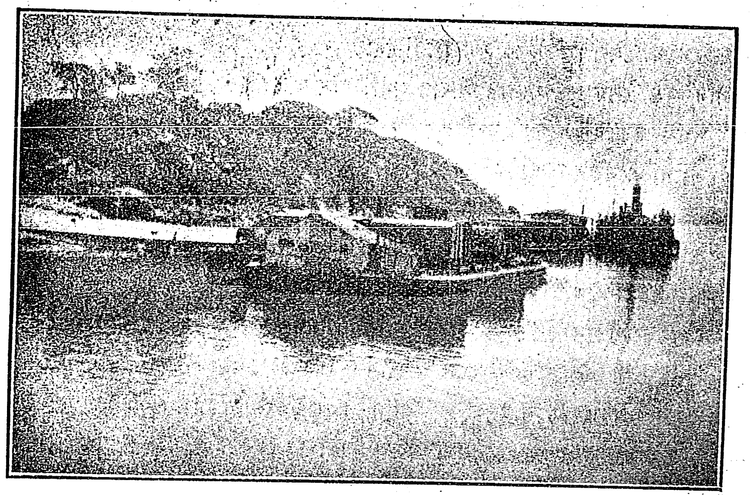

আমিন গাঁয় ষ্টীমার

এইবার বইগুলিকে আল্‌মারির মধ্যে ইন্‌টারণ ক'রে, কি করে সময়ের সংহার কর্‌তে হ'বে তারই উপায় চিন্তা করতে বসা গেল। শেষে ঠিক করলাম, কেবল খাওয়া, বেড়ান আর নিদ্রা। কিন্তু, ও সঙ্কল্প বেশী দিন টিক্‌লো না।

কলকাতায় গরম বেশ পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। খেয়ে, শুয়ে, বেড়িয়ে যেন দিন কাটতে চায় না। তখন একটা ঠাণ্ডা জায়গায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা সত্যি সত্যিই ভয়ানক। ম্যাট্রিকে এত বেগ পেতে হয় নি। ছোট ছোট বই বেশ সহজেই তৈরী হ'য়ে যেত। একে পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া, আবার তার মুখোমুখি দুই একজন আত্মীয়ের বি'য়ে হ'য়ে গে'ল। তা'তে যে'তে পারলাম না ব'লে অনেকে অনেক কথা শোনালেন। কেউ বল্‌লেন, "এবার প্রথম হ'তে হ'বে।" আবার কেউ বল্‌লেন, "স্কলার-সিপ্ না পে'লে দেখে নেবো।" মাথা হেঁট করে সব চুপ্ করে শুনে গেলাম। বোবার শত্রু নেই।

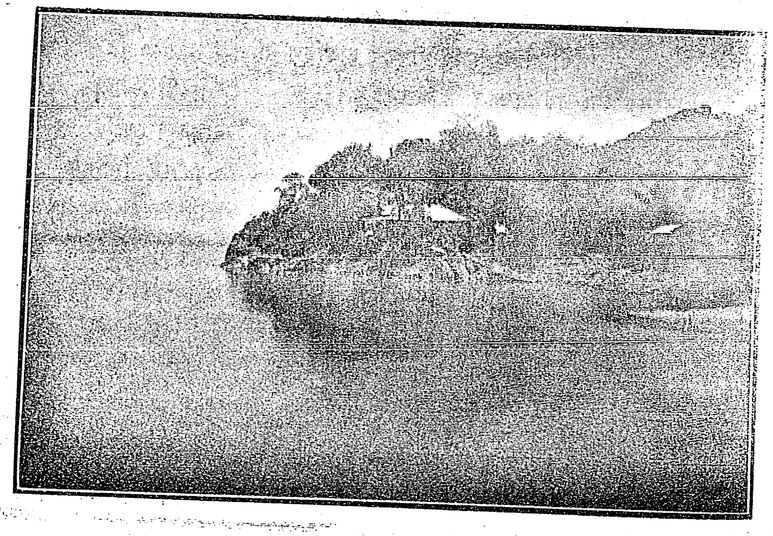

পাণ্ডুবাট।

বোবার পালাব এই ঠিক কর্‌লাম। সুযোগও যথেষ্ট ছিল। একজন আত্মীয় থাকেন দারজিলিংয়ে; আর একজন

থাকেন শিলংয়ে—দুইই বেশ ঠাণ্ডা স্থান, আর মনোরমও বটে। কোথায় যাই এই নিয়ে একটা সমস্যা বাধ্‌ল। শিলংয়ে গত বছর গিয়েছিলাম; সেইজন্য এবার দার্‌জিলিং যাবার বড় ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু, শেষে শিলং যাওয়াই স্থির হ'ল। ঠিক সেই সময় কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হ'ল। দাঙ্গা একমাস ধরে চল্‌ল। আমার যাওয়াও বন্ধ থাক্‌ল। কলিকাতায় ব'সে ব'সে কত কি যে দেখলাম্, কত গুলির আওয়াজ শুন্‌লাম, তার ঠিকানা রাখে কে? তার পর দাঙ্গা একটু থাম্‌লে, ১৩ই মে শিলংয়ে রওনা হলাম্।

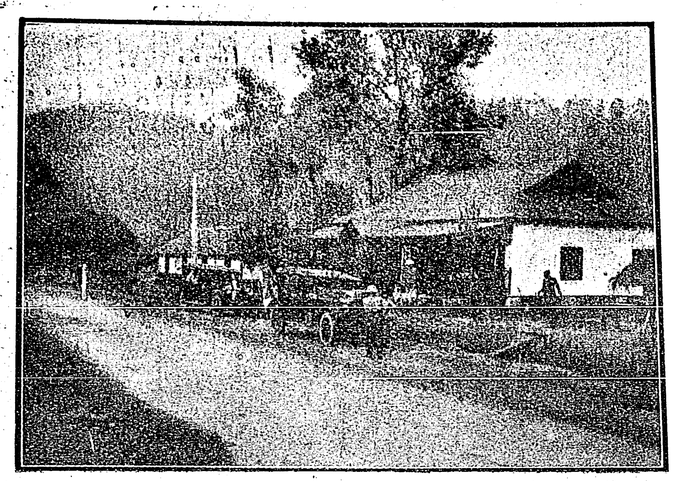

নংপো

কায়দায় রুমাল উড়িয়ে, ষ্টেসনে যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁ'দের কাছে বিদায় লইলাম।

গাড়ী হু হু শব্দে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। সঙ্গে একটা

"নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ তালে বাতাসের
শন্ শন্ শব্দ সুর দিচ্ছে"

শিলং মেল ৩-২৪ মিনিটে শিয়ালদহ ছাড়ে। তার আগেই গুরুজনদের প্রণাম করে ৩-১৫ মিনিটে শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাজির। একটা ট্রাঙ্ক, আর একটা বিছানা নিয়ে গাড়িতে চড়ে বস্‌লাম্। ঠিক সময় গাড়ী ছাড়্‌ল। বিলাতী

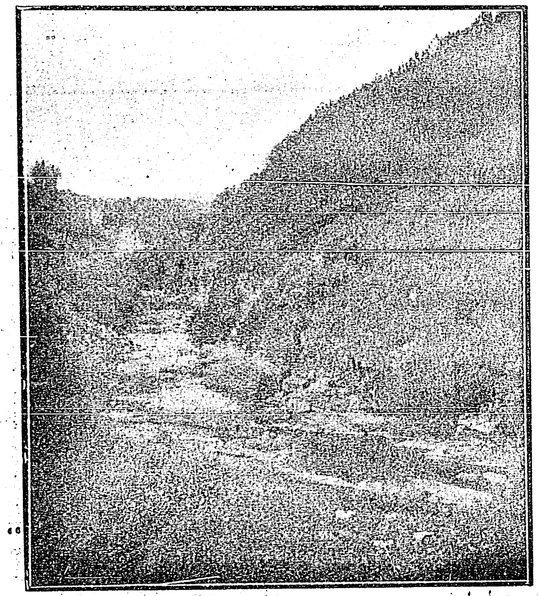

বৃষ্টির পর

বিলাতী মাসিক পত্র ছিল। তার দু'চারটে পাতা ওলটাবার পর আর পড়তে ইচ্ছে হোলো না। চারিদিকে যেন

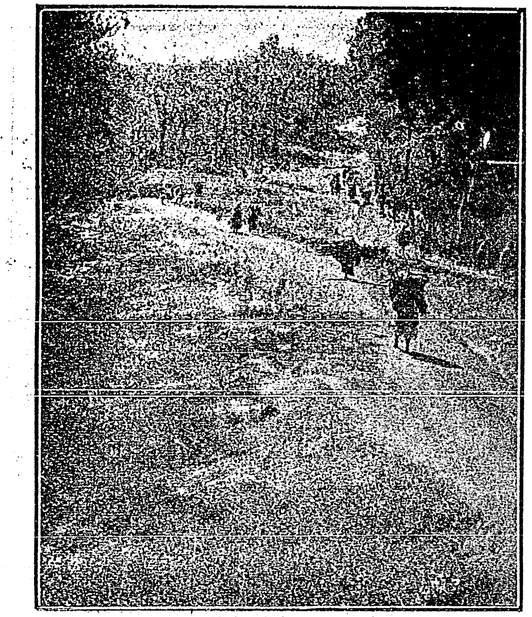

বাজারের দিনে

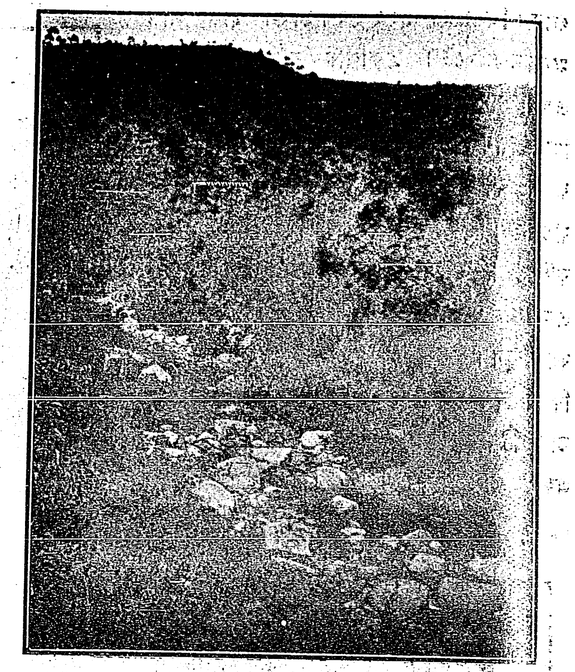

দুইধারে সবুজ ঢালু পাহাড়ের মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ

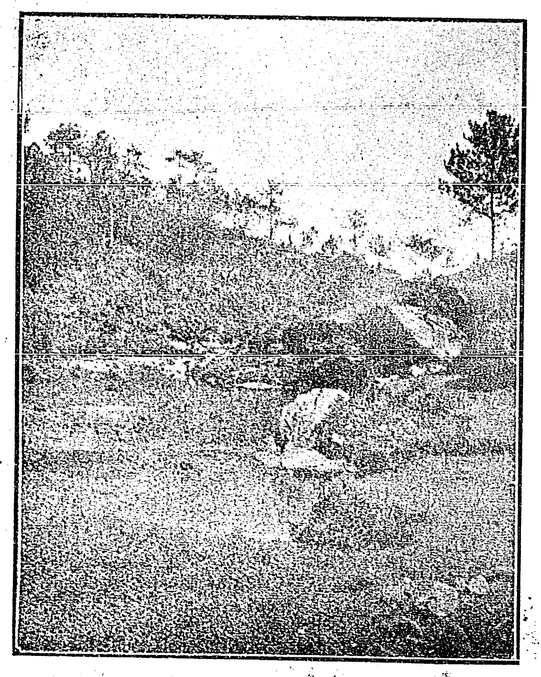

পাইনের মধ্যে

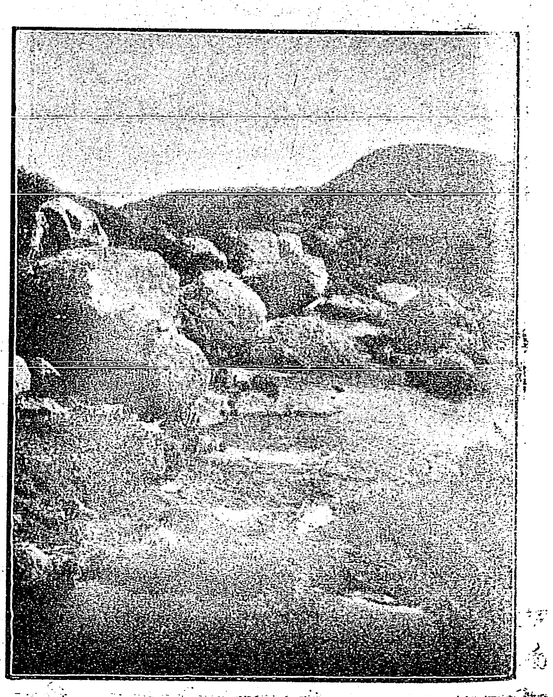

নদীর আর একটী দৃশ্য

অগ্নিবৃষ্টি হ'চ্ছে। যেন লু চল্‌ছে। গাড়ীর কাঁচ উঠিয়ে দিলাম।

প্রায় ৪টার সময় গাড়ী রাণাঘাটে এ'সে উপস্থিত।

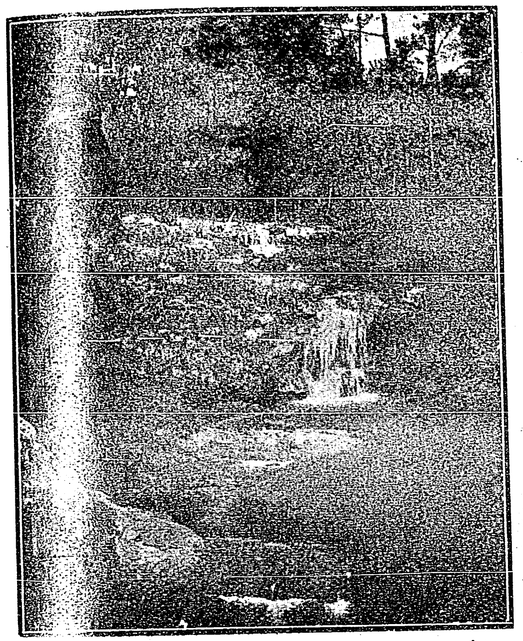

বাগানের মধ্যে—বৃষ্টির পর

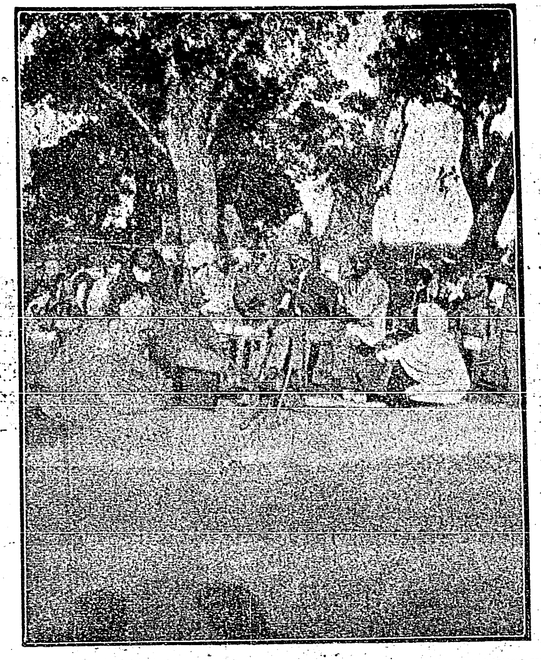

বাজারের দিনে—খামিয়াদের চায়ের দোকান

রাণাঘাটে দুই একটি ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছিল। একটু ঠাণ্ডা ব'লে বোধ হ'ল। রাণাঘাট ছাড়বার পর দুই এক পশলা বৃষ্টি পাওয়া গেল। ঠাণ্ডা হাওয়াও বইতে লাগ্‌ল। ধড়ে প্রাণ এ'ল। খোলা মাঠের পানে চেয়ে মনে অনেক কবিত্ব-ভাব জাগ্‌তে লাগ্‌ল। তখন সন্ধ্যার ছায়া আস্তে আস্তে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়্‌ছে। দিনান্তের ক্লান্ত রবি সুদূর প্রান্তরের পশ্চিম কোণ দিয়ে ডুবে যাচ্ছে। Now fades the glimmering landscape on the sght" —লাইনটা চট্ ক'রে মনে এ'ল। কৃষকরা গরুগুলিকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কত কথা মনে হোতে লাগ্‌লো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হ'য়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। চারিদিকে একটা এমন সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌ল, সে আর কি বল্‌ব। বহু দূরে একেবারে দিগন্তের

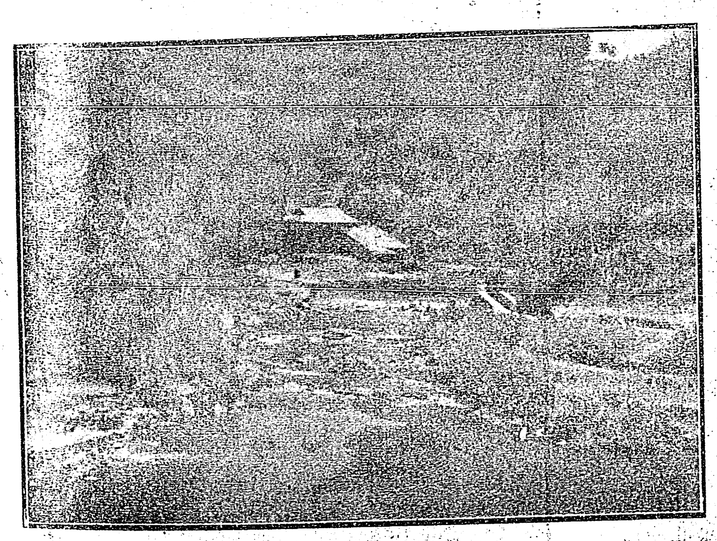

পথের ধারে—pineএর মধ্যে পরিত্যক্ত কুটীর; ডানদিকে Hydroelectricএর shwice gole.

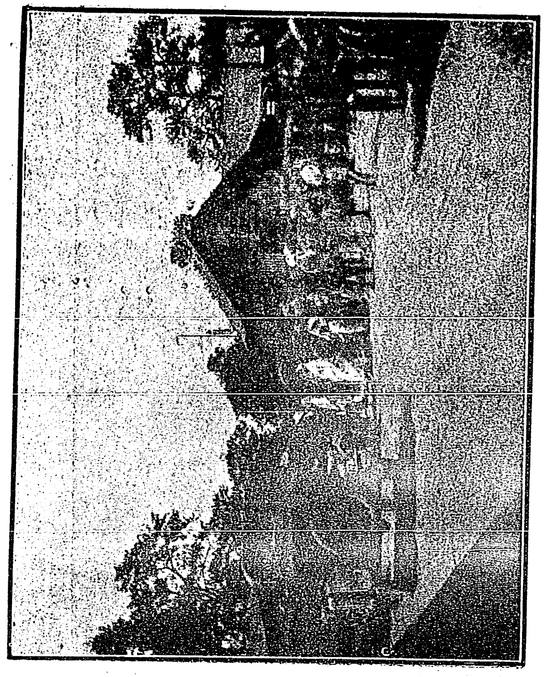

শিলং মোটর ষ্টেশন

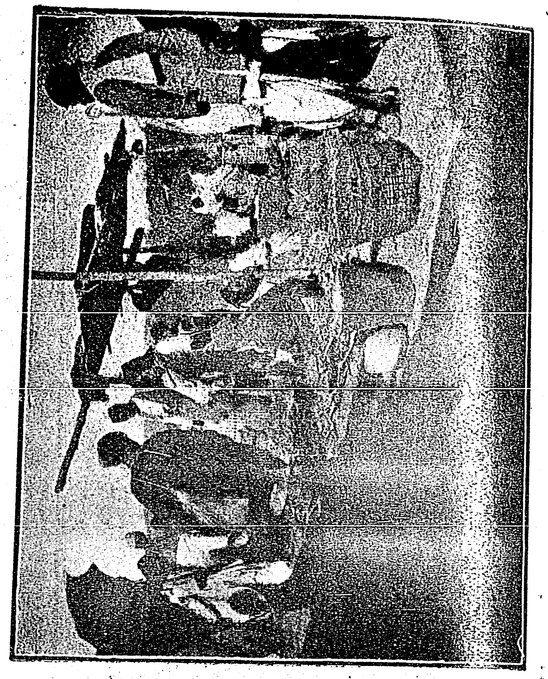

বাজার

কাউন্সিল হাউস্—Council House.

মোটর ষ্টেশন

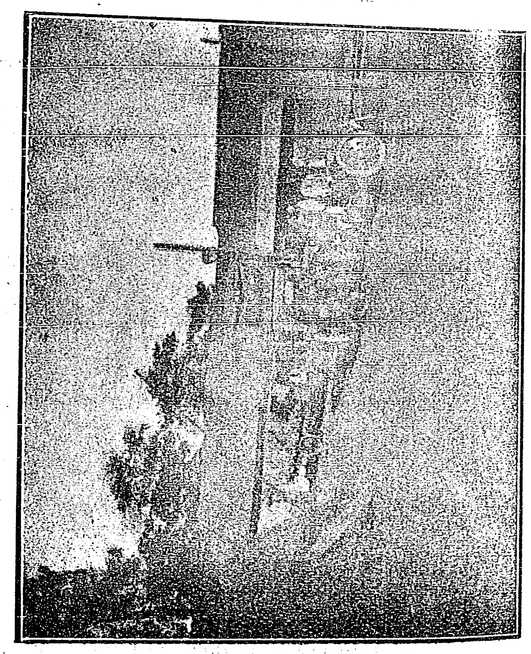

শেষ প্রান্তে গাছ পালার সারি দেখা যাচ্ছিল। "সেখানটা এখন মায়াময় হ'য়ে উঠ্‌ল। নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া

বাজারের পথে

হ'য়ে এ'লো, মনে হ'লো—ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ী, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙ্গা আঁচলটী শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়।

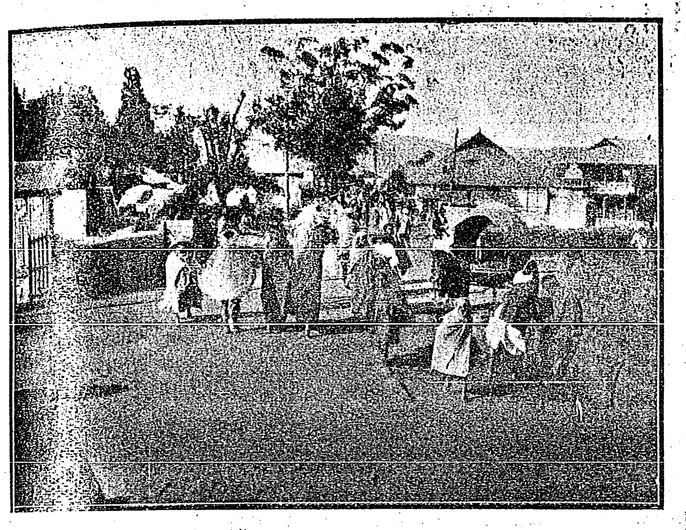

সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়, একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো।—"

গাড়ীও খুব জোরে চলেছে। সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন। দিনের আলো মিট্ মিট্ ক'রে তখনও পৃথিবীর পা'নে চেয়ে আছে; যেন মায়া কাটাতে পারছে না। এমন সময় গাড়ীটা সাড়ার হার্ডিং পুলের উপর উঠ্‌ল। নীচে পদ্মা। প্রকাণ্ড নদী। "কলকলস্বনে নবীন নীরদ-কান্তি নিন্দি নীল নীরে তরঙ্গ বিভঙ্গে নাচি সমীরণ সনে" বহিতেছে। নৌকাগুলি দলবদ্ধ হ'য়ে পারে নঙ্গর করে রয়েছে। দুই একটা এদিক সেদিক পাড়ি দিচ্ছে। মনে পড়্‌ল একদিন কবি প্রাণের আবেগে এই সময় গেয়েছিলেন —

কুটীর

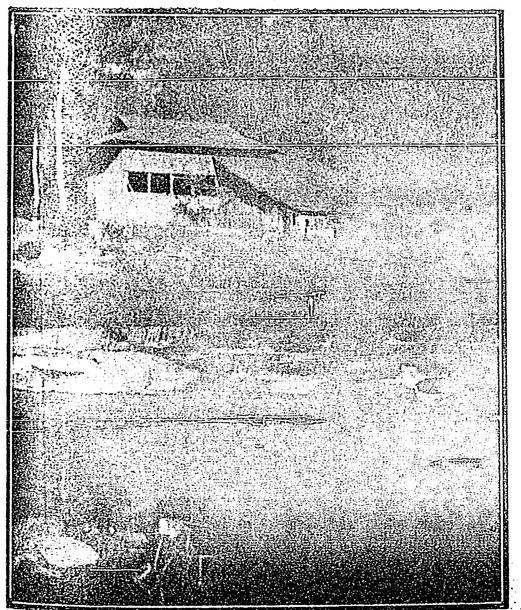

পথের ধারে

"সাজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হ'তে একটানা
একটী দুটী যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিন্‌ব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।

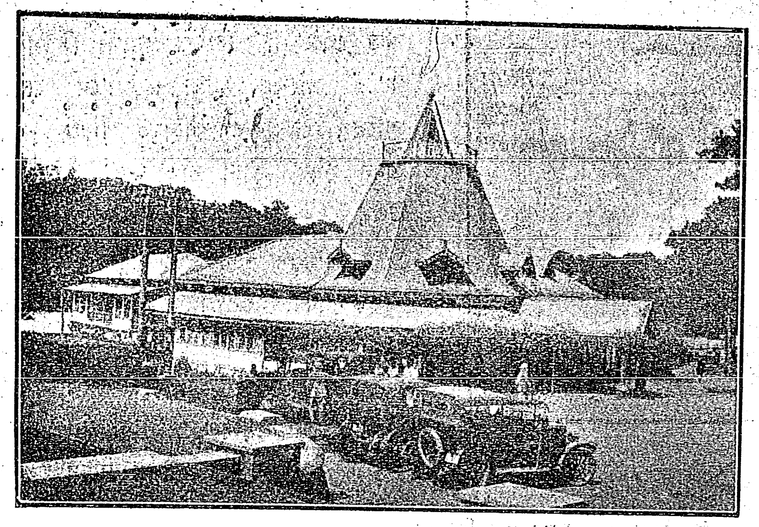

জামাতুল্লার প্রসিদ্ধ দোকান

* * * *

ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গাড়ী পুল পার হ'য়ে গেল। সময়ও আস্তে আস্তে কাট্‌তে লাগ্‌ল। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গাড়ী সান্তাহার ষ্টেশনে এ'সে দাঁড়ালো। এই স্থানে আমাদের গাড়ী বদল করতে হোলো। তাড়াতাড়ি কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামিয়ে প্ল্যাট-ফরমের অপর পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। এক দফা ওঠা-নামার পর্ব্ব শেষ হোলো। সেই দু-পহরে আহার হয়েছিল; আর এখন রাত নটা বেজে গেছে। সুতরাং ক্ষুধার আর অপরাধ কি? তাড়াতাড়ি কুলিকে পয়সা দিয়ে মুখ ধুলাম। তার পর জঠরাগ্নিকে ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়্‌লাম। একটু পরে গাড়ী ছাড়্‌লো। বেশ একটু ঠাণ্ডা বোধ হ'ল। তার পরই ঘুমে বিভোর।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি, ভোরের আলো গাড়ীর মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। একটু পরেই পূর্ব্ব দিকটা রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। বড় সুন্দর সে দৃশ্য। গাড়ী এসে গোলোকগঞ্জ ষ্টেশনে দাঁড়ালো। একটু পরেই গোলোকগঞ্জ ছাড়িয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুট্‌লো। শীতের চোটে গরম জামা আর মোজা চড়াতে হ'ল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ চল্‌ল; সেটা ছাড়িয়ে খানিকটা যাওয়ার পর কোথাও ছোট পাহাড় দেখা দিল। কোথাও নেড়া আর কেউ বা জঙ্গল-ভরা। দূরে উত্তরে মেঘের মত এক পর্ব্বত-শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল; সেটা বোধ হয় গিরিরাজ হিমালয়। সেই পর্ব্বতশ্রেণী অনেকক্ষণ দেখ্‌লাম; শেষে বেলা হ'য়ে গেল; আর দেখা গেল না। অনন্তের কোলে মিলিয়ে গেল।

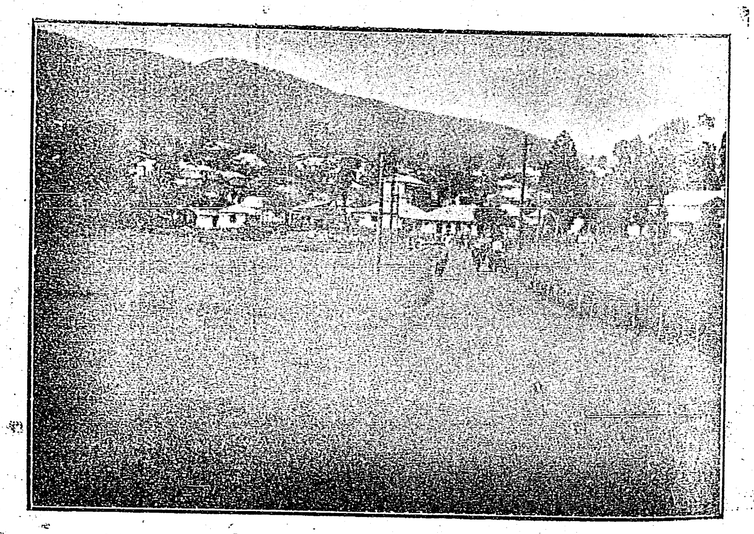

লাবাণের দৃশ্য

"পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।"

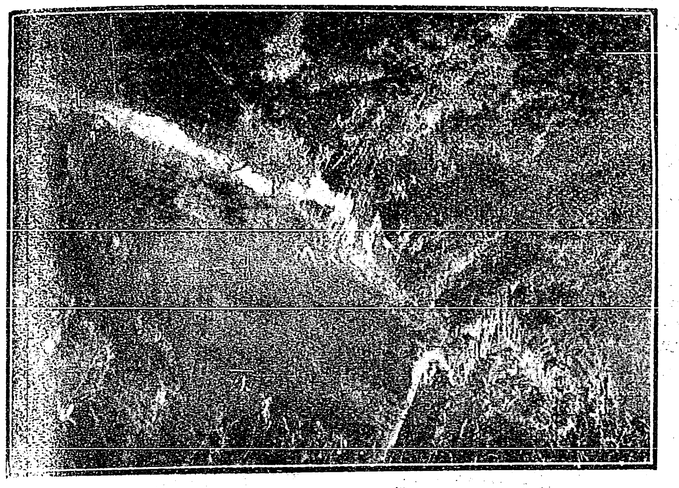

নদীর শেষ পরিণাম

সকাল আটটায় গাড়ী সরভোগে এসে থাম্‌ল। সেখানে একটা ছোট-হাজিরি করা গেল। কিন্তু হাজার হোক ব্রাহ্মণ মানুষ; ও সব বিলাতী ভোজে তৃপ্তিও হয় না, পেটও ভরে না।

গাড়ী ছাড়্‌ল। ক্রমে ক্রমে আমরা পাহাড়ের রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌লাম। পাহাড়গুলি বেশ কাছে কাছে, আর জঙ্গলে ভরা। না জানি তার মধ্যে কি না আছে। বেলা প্রায় বারটার সময় গাড়ী আমিগাঁতে এসে ঢুক্‌ল। এইখানে ই-বি-আরএর লাইন শেষ। সামনেই ব্রহ্মপুত্র। ও-পারে পাণ্ডু। এখানে একটা ফ্লাট আছে; সেইটা যাত্রীদের ও-পারে নিয়ে যায়। ইতিপূর্ব্বে দুই চারজন আত্মীয়ের সহিত এখানে দেখা হ'বার কথা ছিল ও একসঙ্গে শিলং যাব এই স্থির ছিল। তাঁদের সহিত ফ্লাটে দেখা হ'ল। এটা দোতলা। ওপোর থেকে প্রকৃতির দৃশ্য বড় সুন্দর। নদীটীর দুইদিকে পাহাড়। দূরে নদীর বাঁকে গোহাটীর ছোট ছোট বাড়ীগুলি বেশ দেখা যায়। ঊর্ব্বশী ঘাটের কতকটা পড়ে। গতবার ফিরবার পথে গৌহাটী ও ৺কামাখ্যা ধাম দেখে আসি। সে সময় এই ঊর্ব্বশীঘাট দেখি। ঘাটটী বড় সুন্দর। সেখানে একটা গোঁ গোঁ শব্দ সর্ব্বদা শোনা যায়। নদীর তলে পাহাড়ের গায় স্রোতের ধাক্কায় এই শব্দ উঠে। স্রোতও এইখানে ভয়ঙ্কর। নদীর মাঝে একটী ছোট দ্বীপ। দ্বীপের উপর ৺উমানন্দের মন্দির।

বেলা ২-৩০ মিনিটের একটু পরেই আমরা পাণ্ডুতে এলাম। এখান থেকে ৬৮ মাইল মোটরের পথ। পাণ্ডু থেকে শিলং যেতে হ'লে দুইটী উপায় আছে। এক হয় প্রথম শ্রেণীতে, না হয় মেল গাড়ীতে। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রত্যেকের ২৪৲ টাকা; অন্যটীর ভাড়া ১০৲ টাকা। 1st. class গুলি Wyllis Knight car। কোনটা 5 Seater, আর কোনটা 7 Seater। আমাদের জন্য একখানি গাড়ী পূর্ব্বেই রিজার্ভ ছিল। সঙ্গে দুই একটা ছোটখাট জিনিষ নিয়ে অন্যগুলি লগেজে দিয়ে গৌহাটীর দিকে রওনা হওয়া গেল। একটু পরেই মোটর-

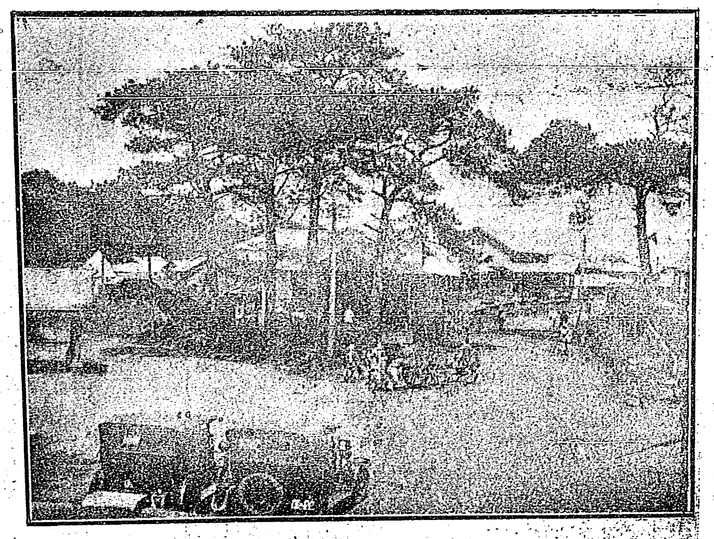

পুলিশ বাজার

আফিসে উপস্থিত হওয়া গেল। সেইখানে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। ম্যানেজারবাবু সব কাজ ফেলে

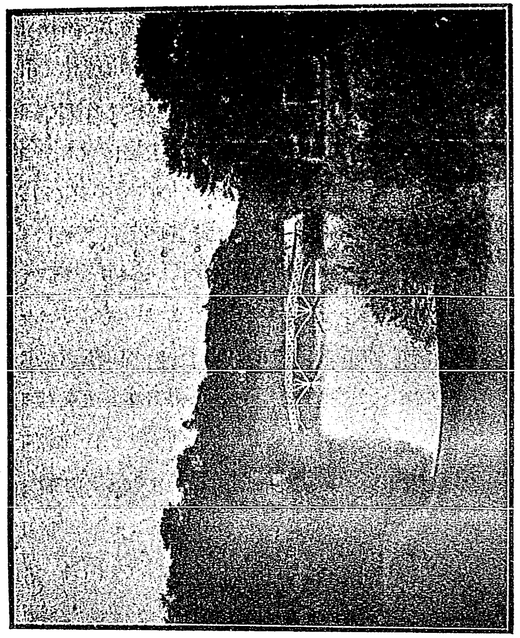

Ward's Lake—ওয়ার্ড লেক্-শিলং

পার্ব্বত্য নদী

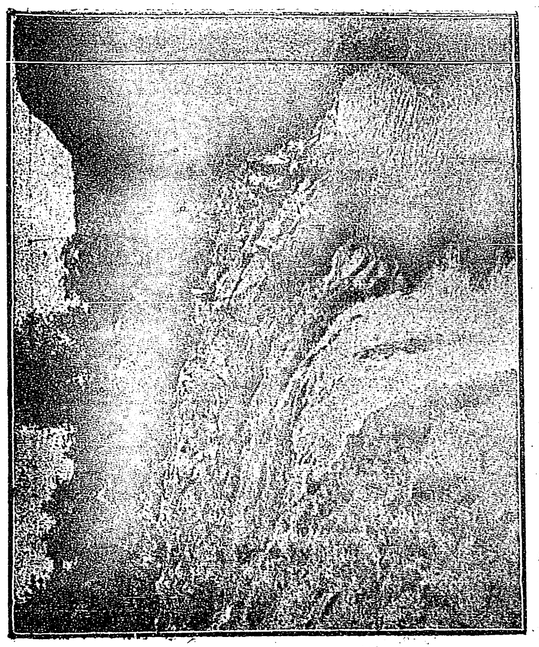

পাহাড়ের মাঝে

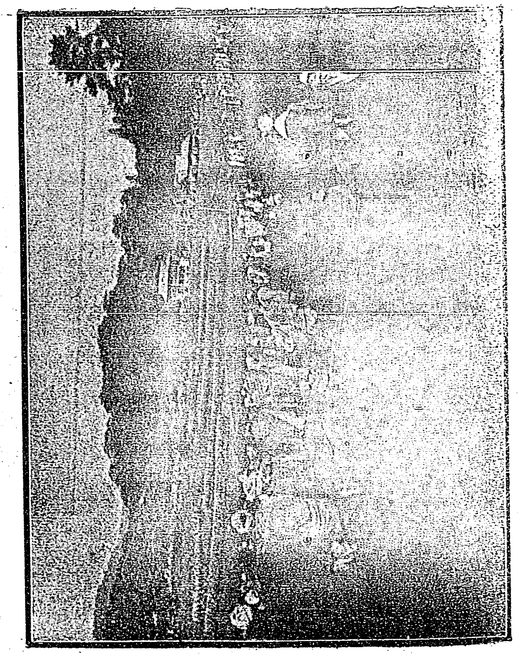

পাহাড়ের দৃশ্য—সমাটের জন্মদিন উপলক্ষে

আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌তে এত যত্নবান হ'লেন যে আমাদের বিশেষ লজ্জিত হ'তে হ'য়েছিল। আহারান্তে ম্যানেজারবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে শিলংয়ের দিকে চল্‌লাম।

টেলিগ্রাফ আফিস্

বেলা দেড়টা। মোটরের রাস্তাটা গৌহাটী থেকে একে বেঁকে সোজা ৭ মাইল গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। চারিদিকে খোলা মাঠ ধূ ধূ কর্‌ছে। ৺কামাখ্যা পাহাড়ের চূড়া থেকে রাস্তা বড় সুন্দর দেখায়—যেন একটা মাথার তেড়ি কাটা রয়েছে। ৭ মাইল এসে আমরা P. W. D. Time-keeper-এর কাছে উপস্থিত হ'লাম। একটু শীঘ্র এসেছিলাম বলে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল। শেষে সময় হ'ল। Time keeper বাবু একটা চালানে সহি দিলেন। গাড়ী ছাড়্‌ল।

এইবার আমরা ঠিক পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে আরম্ভ কর্‌লাম। রাস্তাটা আঁকাবাঁকা, আর চড়াইও বেশ আছে। এক একটা বাঁক ছাড়াই, আর খানিকটা করে উঠে যাই। কিন্তু রাস্তা খুব চমৎকার; আমাদের রেড রোডের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। চারিদিকে পাহাড়; সেই পাহাড় গভীর জঙ্গলে ঢাকা। আমাদের একটু আধটু শিকারের সখ আছে, তা বোধ হয় গাড়ীচালক জান্‌ত। এক জায়গায় একটু ব্রেক ক'সে সে বল্‌ল যে, সেইখানে কিছুদিন আগে গাড়ীর সাম্‌নে একটা বাঘ পড়েছিল। তার কথাটা মিথ্যা ব'লে ওড়ান যায় না। কারণ সে যে জঙ্গল, তাতে বাঘের চেয়ে আরও অনেক বড় বড় মহারাজের আড্ডা থাক্‌তে পারে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমরা বার্ণিহাটে এ'সে থাম্‌লাম্। এখানে আরও তিনটা গাড়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল। চালানে টাইমকিপারের সহি নিয়ে চালক মালা শিং গাড়ী ছাড়্‌ল।

জঙ্গল আরও ঘন হ'তে লাগ্‌ল। এক এক স্থান এমন যে সেখানে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ কর্‌তে পারে না। স্থানে স্থানে কুলিরা রাস্তা মেরামত কর্‌ছে। কেউ বা পাথর ভাঙ্গছে, কেউ বা পাহাড় ফাটিয়ে পাথর বাহির কর্‌ছে। রাস্তায় একটু গর্ত্ত হ'লেই তারা সেটা মেরামত করে। এই রকম যত্ন করা হ'য় বলেই রাস্তাটা আছে। শুনেছি না কি মোটর কোম্পানীকে প্রতি বৎসর এই রাস্তায় গাড়ী চালানোর জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা দিতে হ'য়। পল্লীগ্রামের জেলাবোর্ডের রাস্তা হ'লে শিলংয়ে যাওয়া এক ভয়ানক সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌ত।

প্রকৃতির কোলে—একটী জলপ্রপাতের দৃশ্য
Bishop's Fall

বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা Nongpohতে এ'লাম। Nongpoh শিলং ও গৌহাটীর একটা মাঝামাঝি জায়গা।

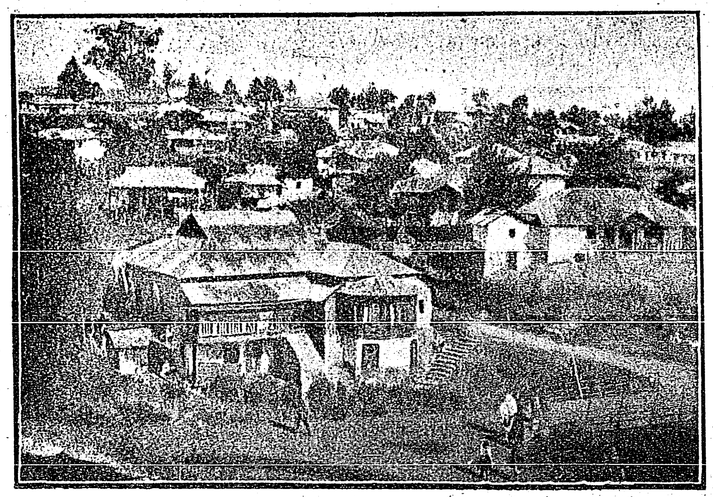

ঋষির পল্লী (সম্মুখে পুরাতন স্বাস্থ্য নিবাস)

এইখানে খানাপিনার ব্যবস্থা আছে। ডাক ও তার আফিসও নূতন খোলা হ'য়েছে। এখানে গাড়ী প্রায় ১৫।২০ মিনিট দাঁড়ায়। দুই একটা লেমোনেড খেয়ে একটু এদিক্-সেদিক্ বেড়ান গেল। একটু পরেই আবার গাড়ী ছাড়ল।

Nongpoh ছেড়ে খানিকটা যাওয়ার পর ইংরাজিতে যাকে বলে Zigzag Road—সেই রকম আঁকা-বাঁকা রাস্তা আরম্ভ হ'ল। মোড়ে মোড়ে লেখা "Caution Z"। চড়াইও আগেকার চেয়ে বেশী। রাস্তার এক দিকে পাহাড়, আর এক দিকে ১০০।১৫০ ফুট পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়েছে। নির্ঝরের ঝর্-ঝর্ তানে বাতাসের শন্ শন্ শব্দ সুর দিচ্ছে। তার মধ্যে এদিক-সেদিক থেকে দুই একটা পাখীর আওয়াজ এ'সে সে তাল কেটে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমাদের সারথি মালা শিং তাঁর গুরুগম্ভীর স্বরে সেই সুরে সুর মিলাচ্ছেন্। এর মধ্যে হঠাৎ একটা নূতন সুর কাণে গেল। ফিরে দেখি, আমার দাদা ভৈরবী আলাপ আরম্ভ করেছেন। শ্রীমান্ শৈ—ও আবার তাঁর সঙ্গে যোগ দিবার মতলব করছেন। নাঃ! আর থাকা গেল না। এ সময় চুপ করে থাকা নেহাৎ গণ্ডের চিহ্ন। আমিও আস্তে আস্তে মীরা-বাইয়ের "মেরে গিরিধর গোপাল, দুসরণ কোই" আরম্ভ করলাম্। দুই লাইন গাওয়ার পর সুর ভুল হ'য়ে গেল। অনেক মাথা নাড়া দিলাম; হাতে তাল্ দিলাম; সুর আর মনে এ'ল না। কিন্তু চুপ করে থাকা হ'বে না। গাড়ীতে সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী তখন পূর্ণমাত্রায় চলেছে। কি আবার আরম্ভ করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ বিজয়বাবুর দুই চরণ মনে পড়ে গেল। আমিও আরম্ভ করলাম—

"কি সুখে ডাকরে পাখী
দুপুরের রোদে,
থাম তুমি বাছা মোর
খেতে দিব বেঁধে।"

দুই লাইন গান—এক সুরে অনেক-ক্ষণ গাওয়া যায় না। সেইজন্য আমি সব সুরেই দুই একবার গাহিতে লাগলাম্।

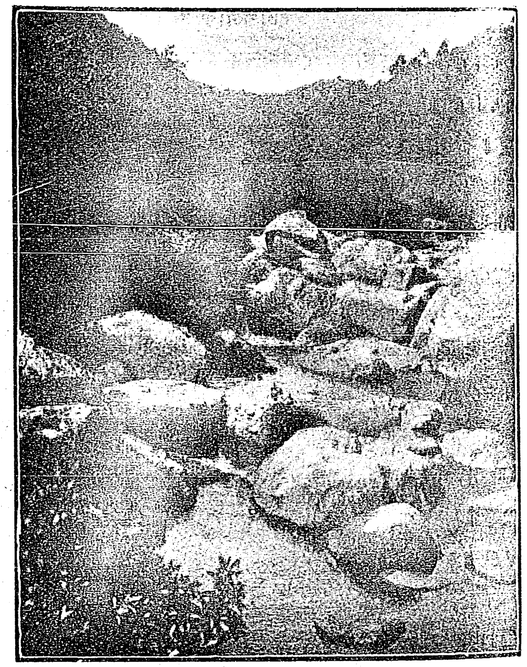

পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য

গাহিতে গাহিতে Umranএ এ'সে উপস্থিত। তখন বেলা প্রায় ৫টা। এখানে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। দৃশ্য দেখা দূরে থাকুক্ সকলের গান বন্ধ হ'য়ে গেল। একেবারে ঝমাঝম বৃষ্টি। হুড লাগিয়ে দিয়ে কোন রকমে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু যে রকম চট্‌পট্ ধ্বনি হচ্ছিল,

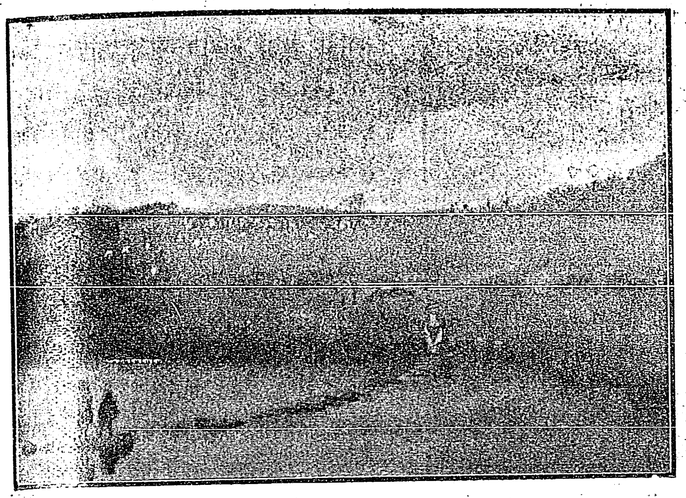

খাসিয়াদের ধনুর্বিদ্যায় প্রতিযোগিতা

তা'তে বড় ফুটো হ'য়ে যা'বার একটু আশঙ্কা হ'য়েছিল। প্রায় চার মাইল যাওয়ার পর বৃষ্টি থাম্ল। মালা শিং গাড়ী থামিয়ে পাশের পর্দ্দা খুলে দিল। চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রকৃতির ছবি বদ্‌লে গেছে। আর সে নিবিড় অরণ্য নাই। চারিদিকে তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়। কোনটার গায় মেঘ জড়িয়ে আছে; কাহারও বা মাথাটা মেঘে ঢাকা, আর সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে লাল রাস্তা চলেছে। পাহাড়-গুলির উপর বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। তাদের গা দিয়ে টিপ্ টিপ্ করে জল ঝরছে।

খানিকটা পরে আমরা বরপানি ব'লে একটা জায়গা আছে সেইখানে এ'লাম। এখানে মোটরের থামবার কথা নাই বটে, কিন্তু চালকরা দুই এক মিনিট এখানে দাঁড়ায়। বরপানি একটা দুধের আড়ত। এখান থেকে শিলংয়ে দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি যায়। মোটরের এর রাস্তা দিয়ে শিলংয়ে গেলে ৯ মাইলের পথ। কিন্তু ওদেশের লোকেরা পাহাড়ের উপর দিয়া অনেক পাকডাণ্ডী করে নেয়।

বরপানির ছোট সেতুটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নেড়া পাহাড়ের দেশ ছেড়ে পাইনের রাজত্বে ঢুক্লাম। এখন যেদিকে চাই সেইদিকেই পাইন। তখন বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। হাওয়াতে পাইনের শন্ শন্ গীত বেশ সুমধুর লাগ্ছিল।

"নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, আর তা'রই মাঝখানে একটী সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা,—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত পাহাড়ের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোম্টা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্ব্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তের কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্ছে।"

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর ছড়াতে লাগ্ল। পাহাড়গুলি কাল কাল হ'য়ে গেল। পশ্চিম দিকের উঁচু পাহাড়ের পিছন দিকটা রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্ল। গাড়ী শিলংয়ের 1St Carrierএ এ'সে দাঁড়াল।

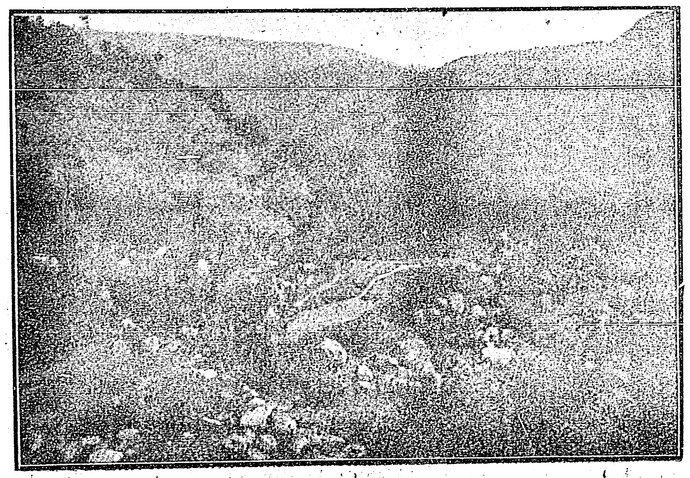

উপত্যকার মাঝে

টাইম-কিপার বাবুর সহি নিয়ে আমরা শিলংয়ের মধ্যে দিয়ে চল্লাম্। এক বছর কেটে গেছে, কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্লাম না। চারিদিক্ দেখ্তে লাগলাম,

আর পুরান স্মৃতি সব আমার মনে জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

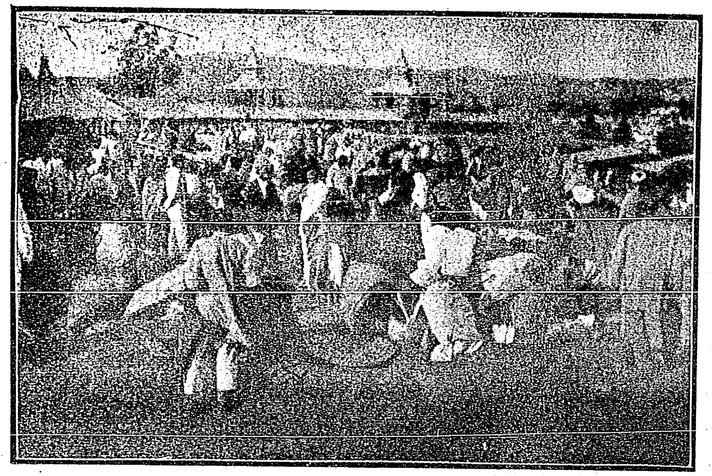

গোধূলি যায় যায়, রাত্রির তিমির পৃথিবীকে ঘুমে অচেতন করে করে, এমন সময় গাড়ী শিলং ষ্টেশনে এ'সে দাঁড়াল। অনেক দিনের পর আবার সকলের

বাজারের দৃশ্য

সঙ্গে দেখা হ'ল। মনের আহ্লাদে সকলে বাড়ী গেলাম।

শিলংয়ের দৃশ্যের বর্ণনা করে কথাটা শেষ করলেই ভাল হোতো; কিন্তু আমি কবি নই, সুতরাং কাব্যি করা আমার দ্বারা পুষিয়ে উঠ্‌বে না। এক্‌জামিনের পর হাত-পা ছড়িয়ে পাহাড়ের মধ্যে বিশ্রাম করতে এসেছিলাম; এখানে এসে তাই করছি। যাঁরা তবুও শিলংয়ের কিছু দেখ্‌তে চান, তাঁরা, এই লেখাটার সঙ্গে যে সব ছবি দিলাম, তাই দেখে শিলংয়ের পরিচয় নেবেন। তাতেও যাঁদের মন উঠ্‌বে না, তাঁরা একবার আলস্য ত্যাগ করে এই পূজার বন্ধে শিলং পাহাড়টা দেখেই আসুন না—এই ত কাছেই। আর এ উপলক্ষে যা ব্যয় হবে, শিলংয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তা যে পুষিয়ে যাবে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে ব'লে দিতে পারি।

দাক্ষিণাত্য

৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই

১৯১৫ অব্দের জুলাই মাসে যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি, তখন, ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির ইতিহাসোদ্ধারের তীব্র ও উৎকট বাসনা মনকে একটুও চঞ্চল হইতে দেয় নাই। তখন বহু দিনের গুপ্তবাসনা সার্থকতা লাভ করিবে এই চিন্তায় মন হর্ষগর্ব্বভরে প্রফুল্ল ছিল। শুদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ও ভারতের বিরাট জাতিকে দেখিব, এই বাসনা লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলাম; স্বর্ণখনি যে দেখিতে যাইব এ বাসনা ক্ষণেকের জন্য মনে স্থান পায় নাই। স্বর্ণের উপর আমি চিরকালই বিগততৃষ, বা স্বর্ণ আমার উপর চিরকালই বিমুখ। এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের দিনে এ কথা ব্যক্ত করা বিবেচকের কার্য্য নহে। কাঞ্চনের সহিত কামিনীর চিন্তাও মন হইতে দূরে পলাইয়াছিল; কেন না, যাত্রা করিবার সময় বা পূর্ব্বে সকলকে প্রণাম আলিঙ্গন করিয়া একজনের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। যাহা হউক, তজ্জন্য বিশেষ গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই। কেন না, শুনিয়াছি যে, আমি এক বিকৃত-রুচি-সম্পন্ন, নীরস, কবিত্বহীন, "ঢিট্‌কেল" মানুষ; সুতরাং আমাকে কিছু বলিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু কেহ যদি সে সময় আমার হৃদয় পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতেন যে, কবিত্বের একটা ঐকতানিক প্রবাহে

আমায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, কবি হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতাম,

"দক্ষিণ পবন
সেদিন জাগায়েছিল চঞ্চল পরশে
মোর কুঞ্জবন;
মুখরিত চারিদিক
গেয়ে উঠেছিল পিক,
নবীন মুকুল ঘিরি ছিল অনিবার
মধুপ ঝঙ্কার,
হে প্রিয় আমার।"

কবির প্রিয় কে তাহা জানি না; আমার প্রিয়ের পরিচয় জানিবার আবশ্যকতা নাই। সাধনা ভিন্ন শুদ্ধ পরিচয়ে কোন লাভ নাই!

যাহা হউক, দুই মাস কাল দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে ফিরিয়া আসিয়া শিব-সমুদ্রমের জলপ্রপাত ও বৈদ্যুতিক কারখানা দেখিয়া আসিলাম। সেখানে বন্ধুবর শিল্পী জী—বাবুর সহিত দেখা; তাঁহাকে লইয়া এবারে কোলারের স্বর্ণখনি দেখিতে যাত্রা করা গেল।

কোলারে যাইবার জন্য স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির রেজিষ্ট্রার (Registrar, Co-operative Credit Societies) তাঁহাদের ভক্ত মিঃ নারায়ণ আয়াঙ্গারকে জানাইলেন; আয়াঙ্গার মহাশয় চিঠি লিখিলেন ও তাঁহার যোগে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সে সময় সকলকে দেখিবার অনুমতি দিত না; এবং যাঁহাদিগকে দেখিবার আদেশ দেওয়া হইত, তাঁহাদিগের নিকট ৫ টাকা ফি লওয়া হইত। ইহা War-fundএ জমা হইত। এ কথা মন্দ নয়।

নারায়ণ আয়াঙ্গার মহাশয় মহীশূরস্থ মহাজনী যৌথ-কারবার-সমূহের রেজিষ্ট্রার। ইহার পূর্ব্বে ইনি যুবরাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ইনি ডেপুটি কমিশনার বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সমশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারী। ইঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। মানুষটা যেন মাংসপেশী দিয়েই তৈরী; sentiment বা শূন্যগর্ভ ভাবের বড় ধার ধারেন না; ইনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ভক্ত। ইঁহারই অনুগ্রহে আমাদের কোলারে যাইয়া খনি দর্শনান্তর বিশ্রাম ও আহার করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছিল; না বলিয়া আমাদের দু'জনের ফিও তিনি পূর্ব্বেই জমা দিয়াছিলেন। অবশ্য আমরা তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। অপরের জন্য এরূপ সুবিধা বড় কেহ করিয়া দেয় না। আমার সঙ্গে স্বামী অম্বিকানন্দেরও যাইবার কথা ছিল; তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি যাইলেন না। এদিকে বন্ধুবর নী-বাবুও যাইতে ইচ্ছুক। আমরা দু'জনে যাত্রা করিলাম।

কোলারে যাইতে হইলে মাদ্রাজের লাইনে বাউরিংপেট (Bouringpet) পর্য্যন্ত যাইয়া গাড়ি বদল করিতে হয়। সেখান হইতে খনির দিকে এক লাইন গিয়াছে; ইহা দৈর্ঘ্যে ১০মাইল। বাউরিংপেটে দেখি যে Co-operative Credit Societyর একজন ইন্‌স্‌পেক্টর আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। তিনি স্বামী অম্বিকানন্দকে না দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। এ দেশের লোকে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত সাধুদের বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করে। শুধু সচ্চরিত্রের জন্য ইঁহাদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না; ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয় না এমন লোক বিরল। ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় আমাদের প্রাতরাশের জন্য যথেষ্ট খারাবুঁদি, লাড্ডু, নান্‌খাটাইর মত বিস্কুট আনিয়াছেন। খারাবুঁদি বড় উপাদেয়; ইহা লবণা-স্বাদযুক্ত বোঁদের মত মিষ্টান্ন। ইনি ঘটপূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত করিয়া লইলেন। আমরা গাড়িতে আহার করিতে করিতে খনিস্থান বা Mining Districtএ আসিয়া পঁহুছিলাম। লাইনের দুই পার্শ্বে মাঝে মাঝে Hoisting Machine বা মানুষ বা ধাতু-প্রস্তরবাহী খাঁচা বা বাক্স উঠাইবার ও নামাইবার কল দেখা গেল। কুলিদিগের বাসস্থানগুলি কেমন শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে দেখা গেল; কিন্তু এগুলি দৈন্যের ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। খনিস্থ কর্ম্মচারীগুলির বাসস্থান, গির্জ্জাগৃহ, ঔষধালয় সমস্তই নয়নগোচর হইল। রেল লাইনের দুই পার্শ্বে উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ দেখা গেল। এগুলি হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বর্ণ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। এগুলি কেহ লইয়া যাইতে পারে না; লওয়া আইন-বিরুদ্ধ; কেন না, স্বর্ণখনির পরিচালকেরা আশা করিতেছেন যে, রসায়ন-শাস্ত্রের আরও উন্নতি হইলে, নূতন আবিষ্ক্রিয়ার সাহায্যে এই মৃত্তিকাস্তূপ হইতে

আহৃত স্বর্ণাবশেষ উদ্ধার করা যাইবে। বাস্তবিক এই প্রকার আশা-প্রণোদিত না হইলে বৈজ্ঞানিক বা ব্যবসায়ীর এক দণ্ড চলে না। পরবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে য়ুরোপীয়-ও য়ুরেশীয় বালক-বালিকারা আমাদের গাড়ি পূর্ণ করিয়া দিল। ইহারা Champion R-ef Stationএর বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছিল। আমাদের গাড়িটা যেন পাঁচ ফুলের সাজী; বালকবালিকাগুলির বেশ ভূষা ও গাত্র-বর্ণের মধ্যে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রতা বর্ত্তমান। তুষার-শুভ্র বর্ণ হইতে কৃষ্ণবর্ণের নানা শ্রেণীর বালক-বালিকা কেমন উচ্চ হাস্য ও গল্পে সমস্ত গাড়িটাকে মুখরিত করিয়া চলিতেছে; তাহাদের সঙ্গে তাহাদের কিশোরী ভগ্নীরাও বিদ্যালয়ে চলিতেছে। বোধ হইতেছিল যেন মেষযূথের সঙ্গে মেষপালক রহিয়াছে। বাস্তবিক বালকবালিকাগুলির স্মিতহাস্যে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই; তাহারা মেষের ন্যায়ই নিরীহ প্রকৃতি; কিন্তু ভারতবর্ষের কেমন জলবায়ুর দোষ যে, এই কিশোরীগুলির ভাবে, ভাষায়, ইঙ্গিতে ভবিষ্যৎ জীবনের বিদ্বেষ যেন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতেছিলাম—কেন এমন হয়! আমাদের পথপ্রদর্শক বন্ধুটি বালকদিগকে বিস্কুট খাইতে দিলেন। তাহারাও অম্লানচিত্তে ও বেশ আনন্দের সহিত সেগুলি নিঃশেষ করিয়া দিল। এরা আমাদের দেশের ছেলেদের মত লাজুক নহে, এবং প্রাণস্পন্দন মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আমাদের গন্তব্য ষ্টেসনটি লাইনের সর্ব্বশেষে। পঁহুছিয়া দেখি যে, ষ্টেসনে সহকারী খনিপরিদর্শক মহাশয় আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহার নাম মিষ্টার সূর্য্যনারায়ণ রাও। মানুষটি বেশ সাধাসিধে ও ভদ্র-স্বভাব। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদ খনিতে আমাদিগকে লইয়া চলিলেন। ইহার নাম মাইসোর মাইন্ (Mysore Mine)। এই বন্দোবস্ত হইল যে, প্রথমেই খাদের কার্য্য দেখিয়া আহারাদির পর স্বর্ণ নিষ্কাষণের প্রক্রিয়া দেখিতে যাইব। এক এক খনির মধ্যে অনেকগুলি খাদ বা shaft আছে। সর্ব্বোত্তম খাদ দিয়া নামিবার বন্দোবস্ত হইল; ইহার নাম এড্‌গারস্ সাফট্ (Edgar's shaft)। কিন্তু যখন শুনিলাম যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে নামিবার সময় এই খাদে এক সঙ্গে ৪২ জন লোকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল, তখন মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, এ কথা গোপন করিলে চলিবে না। এই খাদের গভীরতা প্রায় ৪,০০০ ফিট। আমরা সার্দ্ধ দ্বিসহস্র ফিট্ নিম্নে যাইব, এই স্থির হইল।

আমরা এঞ্জিন-ঘরের নিকটবর্ত্তী হইলে মিঃ সূর্য্যনারায়ণ রাও খাদের তত্ত্বাবধায়ক একজন য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়রের হস্তে আমাদের সঁপিয়া দিলেন। আমার মনে তখন Edgar shaftএর ভয় ছিল; সেই জন্য মিঃ রাওকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে যখন বলিতেছেন, চলুন, একসঙ্গে খাদের মধ্যে যাওয়া যাক্।" তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল যে, আমরা যে খাঁচায় নামিব, তাহাতে যেন অধিক লোককে অবতরণ করিতে না দেওয়া হয়। এঞ্জিনিয়ার সাহেব অতিশয় ভদ্র; বলিলেন, সেজন্য ভাবিবেন না। আমাদের ন্যায় দর্শক থাকিলে খাঁচা ধীরে ধীরে নামাইবার আদেশ আছে। তিনি এঞ্জিন-চালককে বলিয়া দিলেন, যেন অতিশয় বেগে এঞ্জিন চালান না হয়। এঞ্জিনিয়ার মহাশয় অল্প ও মৃদুভাষী এবং ধীর। তিনি আকৃতিতে শালপ্রাংশু, মহাভুজ; কিন্তু বৃষস্কন্ধ নহেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ঠিক শ্রমজীবী কুলীর ন্যায়; মস্তকে এক প্রকার বিচিত্র টুপী, হস্তে এক এসিটিলিন লণ্ঠন।

আমরা খাঁচায় উঠিলাম। ইহা দ্বিতল। প্রত্যেক তলে ২৫টি করিয়া লোক ধরে। মিঃ রাওকে লইয়া আমরা চারিজন লোক নামিলাম। এঞ্জিনিয়ার সাহেব অবতরণ করিবার পূর্ব্বে খাঁচার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দ্বারের বিপরীত ধারে দাঁড়াইতে বলিলেন। প্রথমে শরীর খুব শিহরিয়া উঠিল; পা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলে শিহরণের ভাবটা একটু অল্প বোধ হয়; তাহার পর আর সে ভাব রহিল না, বোধ হইল উপরে উঠিতেছি। জিজ্ঞাসা করিলে, এঞ্জিনিয়ার সাহেব বলিলেন যে, আমরা ১২।১৪ মাইল বেগে নামিতেছি। খাদের ধারি বা দেওয়াল ইষ্টকে নির্ম্মিত; আমাদিগকে দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল; কেন না আপেক্ষিক গতির জন্য আমরা যে অতিশয় বেগে অবতরণ করিতেছি, এরূপ মনে হইবে। আমরা প্রথমে দুই সহস্র ফিট নামিলে, এঞ্জিনিয়ার সাহেব খাঁচা থামাইয়া তাহার দ্বার খুলিলেন; আমরা সোজা পথে খনির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এ স্থলে খনি-খনন ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে ভাল হয়। খনি-খননের পূর্ব্বে স্থানটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, ব্যবসায়ে দাঁড়াইতে পারে এরূপ মূল্যের ধাতু-প্রস্তর বা Ore আছে কি না, এবং কত নীচে আছে ইত্যাদি। এই পরীক্ষার নাম prospecting। এই পরীক্ষায় ধাতু-প্রস্তরবাহী স্তর কোন্ দিকে, কিরূপ ভাবে প্রসারিত তাহার একটা নক্সা প্রস্তুত করা হয়। পরে খাদ খনন আরম্ভ করা হয়। ব্লাষ্টিং (blasting) বা বারুদ বা বিস্ফোরক দ্বারা পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া দেওয়া হইলে, প্রস্তরগুলিকে কাটিয়া বাহির করিতে হয়। কাটিতে কাটিতে, জল প্রায়ই উৎসাকারে বহিতে থাকে—দেখা যায়। কতদূর ও উচ্চ প্রদেশ হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাহিয়া আসিতে আসিতে থাল পাইলেই জল বাহির হইয়া পড়ে। সেইজন্য খনন করিবার সময় পাম্প্ (pump) ব্যবহার করিয়া জল তুলিয়া ফেলিতে হয়। পাছে খাদের পার্শ্বদেশ ধ্বসিয়া পড়ে, তজ্জন্য কাষ্ঠের তক্তা প্রভৃতি দ্বারা ইহার গাত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরিভাষা timbering; যাহারা এই কার্য্য করে তাহাদের নাম timber-men। তৎপরে কাষ্ঠগুলি আস্তে আস্তে সরাইয়া ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে brick lining বলে। দেওয়ালের গাত্রে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রাখা হয়; তথা হইতে ঝির ঝির করিয়া জল প্রবাহিত হয়। সঞ্চিত জল দ্বারা পাছে কোন স্থান ধ্বসিয়া যায়, বা আর কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, এই জন্য এই সব গর্ত্ত রাখিবার ব্যবস্থা। আমাদের সহযাত্রী এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, প্রত্যেক ফুট খাদ খনন করিতে ও ইষ্টকের ধারি বাঁধিতে খরচ ২০ পাউণ্ড বা ৩০০ টাকা; ইহা ১৯১৫ অব্দে। এখনকার খরচ ইহার অনেক অধিক। আমরা যে খাদটিতে অবতরণ করিয়াছিলাম তাহা ৪০০০ ফিট গভীর। সুতরাং একটা খাদ খননে কত টাকা যে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

খাদের ভিন্ন ভিন্ন তল হইতে ইহার সহিত সমকোণ করিয়া সমপৃষ্ঠ বা horizontal খাদ কাটা হয়; ইহাদের নাম cross cut। প্রত্যেক cross cutএর নম্বর আছে। ইহারা যেন খনির এক একটি তল বিশেষ। Edgar shaftএ ৫২টি তল আছে। ধরাপৃষ্ঠ বা উপর হইতে প্রত্যেক cross cutএর সহিত টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক cross cutএর মুখের কাছে এক একটি দ্বার আছে। দ্বারদেশের সম্মুখে খাঁচা থামিলেই দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন খাঁচা হইতে লোকজন প্রবেশ করে। Cross cut হইতে উপরে টেলিফোন করিলে খাঁচা উপরে উঠে বা নীচে নামে; একটুকুও ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক cross cutএ এক একজন কর্ম্মচারী আছেন; ইঁহারা উপর বা নীচের সহিত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এক একটি cross cut হইতে নানাদিকে সঙ্কীর্ণ পথ গিয়াছে; ইহাদের নাম গ্যালারি (gallery)। গ্যালারির উপর লাইন পাতা; ইহার উপর দিয়া মাল বোঝাই গাড়ি বা truckগুলি কুলীরা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

গ্যালারিগুলির ভিতর বেশ সোজা হইয়া হাঁটিয়া যাইতে পারা গেল। গিরিডির কয়লার খনি সন্দর্শন করিবার সময়, মনে আছে, আমাদের নীচু হইয়া যাইতে হইয়াছিল। গ্যালারিগুলিতে প্রায়শঃ বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত আছে। অনেক নূতন গ্যালারিতে আলোকের বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া এঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের হস্তে বর্ত্তিকা দিলেন। দেখিলাম, গ্যালারিগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। দুই তলের cross cutএর মধ্যে তির্য্যক ভাবে খাদ কাটা হয়। এই খাদগুলিতে মাল কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়; ইহারা গড়াইয়া গড়াইয়া নীচের লাইনে অবস্থিত ট্রাকে গিয়া পড়ে। ইহার আর একটি প্রয়োজনীয়তা আছে; খাঁচায় করিয়া এক cross cut হইতে অপর cross cutএ যাইতে সময় লাগে ও অন্যান্য কার্য্যের অসুবিধা হয়; এই জন্য কুলীরা এই সকল তির্য্যক পথে নীচেকার cross cut হইতে উপরকার cross cutএ যাতায়াত করে। ভিতরে উত্তাপের আধিক্য বলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম যে উত্তাপ বশতঃ কুলীদিগের পান করিবার জলে বরফ দেওয়া হয়। ভিতরের তাপ এত অধিক যে, জল ইহাতে বিশেষ শীতল হয় না।

খনির উপর ভূমি-পৃষ্ঠে রেলপাতা আছে। খাদের ভিতর হইতে ধাতু-প্রস্তর তোলা হইলে, ট্রাকে করিয়া সেগুলিকে যেখানে ভাঙ্গা হয় সেইখানে লইয়া যাওয়া যায়। প্রস্তরগুলিকে পেষণ-যন্ত্র বা crusher দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে

ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; তাহার পর সেগুলিকে একটি বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে খুব মিহিভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে প্রবাহিত জল দ্বারা এই প্রস্তর-ধূলিগুলি তির্য্যকভাবে অবস্থিত এক তাম্র-ফলকের উপর পতিত হয়। এই ফলকের উপর পারদের প্রলেপ থাকে। ইহার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত পিষ্ট প্রস্তর-ধূলি হইতে স্বর্ণ আকৃষ্ট হইয়া পারদের প্রলেপযুক্ত তাম্রফলকে আটকাইয়া যায়, এবং ধূলি-মিশ্রিত জল নীচে গিয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় সমস্ত স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয় না বলিয়া ধূলি-মিশ্রিত জল তাম্রফলক হইতে নীচে নামিয়া পড়িবার সময় একখণ্ড কম্বল, চর্ম্ম বা এই প্রকারের কোন বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হয়; ইহা দ্বারা অবশিষ্ট স্বর্ণের বৃহদংশগুলি কম্বলাদিতে আটকাইয়া যায়। শতকরা প্রায় ৭০ অংশ হইতে ৮০ অংশ স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয়; অবশিষ্ট ২০ হইতে ৩০ অংশ ধূলি-মিশ্রিত জলের সহিত প্রবাহিত হইয়া পয়ঃ-প্রণালী দিয়া প্রকাণ্ড জলাধারে পতিত হয়। অনেক-গুলি পরস্পর-সংযুক্ত জলাধার শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত। সর্ব্বপ্রথম জলাধারে বৃহৎ স্বর্ণকণা থিতাইয়া পড়ে। এই বৃহৎ কণাগুলির নাম tailings। পরবর্ত্তী জলাধারগুলিতে খুব মিহি স্বর্ণকণা-মিশ্রিত ধূলি বা কর্দ্দম থিতায়; ইহার নাম battery slimes; এগুলিরও tailings হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ বাহির করা হয়। কাষ্ঠের জলাধারের মধ্যে এক থাকে পাট বা নারিকেল দড়ির মাদুর বিস্তৃত করিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বোক্ত ধূলি বা কর্দ্দমযুক্ত জল তাহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়; জলাধারে পটাসিয়াম্ সায়ানাইড মিশ্রিত জল থাকে। জলাধারটিতে সায়ানাইড মিশ্রিত কর্দ্দম থিতাইলে জল বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং কর্দ্দম-গুলিকে আর এক পাত্রে লইয়া যাওয়া হয়। এই অবস্থায় পটাসিয়াম সায়ানাইড ও স্বর্ণে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার রাসায়নিক নাম Double cyanide of gold and potassium (Au K Cy)। ইহা হইতে দস্তার সাহায্যে স্বর্ণ নিষ্কাশিত করা হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতেও কিছু স্বর্ণ থাকে; সমস্ত স্বর্ণ বাহির করিতে পারা যায় না। এই অবশিষ্ট স্বর্ণ-মিশ্রিত ধূলির স্তূপ কোলারে আসিবার সময় লাইনের পার্শ্বে দেখিয়াছিলাম বলিয়াছি।

যখন আমরা স্বর্ণ নিষ্কাশিত করিবার ঘরে পৌঁছিলাম, তখন এত ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইতেছিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়। বাস্তবিক ভিতরে গিয়া দেখিলাম যে, যে-সব য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা এক একটি তাম্র-ফলকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা পাছে বধির হইয়া যান, এইজন্য কর্ণে তুলা দিয়াছেন ও কর্ণের চারিধার বাঁধা রহিয়াছে। এ ঘরে য়ুরোপীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। আমাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল; অনুমতি-পত্র পাইলে ভিতরে যাইতে পারা গেল।

স্বর্ণ নিষ্কাশন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; অতি সংক্ষেপে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বলা গেল। এক্ষণে কেহ যদি জানিতে চাহেন যে যথাক্রমে তাম্রফলকের সাহায্যে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কত স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয়, তাঁহার অবগতির জন্য মহীশূর ভূতত্ত্ব-বিষয়ক রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এ বিবরণটি ১৯১৪ অব্দের প্রথম ৬ মাসের। ঐ সময়ে ৫টী খনি হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ ও মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল—

	স্বর্ণের ওজন	স্বর্ণের মূল্য
যন্ত্র সংযোগে প্রাপ্ত	২,১৩,০৬৬ আউন্স	৯০৫৬৫৮ পাউণ্ড
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত	৩৭,৮৩৫ ঐ	১৬৫০৪৯ পাউণ্ড

স্বর্ণের ধাতুপ্রস্তর বা ore সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিব। স্বর্ণ সাধারণতঃ অবিমিশ্র অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহীশূরের ধাতু-প্রস্তরে pyrites বা গন্ধক-মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ বিশেষ বিরল। ইহা কোয়ার্টজ (quartz) প্রস্তর সহিত মিলিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রস্তরের মধ্যে স্বর্ণ চিক্‌চিক্ করিতেছে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

মহীশূর রাজ্যের খনিজ সম্পৎ যথেষ্ট; ইহার মধ্যে স্বর্ণই প্রধান। তন্নিম্নে অভ্র, মাঙ্গানিজ (Manganese), ম্যাগনে-সাইট (Magnesite), তাম্র, লৌহ, এস্‌বেস্টস্ (Asbestos), কারাণ্ডাম্ (Corundum), ক্রোম্‌ধাতুপ্রস্তর (Chrome Ore) উল্লেখযোগ্য। রাজসরকারও এই সকল খনিজ পদার্থের পরীক্ষা ও ব্যবসায় হিসাবে যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছেন, এবং অধিকতর উন্নতির চেষ্টায় আছেন। সম্প্রতি (২২শে অক্টোবর) মহীশূরে যে প্রতিনিধি-সভা (Representative Assembly) আহূত

হইয়াছিল, তাহাতে দেওয়ান বাহাদুর রাজ্যের খনিজ সম্পদের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহা দ্বারা যে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। মহীশূর গবর্ণ-মেণ্টের তত্ত্বাবধানে এখন ঢালাই করিবার লৌহও (Pig iron) প্রস্তুত হইতেছে।

মহীশূর প্রদেশ প্রকৃতই স্বর্ণপ্রসূ। নানা বিলাতী কোম্পানীরা খনি জমা লইয়া স্বর্ণ বাহির করিতেছেন। ১৯১৩ অব্দে যে স্বর্ণ বা স্বর্ণের ইষ্টক তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫২ সহস্র ৮৯৫ টাকা। রাজসরকার শতকরা প্রায় ৫ টাকা হারে খাজনা পাইয়াছেন; অর্থাৎ এই বৎসর তাঁহারা রাজস্ব হিসাবে পাইয়াছেন কেবলমাত্র ১৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই সকল কোম্পানী ১৮৮২ অব্দ হইতে ১৯১২ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৭ কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন এবং অংশীদারদিগকে ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন; লভ্যাংশের পরিমাণ ৪৭.৬; আর মহীশূর রাজসরকার—যাঁহারা এই সকল খনির মালিক—ত্রিশ বৎসরে এই সকল কোম্পানীর নিকট খাজনা বা সেলামী হিসাবে পাইয়াছেন প্রায় তিন কোটি টাকা। আমি অনেক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সরকার হইতে খনি চালান হয় না কেন। তাঁহারা বলিলেন, অত টাকা সরকারের নাই। কিন্তু মহীশূর রাজ্যের খনি-সংক্রান্ত ১৯১৩—১৪ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী বা Mining Report পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, পরীক্ষা বা Prospecting সংক্রান্ত জমা বাদ দিয়া যে ১০টি খনির কার্য্য চলিতেছিল, তাহাদের মূলধন সর্ব্বসাকল্যে ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, এবং এক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯১৩ অব্দে এই সকল খনিতে ৩ কোটি ২২লক্ষ টাকার স্বর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল। সমগ্র মূলধন অপেক্ষা এক বৎসরের আয় অধিক। মহীশূর রাজ্যের আয় পূর্ব্বোক্ত মূলধন অপেক্ষা অধিক হইলেও এবং রাজকোষে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলেও, এত টাকা একেবারে বাহির করা অসম্ভব। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সরকার অনায়াসে ৩ বা ৪টি খনি চালাইতে পারেন। এই প্রকারে অচিরেই সমস্ত খনিগুলি চালাইবার ক্ষমতা হইবে। মহীশূর-রাজ নিঃস্ব নহেন। কেন না, তাহা হইলে কাবেরী বাঁধিবার প্রস্তাবে হাত দিতেন না; ইহাতে ব্যয় হইয়াছে কোটি টাকার উপর। ইঁহারা আরও কত শত বড়-বড় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজ্যের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত এবং বিভাগীয় কর্ত্তারা এমন অভিজ্ঞ যে, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, এমন কি ব্রিটিশগবর্ণ-মেণ্টেরও যখন এই অবস্থা, তখনও মহীশূর-রাজ্যে গত বৎসর ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। দেওয়ান বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বর্ষারম্ভে তাঁহারা আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার সময় অনুমান করিয়াছিলেন, আয় অপেক্ষা ২২ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। তাহা না হইয়া সরকারী তহবিলে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আয় হইয়াছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, ব্যয় হইয়াছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

এই সকল কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খনি জমা করেন; আমার বোধ হয় এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পর জমার মেয়াদ বৃদ্ধি করা উচিত নয়। অবশ্য এ কথা বলা সহজ; কেন না, এই সকল কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা বিলাতের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; কোনও কোনও অবসর-প্রাপ্ত রেসিডেণ্টও কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া বিলাত হইতে খনি চালাইতেছেন। ইহাতে রাজসরকার বা দেওয়ান বাহাদুরের নিজের ইচ্ছা কতটা বলবতী হইবে, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আমার কিন্তু এসব দেখিয়া বিশেষ কষ্ট হইল। এইসব দেখিলে আমার সেই প্রসিদ্ধ গীতটির নিম্নলিখিত কথা মাত্র মনে পড়ে:—

সারা শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা, ভুষি শেষে।

ইহাতে আমাদেরই দোষ ষোল আনা; আমাদের ব্যবসায় বা বিষয়বুদ্ধি আদৌ নাই, নৈতিক বলেরও অভাব। যৌথ কারবারের বিষয় না জানিলে এ সব কথনই কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না।

পূর্ব্বে যে ১০টি খনির কথা * বলিলাম, তাহাদের মধ্যে একটি ভিন্ন সমস্তগুলিই বিলাতী। দেশী কোম্পানীর পরিচালিত খনিটির নাম Ahmed's Block। ইহার পরিচালক নিজামরাজ্যস্থ দুইজন মুসলমান। স্বত্ব লইয়া ইহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল বলিয়া সমস্ত কার্য্য স্থগিত দেখিলাম। কোম্পানীটি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে; ইতোমধ্যে খনিটিও জলে প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর

* আমি যে সময় অর্থাৎ ১৯১৫ অব্দে মহীশূর যাই, সেই সময়েই আমার মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য।

একটি খনির নাম বেটারায়স্বামি ব্লক্ বা Betarayaswamy Block। ইহার মালিক পল্ নাইট এবং রবার্ট নাইট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল কোম্পানীর মূলধন বিদেশ হইতে প্রাপ্ত, কর্ম্মকর্ত্তা বিদেশী; খনিগুলি যাঁহারা চালাইতেছেন সেই সকল এঞ্জিনিয়ারও য়ুরোপীয়। প্রস্‌পেক্টিং বা পরীক্ষা কার্য্যের জন্য ২।১ জন দেশী ভদ্রলোক জমা লইয়াছেন; ইঁহাদের একজনের নাম মিঃ ডি, শ্যামরাও।

কোলার হইতে কয়েক মাইল দূরে কাবেরী নদীতীরে শিবসমুদ্রম্ নামক গ্রাম হইতে কোলারের খনিসমূহের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্য রাজসরকার হইতে ফি বা মূল্য আদায় করা হয়, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা খনিগুলি জমা দেওয়ার চুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। শিবসমুদ্রমে কাবেরীর রুদ্ধ জলপ্রবাহ দ্বারা টারবাইন্ নামক "জলচক্র" যন্ত্র চালাইয়া ডাইনামো নামক তাড়িতশক্তি জননকারী যন্ত্রের দ্বারা বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন করা হয়। আমি যে সময় কোলারের খনি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম সে সময় তথায় ৮৩টি মোটর চলিত; ৭০টি দ্বারা আলোক উৎপাদন, যন্ত্রচালন প্রভৃতি কার্য্য এবং অবশিষ্ট ১৩টি দ্বারা খনির উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ইহার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হইত তাহার পরিমাণ ৫৩০৯ হর্স্ পাওয়ার বা অশ্ববল, এবং ইহার জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রীত হইত তাহার পরিমাণ ৪৯৫১৩১৯ মাত্রা বা বোর্ড অফ্ ট্রেড ইউনিট্। কাবেরী নদীর বাঁধ বা ড্যামের (Dam) কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই বলিয়া শিবসমুদ্রমে মার্চ্চ হইতে জুনমাসের মধ্যে যথেষ্ট জলপ্রবাহ পাওয়া যাইত না; এইজন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তড়িৎশক্তিও উৎপন্ন করা যাইত না। ১৯১৪ অব্দের এপ্রিল মাসে কোলার খনিতে শিবসমুদ্রম্ হইতে যে শক্তি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে দুই সহস্রের অধিক হর্স্ পাওয়ার (2000 H. P.) বল উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। কাবেরীর বাঁধ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিবসমুদ্রম্ হইতে প্রায় ৯,০০০ হর্স্ পাওয়ার উৎপাদনকারী বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া গিয়াছে। এখন ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি পাওয়া যায়; তাহার পরিমাণ আমি অবগত নহি।

রাজসরকার কোলার স্বর্ণখনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার জন্য মাত্রা বা unit প্রতি গড়ে ৬ পয়সা লইতেন; এখন বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প ফি লয়েন। কলিকাতায় এক্ষণে মাত্রা প্রতি ৪ আনা লওয়া হয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে—১৯১৫ অব্দে কলিকাতায় আলো ও পাখার জন্য মাত্রা বা unit প্রতি যথাক্রমে ৮ ও ৪ আনা লওয়া হইত। অবশ্য যথাসময়ে মূল্য দিলে উপরিকথিত হারের সিকি অংশ হ্রাস (rebate) করিয়া দেওয়া হইত।

এখানে বলিয়া রাখি যে ১৯১৫ অব্দে মহীশূরস্থ ব্যাঙ্গালোর নগরে বৈদ্যুতিক মাত্রার মূল্য দশ পয়সা ধার্য্য ছিল। উপরিলিখিত হারে গণনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মহীশূর রাজসরকার কোলার স্বর্ণখনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার জন্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকার অধিক আদায় করিয়াছেন।

আমি যে সময় কোলারে যাই সে সময় প্রায় ২৬ হাজার লোক খনি খনন, প্রস্তরোত্তোলন ইত্যাদি ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে ৫২৫ জন য়ুরোপীয়, ৩৩৬ জন এ দেশী ফিরিঙ্গী এবং অবশিষ্ট সমস্ত লোক এ দেশবাসী। এই ২৬ হাজার লোকের মধ্যে ১৫ হাজার লোক খনির মধ্যে কার্য্য করে, এবং অবশিষ্ট লোকেরা খনির উপরে বা Surface workএ নিযুক্ত। এতগুলি লোকের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন লোক প্রত্যেক বৎসর গুরুতরভাবে আহত হইয়া বিকলাঙ্গ হইয়া যায়; প্রায় ৫০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বার সহস্র লোকের মধ্যে ১০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। খনিতে পাথর কাটিবার সময় প্রস্তর পড়িয়া অনেকে আহত হয়। খনির মধ্যে অবরুদ্ধ বায়ুর আকস্মিক প্রসারণে প্রস্তর ভাঙ্গিয়া খননকারীদিগের উপর পতিত হয়; ইহাতে সময় সময় তাহারা যে শুদ্ধ আহত হয় এমন নহে, অনেক সময় প্রস্তরখণ্ডে প্রোথিত হইয়া অনেকে জীবন্ত সমাধি লাভ করে। বিস্ফোরক বা explosive ব্যবহার করিবার সময়ও এই প্রকার বহু দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯১৩ অব্দের মাঝামাঝি এড্‌গার্ স্যাফ্‌ট্ (Edgar Shaft) নামক খনিতে এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই খনিতেই আমরা নামিয়াছিলাম, সে কথা বলিয়াছি। দুর্ঘটনাটি কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাদে কি করিয়া নামা হয়, তাহার

কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। মনুষ্যবাহী বাক্স বা খাঁচার সহিত যে লোহার দড়ি বাঁধা থাকে, তাহা একটা ২০ ফিট্ ব্যাসযুক্ত কাটিম বা reelএ জড়ান থাকে। এঞ্জিনের সাফ্‌টের (Shaft) সহিত যুক্ত একটি লৌহচক্রের সহিত ক্লাচ্ (clutch) দ্বারা এই কাটিমটির সংযোগ আছে। ক্লাচের পিন্‌টি কোন অজ্ঞাত কারণে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কাটিমটি ইঞ্জিন সাফ্‌ট্ বা পূর্ব্বোক্ত লৌহচক্র হইতে বিচ্যুত হয়। এই ক্লাচের সাহায্যে কাটিমটাকে যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ইহার গতির হ্রাসবৃদ্ধি বা গতিরোধ করা যাইতে পারে। ক্লাচ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ব্রেক্ কসা সত্ত্বেও কাটিমটার গতিরোধ করিতে পারা যায় নাই। এই খাঁচাটি সবেগে নীচে পড়িয়া যায়। ইহাতে অনেকগুলি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২২টি লোক লইয়া একটি দ্বিতলযুক্ত খাঁচা বা বাক্স প্রায় ১০০ ফিট নামিবার পর ক্লাচের পিনটি ভাঙ্গিয়া যায়। এঞ্জিনচালক ব্রেক্ কসিতে থাকেন ও এঞ্জিন থামাইবার জন্য ইহার ষ্টিম্ আসা বন্ধ করিয়া দেন; তাহাতেও কাটিম থামাইতে পারা যায় নাই। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন খাঁচাটি মিনিটে ১২০০ ফিট বা ঘণ্টায় ১৪ মাইল বেগে নামিতেছিল। এত জোরে ব্রেক্ কসা হইয়াছিল যে, ঘর্ষণে ব্রেকের গাত্রস্থিত কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া এঞ্জিন ঘরটি ধূমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তথাপি কাটিমের গতিরোধ করিতে পারা যায় নাই। যে খাঁচাটি লোক লইয়া উপরে উঠিতেছিল, তাহার কাটিমটির গতিরোধ করিতে পারা গেল, কিন্তু যে কাটিম হইতে খাঁচাটি নামিতেছিল, তাহার গতিরোধ করিতে পারা গেল না। খাঁচাটি প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র ফিট যাইয়া সবেগে তলদেশে পতিত হইল ও মুহূর্ত্তের মধ্যে ৪২ জনেরই মৃত্যু হইল। এই ৪২ জনের মধ্যে ৬ জন ইটালি দেশবাসী, ২ জন দেশী ফিরিঙ্গি ও ৩৪ জন এদেশবাসী।

এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪ জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করেন; তাহার সভাপতি হইলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ওয়ালেস্ সাহেব। এই চারিজনের মধ্যে দেশী লোক ১ জন; ইনি মহীশূর রাজ্যের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অফ্ পোলিস। এই কমিটির রিপোর্ট আমি পাঠ করিয়াছি। কমিসন-কমিটিতে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, অর্থাৎ কোন কারণই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই; তবে ভবিষ্যতে যাহাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকে তাহার কতকগুলি উপায় নির্দ্ধারিত হইল। *

* এই প্রস্তাবের লেখক সোদরোপম স্নেহভাজন মনোমোহনের অকালে পরলোক গমনের জন্য প্রস্তাবটী অসম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশিত হইল; মনোমোহনের অভাব বড়ই অনুভূত হইল।—ভারতবর্ষ সম্পাদক

জীবনের নিত্য-স্রোতে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

কোনো উপায় ছিল না বলে পাঁচটী পয়সা খরচ ক'রে ট্রামে চড়তে হয়েছিল। হেঁটে-হেঁটে পায়ে ফোস্কা উঠেছিল। সেই কোথা কয়লাঘাট, আর কোথায় শ্যামবাজার, তার ওপর সারাদিন চীনেবাজারে টো টো ক'রে ঘোরা।

কিন্তু ট্রামে চড়েই ভাবতে হয়েছিল, এ পয়সা কটা কেমন করে উসুল করা যায়। যত রকমের কৃচ্ছ্রসাধন হ'তে পারে, নিজের সম্বন্ধে তার সবরকম ভেবেও কোনো উপায় দেখা গেল না। টিফিনের বালাই নেই, কোনোরকম নেশারও দাসত্ব করি না। প্রাণে কোনো সখের আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করি না, তবে কেমন করে এ অন্যায় খরচের দাবী মিটাবো?

মানুষের চিন্তা না কি স্বয়ং-ক্রিয়, তাই দেখি, সময়ের ফাঁক পেলেই আর বিশ্রাম নেই। যতক্ষণ ট্রামে বসে ছিলাম, ততক্ষণই যত রাজ্যের চিন্তা মনটাকে ছেয়ে ফেলেছিল।

ট্রাম থেকে নামতেই দেখা—রাখালবাবুর সঙ্গে। আমাদেরই আপিসের কেরাণী, আমারই সমান মাইনে পান। জিজ্ঞাসা কর্লেন—কি দাদা, ট্রামে যে!

বল্লুম—পায়ে ফোস্কা উঠেছে।

—ও, আমি বলি, কোথা থেকে আল-টপ্‌কা টাকা পেলে বুঝি। নইলে কেরাণীর প্রাণে সখ্। রাখালবাবু নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন—তাই নয় কি ভাই?

রাখালবাবুর কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম।

বাড়ী ফিরতেই প্রতিদিনকার মতো খোকা কলরব করে উঠল। সুশী তার কর্ম্মশ্রান্ত মুখশ্রীতে একটা হাসির আবরণ টেনে এসে দাঁড়াল।

খোকা আনন্দ করে একটা কিছুর প্রত্যাশায় হাত বাড়াল। কোনো দিন ত কিছু দিতে পারি না। তবুও প্রত্যহই পকেট হাত্‌ড়ে বলি—কিছু নেই। খোকা হাত ঘুরিয়ে বলে—নেই, নেই। আজও অভ্যাসমতো পকেটে হাত দিয়ে দেখি, ট্রামের টিকিটখানি,—খোকার হাতে দিলাম। খোকন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গাল ফুলিয়ে দেখতে লাগল—এটা খাবার কি না।

সুশী আমার আটপৌরে কাপড়খানি এগিয়ে দিতে গিয়ে ট্রামের টিকিট দেখে প্রশ্ন কর্‌লে—শরীরটা কি ভাল নেই? ট্রামে এলে যে?

কথাটায় একটু হাসি এল, যেন ট্রামে চড়া ব্যাপারটা একটা অসাধারণ কিছু। অবশ্য ব্যাপারটা অসাধারণ নয়, কিন্তু কেরাণীর পক্ষে বটে! এই নিয়ে দু'বার। রাখাল-বাবু আর সুশী, দুয়ের একই প্রশ্ন! যাক্। শুধু বললুম—পায়ে ফোস্কা পড়ল বলে ট্রামে এলাম।

সুশীর মুখের হাসি ফিরে এল। বললে—ট্রামের টিকিট দেখে আমার ত ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছল। ট্রামে এসেছ বেশ করেছ,—তবু যা হোক সকাল সকাল ঘরে ফিরেছ ত।

হেসে বললুম—একেই বলে শাপে বর। কিন্তু পাঁচটা পয়সা খরচ না করে ত হাতে করে জুতোটা নিয়ে আসতে পারতুম। এখন এই বাজে খরচের—

আমাকে বাধা দিয়ে সুশী বললে—ভারী কটা পয়সা খরচ করে ফেলেছ নিজের জন্যে, তার জন্যে তোমায় অত ভাবতে হবে না।—

সুশীর কটাক্ষের স্নেহ ও প্রেমের উৎস আমাকে সিক্ত করে দিল। কতখানি অন্তর দিয়ে সে আমার ব্যথা বোঝে।—

একটা আনন্দে আমার হৃদয় ভ'রে গেল। হেসে বললুম—যে কটা টাকা পাই, তার মধ্যে ত বাজে খরচের জন্যে কিছু থাকে না। কাজেই একটা বাড়্‌তি খরচ হয়ে গেলে, তার জন্যে একটু ভাবতে হয় বৈকি।

—তোমার জন্যে খরচটাকে বাড়্‌তি খরচ বোল না। ধর, যদি পাঁচ পয়সার খোকনের জন্যে অযুদই আনতে হত। বলতে নেই—খোকনটা আমার এত বড় হয়েছে, কিন্তু কোনো দিন এক্ পয়সার ডাক্তার-বদ্যি খরচ তার জন্যে হয়নি।—

এতখানি বলেই হঠাৎ সুশীর মনে পড়ল—আজ খোকার জন্ম-বার—তার উৎসাহ-উজ্জ্বল মুখখানি তখনই যেন ম্লান হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে খোকনকে তার বুকে টেনে মাতৃ-স্নেহাশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচে তাকে ঘিরে দিলে।

কিন্তু তবুও সে যেন তৃপ্ত হল না। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ছোঁয়াচে সে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম—ফোস্কাটা কিন্তু ছিঁড়ে গেছে।

সুশী একরকম জোর করে তার চিন্তাধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বললে—ছিঁড়ে গেছে? আর খুঁটো না, ঘা হয়ে যেতে পারে। আমি পরিষ্কার নেক্‌ড়ার ফালি এনে দিচ্ছি, বেঁধে রাখ।

পায়ে নেক্‌ড়ার ফালি বাঁধ্‌তে গিয়ে ফোস্কার অবস্থা দেখে সে বললে—এত বড় ফোস্কাটা ছিঁড়ে গেল! সমস্ত পা-টা কী রকম গরম হয়েছে!

তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—ও কিছু নয়!

সুশী তার উচ্ছ্বসিত বেদনাকে সংযত করে বললে—নিজের বেলায় সব তাতেই তোমার উড়িয়ে দেওয়া। এ আমার ভাল লাগে না। আমাদের—

সুশী প্রায় কেঁদে ফেলবার যোগাড় করেছিল। মনের সমস্ত রস ত একেবারে শুকিয়ে যায় নি। তাই সুশীকে টেনে নিয়ে বললুম—পাগ্‌লীর মতো এ আবার কি? এই বুড়ো বয়সে আর কি এ সবের দিন আছে?—কথাটা শেষ করে নিজের মনে নিজেই হেসে উঠলুম। বয়স যাই হোক, মনে যেন কেমন পাক ধরেছিল। তাই কোনো আবেগের তীব্রতা আর অনুভব কর্ত্তে পারি না।

সুশী তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নিল। তার পর কথার সুর ঘুরিয়ে বললে—আজ বুঝি বড্ড ঘুরেছো। ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে।—

ঘোরা, হাঁ ঘোরার ত কামাই কোনো দিন নেই, এর শেষও নেই,—এর মধ্যে ক্লান্ত হ'লে চলবে কেন? কথার সুরে নৈরাশ্যের বেদনা যেন আপনিই বেজে উঠল।

হ্যাঁ—তোমার যত সব—কী যে ছাইভস্ম বকো!—সুশীর কথাগুলো কত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কত স্নিগ্ধ!

সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্তিতে বললুম—খাবার হল কি?

ওমা—বলে নিজেই অপ্রতিভ হ'য়ে সুশী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তার পর আমাকে নিমিত্তের ভাগী করে বললে—এ কথাটা এতক্ষণ মনে করিয়ে দিতে নেই?

খোকাকে নিয়েই সুশী যাচ্ছিল। বললুম—খোকাকে দিয়ে যাও, নইলে কাজ করার অসুবিধে হবে যে।

না, না, এই সবে আপিস্ থেকে হা-ক্লান্ত হ'য়ে এলে। খোকাটা এখন খালি বিরক্ত কর্ব্বে। তুমি একটু ব'স। আমরা মায়ে-পোয়ে চট্ করে সব তৈরি করে আনছি।

খোকাকে নিয়েই সুশী চলে গেল।

পরের দিন, সকাল বেলা। ঘুম ভেঙেছিল, কিন্তু তখনও বিছানা ছেড়ে উঠি নি। এটুকু বিলাস এখনও বাকী ছিল।

সুশী বিছানা তুলতে এসেছিল; আমাকে তখনও শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—মশারীটা তুলে দিয়ে যাবো কি?

বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম—তখন প্রায় সাতটা বাজে।

তাড়াতাড়ি উঠে বললাম—বাজারের পয়সা দাও!

মশারী তুলতে তুলতে সুশী বললে—বাজারের পয়সা আমার আঁচলেই বাঁধা আছে। তুমি মুখ ধুয়ে এসো। হ্যাঁ, খোকার গাটা একবার দেখো ত, কেমন যেন ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ কর্চ্ছে মনে হল।

খোকা মাদুরে বসে খেলা কচ্ছিল। ছিন্ন ফ্রক্‌টা তুলে গায়ে হাত দিলাম। কিছু মনে হল না। বললাম—না, কই, গা ত' গরম মনে হচ্ছে না।

'তা হ'বে; আমি তখন জলের হাতে দেখেছিলুম। আমাকে এই ভাবে স্তোক দিয়েও সে নিজেই একবার খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে। একটা সংশয়ের ছায়া-পাতে, মনে হল, যেন তা'র মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। কিন্তু তখন ওদিকে নজর দেবার মতো সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেলাম।

সকালের বাকী সময়টুকু আর কিছু দেখবার অবসর থাকে না। কোনো রকমে সেদিনের বাজার সেরে, নাকে-মুখে দুটী অন্ন গুঁজে আপিসে যেতে হয়। কিন্তু আমার এই অনবসর সময়টুকুর মধ্যেও একটী জিনিষ আমার চোখ এড়াল না।

রান্নাঘরে চড়া আঁচে কড়ার ওপর কি একটা ভাজা হচ্ছিল। খোকা সেই রান্নাঘরের কোণে একটা ছেঁড়া মাদুরে বসে কুট্‌নোর খোসা নিয়ে খেলা কচ্ছিল। হঠাৎ কি কারণে খোকা কেঁদে উঠল। সুশী তাড়াতাড়ি কড়া নামিয়ে খোকাকে শান্ত করতে ছুটে এল। খোকা একবার তার মাকে জড়িয়ে ধরল।

'কী হয়েছে খোকন আমার! ছিঃ, এখন কাঁদতে নেই' বলে কুট্‌নোর থালা থেকে এক টুক্‌রো আলু খোকার খেলার রাজত্বে ফেলে তাকে সমৃদ্ধ করে সে আবার তাড়াতাড়ি তার কাজে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে খোকাকে শান্ত করার ছলে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তার সংশয়ের মীমাংসা করতে ভুলল না।

আমিও একবার তাড়াতাড়ি খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। সময়ও আর বেশী নাই। সুশী আমাকে জানিয়ে দিলে—না, ও কিছু নয়। আমারই ভুল; এখন ত বেশ ঘাম হচ্ছে।

সুশীর কথায় সায় দিলাম। মনকে যাহোক একটা প্রবোধ ত' দিতে হবে। তার পর আপিস, নিত্য-কর্ম্ম।

সারাদিন সুশীর কেমন ক'রে কেটেছিল জানি না, কিন্তু আমার কথা?

বাঙালী, যাঁরা ভদ্রলোকের উপযোগী অল্প মাহিনার দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেদের বন্দী করে রাখেন, তাঁদের হৃদয়-বৃত্তি বলে জিনিষটাকে আপিসের বন্দীশালার দরজার বাহিরে রেখে আসতে হয়। ও জিনিষটী আপিসের মধ্যে শুধু যে অদরকারী তা নয়,—অনিষ্টকর।

এমন অনিষ্টকর জিনিষ নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। কী

জানি কখন হৃদয়হীনতা ও অবিচারের আঘাতে সে উত্তেজিত হয়ে নিজের আখেরই খুইয়ে বসে।

যখন বড় বাবুকে গিয়ে বললাম—সার্, আজ একটু সকাল সকাল ছুটী পাব কি? বাড়ীতে খোকার অসুখ দেখে এসেছি।

বড়বাবু ধমক দিয়ে বললেন—তোমাদের বাপু খালি ছুটী নেবার ফন্দি। একটা না একটা অছিলা আছেই। আর সে সব অছিলা এমন যে মানুষ তাতে ছুটী না দিয়ে পারে না।—তোমরা বাপু সকাল সকাল পালাও, আর তার হ্যাঁপা সাম্‌লাতে হয় আমাকে—কাঁহাতক আমি সাম্‌লাই বল ত?—

বড় বাবুর বক্তৃতা হয়ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু আমি তা শেষ হবার পূর্ব্বেই মৃদুস্বরে বললুম—কিন্তু সার্—

—আচ্ছা তুমি যাও এখন, একটু পরে জানাব। বড়বাবু বড় সায়েবের ঘরের দিকে চললেন। আমি ফিরে এলাম নিজের কাজে।

একটু পরে জবাব এল। পিয়নের হাতে একটা স্লিপে বড় বাবুর হুকুম—সকাল সকাল যেতে পার, কিন্তু তার আগে এই সঙ্গের 'ফাইল' শেষ করে যাওয়া চাই। পিয়ন একটী মাঝারি গোছের ফাইল আর স্লিপটা আমায় দিয়ে গেল।

একটু ভেবে দেখলাম—সকাল সকাল যাওয়া সম্ভব কি না। সম্ভব অসম্ভব ভেবে লাভ নেই; 'ফাইল' ত আগে শেষ কর্ত্তে হবে।—

বাড়ী ফিরে দেখি—সুশী উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে আমার অপেক্ষা কর্চ্ছে। আমাকে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—এসো, আমি বড় ভাবছিলাম। এত দেরী হল যে?

তার এ অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, ছিল না আনন্দ। চোখে তার সে কী নির্ভরতা।

তার কথার উত্তরে হাসির বেদনায় বুক টন্‌টন্ করে উঠল। কপালে আঙুল দিয়ে বললাম—আজই বেশী কাজ পড়ে গেল। খোকা কেমন আছে?

খোকার সামান্যই জ্বর হয়েছে; এখন ঘুমুচ্ছে। সুশীর কথার মধ্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হল।

বললাম—তাই ত; খোকাটার জ্বর হল—

'জ্বর হয়েছে, ছেড়ে যাবে'খন্, অত ভাববার কী আছে? জ্বর ত বেশী হয়নি, গাটা একটু গরম হয়েছে মাত্র—'

খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। না, জ্বর বেশী নয়। সুশীকে জিজ্ঞাসা করলাম—সর্দ্দি নেই ত।

না—সুশীর স্বর শুষ্ক।

একটু স্তব্ধতার পর সুশী বললে—কথায় যে বলে মা না ডাইনী—মা'র কথা ছেলের স'য় না। কালই বলছিলুম না, যে খোকার আমার অসুখ বিসুখের বালাই নেই।

মাতৃ-হৃদয়ের ব্যথার কতখানি সান্ত্বনা ও ধিক্কার এই কথা ক'টীর মধ্যে লুকানো!

সে রাত খোকা বেশ শান্ত ভাবেই ঘুমিয়েছিল, কিন্তু ঘুম ছিল না খোকার মায়ের। ঘুমোবার ভান করে সে যে শুয়েছিল এ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তার শোবার ভঙ্গীর আড়ষ্টতা দেখে। সারারাত সে এই ভাবেই কাটিয়েছিল, অথচ এই সুশী এত ঘুম-কাতুরে ছিল যে, এজন্যে অনেক সময় আমিই বিরক্ত হ'য়ে উঠতুম। কিন্তু খোকা আসবার পর থেকে এ বিষয়ে সুশীর কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটেছিল।

প্রভাতে ঘুমন্ত খোকাকে আমার কাছে রেখে সারারাত্রি অনিদ্রার কলঙ্ক প্রাতঃস্নানের প্রলেপে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সুশী তার দৈনন্দিন কাজ সুরু করে দিল।

ভাবছিলুম সুশীর কথা। কী অশ্রান্ত কর্ম্মকুশলতা। হয়ত এটা অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু তবুও সুশীর এই কর্ম্মকুশলতায় তার প্রশংসায় আমার ম ভরে উঠল।

খোকা জেগে' কেঁদে উঠল।

আমি খোকাকে শান্ত কর্ব্বার প্রয়াস পেতে না পেতে সুশী এসে, তাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে স্নেহচুম্বন বর্ষণে অভিষিক্ত করে দিল। তার পর বললে—দেখ, খোকার গাটা এখনও ত ঠাণ্ডা হ'ল না। একটু অষুদ্ বিষুদ দিলে হত না?

হ্যাঁ, আচ্ছা দাও দেখি খোকাকে, পাশের বাড়ীর কবিরাজকে নয় দেখিয়ে আনি।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে সে তাকে আমার কোলে তুলে দিল। তারপর কি মনে করে খোকার হাতের একটা আঙুল কাম্‌ড়ে দিয়ে বললে—তোমার জানা কেউ ডাক্তার নেই?

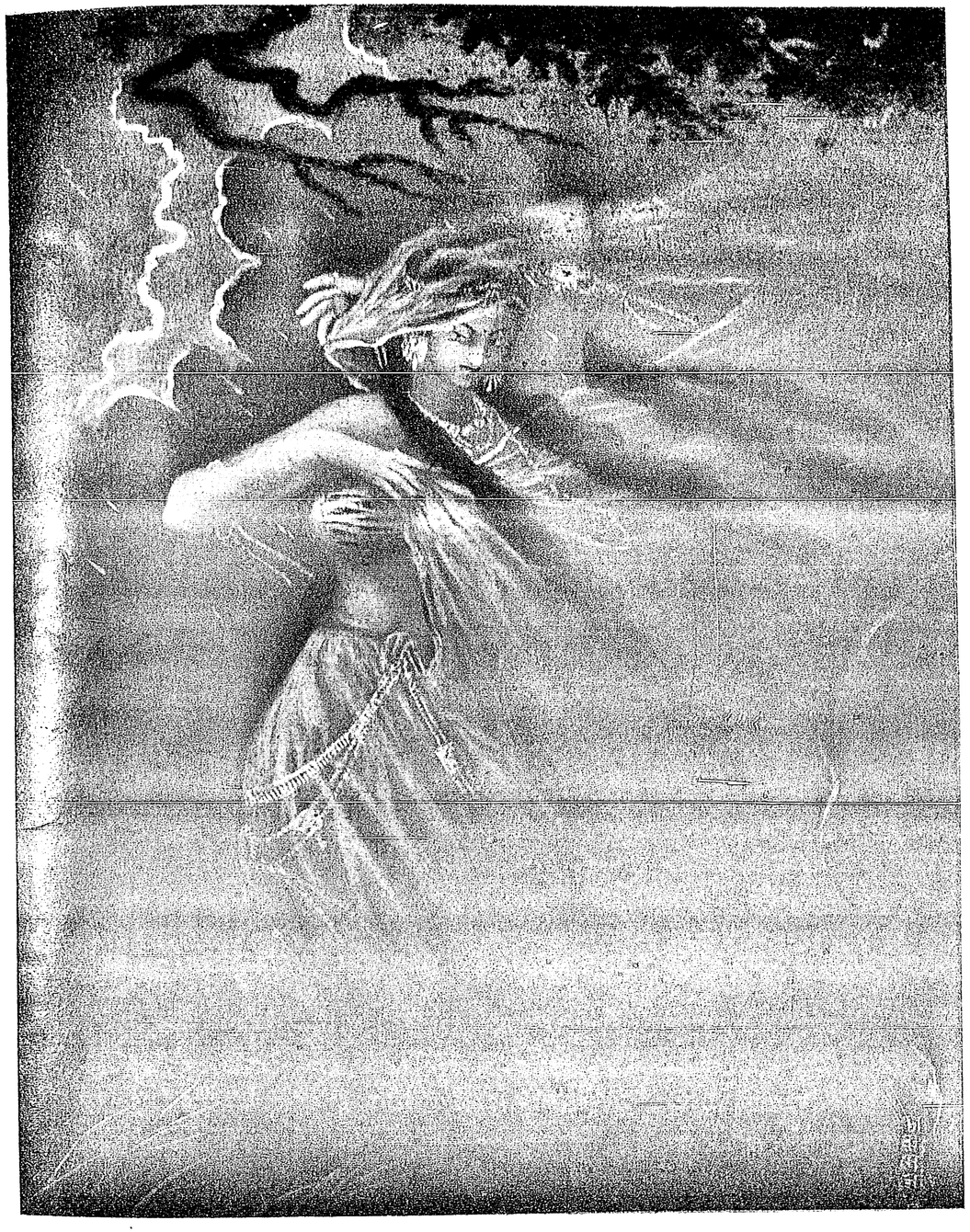

ঝড়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATI

—জানা ডাক্তার আছে, একটু দূরে, সেখানে ত খোকাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আজ আপিস থেকে ফেরবার পথে নয় তাকে একবার বলে আসব। এখন তবু কবিরাজ মশায়কেই দেখিয়ে আসি। দেখি কি বলে!

সুশী আর দ্বিরুক্তি করলে না।

কবিরাজ খোকাকে বেশ যত্ন ক'রেই দেখলেন। বললেন—হুঁ, নাড়ীটা কিছু চঞ্চল বটে, কিন্তু কোনো জটিলতা নেই। জ্বর হয়েছে আজ ক'দিন?

—কাল সকাল থেকে। একই ভাবে জ্বর রয়েছে, কমেও নি, বাড়েও নি।

—হুঁ, তা উপস্থিত চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে কি না কাল—অর্থাৎ ষষ্ঠীতে জ্বর হয়েছে, একটু ভোগাবে এই যা—

ফিরে এসে সুশীকে প্রশ্ন করলাম—খোকার জ্বর হয়েছে কবে থেকে? কাল সকাল থেকে, না পরশু রাত্তিরেই টের পেয়েছিলে?

সুশী উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করলে—কেন বল ত।—কই রাত্তিরে তত বুঝতে পারিনি। সকালে খোকাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মনে হ'ল যেন গা'টা একটু বল্ বল্ কচ্ছে।

ভেবেছিলুম, ষষ্ঠীর দিনের কথা বলব না। কিন্তু না বলেও পারলুম না। সুশীকে শান্ত করতে গিয়ে বলে ফেললুম—কবিরাজ মশায় বললেন—চিন্তার কিছু নেই। তবে—'ষষ্ঠী'তে জ্বর হয়েছে, সারাতে একটু সময় নেবে।

সুশীর চোখের দীপ্তি যেন একেবারে নিভে গেল। মুখে রক্ত-হীনতার বিবর্ণতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুশী নিজেকে সংযত করে নেবার পূর্ব্বেই, অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললাম—ও 'ষষ্ঠী' তিথি কিছু না। তবে এখন হাওয়া বদ্‌লাবার সময়, একটু সাবধান হওয়া ভাল।

সুশী কোন কথা বললে না। শুধু আপিসে যাবার সময় একবার জানিয়ে দিল—ফেরবার পথে, তোমার জানা ডাক্তারকে যদি পার ত খোকার কথা জানিয়ে এস।

তিথি বা ক্ষণ আমি বিশ্বাসই করি না। তবু কথাটা শুনে মনটা যেন কেমন দুলে ওঠে। তিথি বা ক্ষণের প্রকোপে কী শুভাশুভ ঘটনা আমার জানা আছে তার তালিকা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সারাদিন এই ভাবেই কাটিয়ে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। আজ আর ভাল লাগছিল না। মন এত দ্রুত যেতে চায়, যে তত দ্রুত চলা অসম্ভব। হিসাব না করেই ট্রামে চড়লাম।

পথে ডাক্তার বন্ধুর খোঁজ করে গেলাম। দেখা হ'ল না। বাড়ী ফেরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব মন নিয়ে অপেক্ষা করতে পারলাম না।

খোকাকে কোলে নিয়ে সুশী বসে ছিল। আমাকে দেখে শুধু মৃদুস্বরে বললে—এসো।

সে স্বরে কতখানি ভয় ও নির্ভরতা!

আমি মৃদু ভয়কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করলাম—খোকার জ্বর কি খুব বেশী?

সুশী একবার ঘাড় নেড়ে বললে—জ্বর এত যে গায়ে হাত রাখা যায় না। তার ওপর দুবার বমিও করেছে। সারা দুপুর মাথার যন্ত্রণায় বাছা আমার ছট্‌ফট্ করেছে।

উদ্‌গত অশ্রু রোধ ক'রে সে সংযমের প্রতিমার মতো বসে ছিল। সুশীর এই মৌন শান্ত স্থৈর্য্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। আবার ডাক্তার বন্ধুর সন্ধানে বা'র হ'লাম।

বন্ধু তখন বাইরে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন—কি নরেন, খবর কি? মুখ এত শুক্‌নো যে?

মুখে একটা হাসির ছলনা টেনে আনবার চেষ্টা করে বললাম—শুক্‌নো হবে না? সারাদিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর খোকার অসুখের ভাবনা।—

'খোকার অসুখ!—কী অসুখ করেছে?' একটা কৃত্রিম ঔৎসুক্যের ভাব তার মুখে।

এ ভাব লক্ষ্য করলেও উপেক্ষা করে বললাম—বড্ড জ্বর হয়েছে, গায়ে হাত রাখা যায় না। তার উপর আবার দুবার বমিও করেছে। একবার দেখে যাবার সুবিধে হবে কি?

—'যাওয়া'—রিষ্টওয়াচটার দিকে লক্ষ্য করে একটু হিসাব করে সে বললে—সাড়ে সাতটায় থিয়েটার আরম্ভ, এখন দেখছি সাতটা কুড়ি—আর ত দেরী করা চলে না।—আচ্ছা জ্বর আর দুবার বমি করেছে।—ও কিছু নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা—একটা অষুদ লিখে দিচ্ছি—দু ঘণ্টা অন্তর এক দাগ। একটা স্লিপ্ নিয়ে ফস্‌ফস্ করে সে প্রেসক্রপসান লিখে দিল। তার পর সেটা আমার হাতে দিতে দিতে বললে—কিছু মনে

করিস নি ভাই। বড্ড তাড়াতাড়ি, নইলে যেতুম।—আর ভাল কথা—জ্বরের ওপর দুধটুদ্ যেন দিস নি। একটা এলেনবেরীস্ ফুড নম্বর ওয়ান নিয়ে যাস্। হ্যাঁ, আর কাল সকালে খবর দিস্ কেমন থাকে।

কোনো রকমে শিষ্টাচারের গণ্ডী ঠিক রেখে ঘাড় নেড়ে এই অপমান বরং গ্রহণ ক'র্ত্তে হ'ল।

কিন্তু এইবার!

হাত পাতলেই পাব, এমন কোনো বন্ধুর নাম আমার মনেই এল না। তবুও অনেক আশায় নিজেকে সংযত করে, এক বন্ধুর উদ্দেশে পাড়ি দিলাম। কিন্তু তত দূরও যেতে হল না। প্রায় মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। আর সেই মোটর থেকে নেমে এলেন—রাখাল বাবু, আমাদের আপিসের কেরাণী।

প্রেসক্রপসানখানা পকেটে রাখবার কথা মনেই হয়নি, সেখানা হাতেই ছিল। রাখাল বাবু বললেন—আরে ছ্যা ছ্যা, দাদা যে—কি ওখানা, প্রেসক্রপসান না কি? কার অসুখ?

সদ্য বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে তখনও সুস্থ হতে পারি নি। কোনো রকমে বললাম—আমার ছেলের।

রাখাল বাবু এক রকম জোর করে আমায় তার গাড়ীতে তুলে নিয়ে চললেন—ডিস্‌পেনসারীতে ত?

অত্যন্ত মাথা ঘুরছিল। তাই ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ।

রাখাল বাবু ট্যাক্সিওয়ালাকে সেই মতো আদেশ দিলেন।

আমি ভাবছিলুম আমার এই নিষ্কপর্দ্দকতার কথা কেমন করে বলি। অনেক চেষ্টা করে বলতে যাচ্ছি, এমন সময় রাখালবাবু হেসে বললেন—কী, আমায় ট্যাক্সিতে দেখে ভায়ার মুখে যে আর কথা নেই। আমি কী ট্যাক্সি চড়ি? রেস্, ভাই, রেস্। আজ বেশ কিছু মোটা রকম পাওয়া গেল। ভাবলুম একটু আরাম ক'রে নিই। দুঃখ কষ্ট ত জীবনে আছেই রে ভাই। তবে আরাম কর্ব্বার যেটুকু সুযোগ পাই ছাড়ি কেন?

আমার মন আমার অবস্থাটুকু জানাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনি সে কথা বলা সুষ্ঠু হবে কিনা ভেবে শুষ্কস্বরে বললাম—তবে—

আমার কথা আরম্ভ না হতেই রাখালবাবু বললেন—ও তবে টবে নেই ভাই। 'নগদ্ যা পাও হাত পেতে নাও' এই হচ্ছে আমার 'মটো'—

রাখালবাবুর 'মটো' জানবার জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। মোটরও ডিস্‌পেনসারীর কাছে এসে পড়েছিল। তখন মরিয়া হ'য়ে বলে ফেললুম—রাখালবাবু, অষুদের জন্যে কটা টাকা—

মোটর ততক্ষণে ডিস্‌পেনসারীর সাম্নে এসে দাঁড়াল। রাখালবাবু আমায় বাধা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, সে সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বস গাড়ীতে।

রাখালবাবু প্রেসক্রপসান্‌খানা নিয়ে বললেন—আর কিছু?

'এলেনবেরী একটা'—

'আচ্ছা, নিয়ে আসছি।

অষুদ ও ফুড্ নিয়ে রাখালবাবু ফিরে এসে বললেন—এই নাও।

তারপর কি ভেবে বললেন—আচ্ছা চল, তোমার বাড়ী দেখে আসি।

ট্যাক্সিওয়ালাকে পথ বুঝিয়ে দিলাম।

রাখালবাবু খোকাকে দেখে ফেরবার সময় আমাকে ডেকে বললেন—ছিঃ ছিঃ ভায়া, আমাদের বলতে লজ্জা! নিজেদের অবস্থার কথা আমরা জানি না? যা মাইনে পাই তাতে হয়ত কোনো রকমে খাই-খরচ চলে। ব্যস্। তার বাইরে একটা খরচ এলে চক্ষু চড়কগাছ! টাকা ভারী দরকারী জিনিষ—বুঝলে।

পকেট থেকে একখানা নোট বার করে, আমার হাতে গুঁজে দিয়ে, রাখালবাবু তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন।

রাখালবাবুকে একটা ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেলাম। এত বড় হৃদয়ের দানের প্রতিদানে শুষ্ক কথার ধন্যবাদ দেবার প্রবৃত্তি তখন ছিল না।

মনটা বড় খুসী হ'য়ে উঠল। ঘরে এসে অত্যন্ত সহজ ভাবে সুশীকে নোটটা দিলাম। সুশী জিজ্ঞাসু ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বলবার চেষ্টা করলাম। ধীরভাবে সমস্ত ঘটনা শুনে সুশী নোটটা আমার দিকে দিয়ে বললে—ওঁর এই দয়ার ঋণ আমরা কোনকালে

শোধ কর্ত্তে পার্ব্ব না। কিন্তু এই জ্বরার টাকা ত আমার খোকার জন্যে খরচ কর্ত্তে পারি না। এ টাকা তুমি ওঁকে ফিরিয়ে দাও।

আমি আশ্চর্য্য ভাবে সুশীর দিকে তাকালাম। তারপর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। কি যে এই মেয়েদের ভাবপ্রবণতা বুঝি না।

অগত্যা আবার বার হয়ে ছলনা করে সেই টাকাই নিয়ে ফিরলাম। এবার সুশী পূর্ণ বিশ্বাসে এ টাকা গ্রহণ করলে।

সুশীর এই বিশ্বাস এবারে আমাকে দোলা দিল। আমি আমার মনকে যথেষ্ট শাসন করেও এই সামান্য অশান্তির হাত এড়াতে পারলাম না। মনে হ'ল—এ টাকা ঘুরিয়ে এনে না দিলেই ভাল হত। যদি এতে খোকার ভালমন্দ একটা কিছু হয় তা' হ'লে আমার যে আপশোষের সীমা থাকবে না।

রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারলাম না। চিন্তার দাহে সে রাত্রির অশান্তির তুলনা হয় না।

প্রভাতে উঠে দেখি, সুশীর মুখের আভা ফিরে এসেছে। সে হেসে বললে—খোকার জ্বর ছেড়ে গেছে।

আমার মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, তা হলে ও টাকা আর খোকার জন্যে খরচ কর্ত্তে হবে না। কিন্তু কিছু বললাম না।

সুশী বললে—তুমি খোকার কাছে একটু বস; আমি ফুড্‌টা তৈরি করে নিয়ে আসি। কাল সারাটা দিন খোকার পেটে একরত্তি জলও পড়েনি।

এক দিনের জ্বরেই খোকা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে নিস্তেজ ভাবে শুয়ে রইল। আমাকে তার পাশে দেখে তার মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল। আমার স্নেহ সম্ভাষণ সে মুদিত নেত্রে উপভোগ করলে। মনে মনে অতি আবেগে বললাম—খোকা, খোকা আমার।

খোকাকে সুস্থ দেখে মন আমার অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গিয়েছিল। গত রাত্রির ছলনার কণ্টকটুকু তখনও তার অস্তিত্ব ভুলতে দেয় নাই। সেটা তখনও মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করছিল।

সুশী খোকাকে খাইয়ে গেল। আমাকে বাজারের পয়সা বুঝিয়ে দিলে; কিন্তু টাকাটা ফেরাবার কথা মুখেও আনলে না।

ভাবনা হল কেমন করে টাকাটা চেয়ে নিই?

সেদিন রবিবার, কোনো রকমে কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন আফিসে যাবার সময় দেখি—খোকা বসে বসে খেলা করছে—তখন বেশ সাহসে একটু বুক বেঁধে সুশীকে বললাম—ওগো, আর বোধ হয়, ও-দিনের নোটটায় দরকার হবে না। দেনা যত শীগ্‌গির শোধ হয় তত ভাল। ওটা ফিরিয়ে দি, কি বল।

সুশী ঘাড় নেড়ে বললে—সেই ভাল, আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম।

সুশী নোটটা এনে দিল।

নিজের দুর্ব্বলতা অপ্রকাশিতই র'য়ে গেল। সেজন্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু এখন টাকাটা ফেরাই কি বলে?

আপিসে এসে প্রথমই দেখা রাখালবাবুর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি ভায়া, খোকা কেমন, ভাল ত?

ঘাড় নেড়ে বললাম—আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই আছে। তার পর পকেটে হাত দিয়ে বেশ একটু সাহস করে বললাম—দাদা, টাকাটা আর খরচ করবার দরকার হয়নি। তাই—

—ফিরিয়ে দিতে চাও। দাও। দেনা শোধ করে ফেলাই ভাল। টাকা বড় দরকারী জিনিষ। রাখালবাবু হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে পকেটে পুরলেন। তার পর আমার দিকে একটা দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন। কোনও কথা বললেন না।

আমার একবার, কি জানি কেন, মনে হল, রাখালবাবু কি রাগ করলেন?

আগমনী—আশীষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ,বি-এল, বি-সি-এস্

১

আশ্বিনে আজ আশীষ মায়ের
মেঘ-ভাঙা ঐ নীল গগনে
ছড়িয়ে গেল— ধানের শীষে,
কাশের ক্ষেতে, কমল-বনে!
বর্ষা বিদায় মাগ্‌ল,
শরৎ হেসে জাগ্‌ল,
শতদলের অরুণ আভাস আঁখির কোণে লাগ্‌ল।

২

ইন্দ্রপুরীর পারিজাতের
পাপ্‌ড়ি খসে' পড়্‌ল কি রে?
নন্দনেরি ভাণ্ড হ'তে
ঝর্‌ল সুধা ধরার তীরে?
অশ্রু-বাদল টুট্‌ল,
খুসির কুঁড়ি ফুট্‌ল,
কেয়ার রেণু অঙ্গে মাখি' মৌমাছিরা ছুট্‌ল।

৩

ভাঙা ঘরের আঙ্গিনাতে
শিউলী ফুলের শুভ্র হাসি—
ভাঙা বুকের গোপন কোণে
আগমনীর বাজ্‌ল বাঁশী।
হারানিধি ফির্‌ল,
মায়ের কোলে ভিড়্‌ল,
মূর্চ্ছা ভেঙে মৌন আশা গুঞ্জরিয়া ঘির্‌ল।

৪

মর্ম্মতলের নিবিড় নীরে
হয় তো ছিল সুপ্ত সাধ—
মাথায় করি' নিলাম তুলি,
জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ!
দিগ্‌বধূরা হাস্‌ল,
জমাট আঁধার নাশ্‌ল,
ভরা পালে জোয়ার জলে মনের তরী ভাস্‌ল।

৫

তোমার দানের মোহন মোহে
তোমায় যেন না যাই ভুলি'—
দেওয়া-নেওয়ার চিত্র আঁকে
নানান্ টানে তোমার তুলি।
সুখে অটল রইতে,
দুখের বোঝা বইতে,
শক্তি দিয়ো বর্ষা-শরৎ নির্ব্বিকারে সইতে!

পল্লীরাণী

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

বসন্তের মৃদুহিল্লোল, থাকিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ পল্লীখানার বুকের উপর শান্তির অমিয়ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। গাছে-গাছে কোকিলের কুহুতান, ঝোপের আড়ালে দয়েল, পাপিয়ার কমণীয় কণ্ঠ, চৈত্রের অপরাহ্নটীকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। বারোয়ারীতলায় ছেলের দল একটা থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। তাহারই অদূরে একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে, একটা ভাঙ্গা আটচালার ছারপোকাওয়ালা তক্তপোষের উপর বসিয়া গ্রাম্যদেবতাগণ নানাবিধ পরনিন্দারূপ সদালাপে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের গভীর গবেষণার বিষয় ছিল, কাহার স্ত্রী কি ভগ্নী দুশ্চরিত্রা, কাহাকে সমাজে আটক দেওয়া যায়, কাহার বাপের শ্রাদ্ধে গোয়ালাকে গোপনে ডাকিয়া জিনিস দিতে নিষেধ করিয়া

দেওয়া যায়, ইত্যাদি। আটচালার পাশ দিয়া গ্রামের ছোট নদীটী, তাহার ছোট সম্পদ বুকে লইয়া অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে; কারণ এখন বসন্ত, বর্ষা নহে। বটগাছের দক্ষিণ দিকে একটা পুরাতন জীর্ণ ঘাট্‌লা, শেওলাতে পিচ্ছিল হইয়া, কত যুগের জীর্ণস্মৃতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, কে বলিবে?

একঘর বনেদী সেকেলে গৃহস্থ, যেমন প্রায় প্রতি গ্রামেই থাকে, এখানেও ছিল। এদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে এরা প্রায়ই গর্ব্ব করিয়া বলিত—"কীর্ত্তিনাশা যখন রাজনগরের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া লইয়া যায়, তখন তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, রাজা রাজবল্লভের খুল্লতাত, এইখানে আসিয়া বসতবাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন। নবাবী আমোলের খান্দানীর ঠাট্-বহর স্বরূপ, তাহাদের সদর দেউড়ীতে একটা নহবৎ, বৈঠকখানায় দু'চারখানা মরিচাপড়া ঢাল, তলোয়ার; আর এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দরোয়ান, পাকা দাড়িতে দড়ি বাঁধিয়া হিন্দী রামায়ণ পড়িত। গল্প উঠিলে সে বলিত—"আরে বাপ্‌রে বাপ্, রাজা রাজবল্লভ সাড়ে পাঁচ হাত জোয়ান পুরুষ ছিল" ইত্যাদি।

হরনাথ সেন, বহুদিন হইল সবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন পূর্ব্বপুরুষের ভগ্নাংশ জমীদারীর মুনাফার তদ্বির-তদারকে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত,—"সেন ম'শায়, কাশী যাবেন কবে?" উত্তর হইত, "আরে ভাই, যমুনার বিয়েটা, আর এই চৈতন্যপুরের হাঙ্গামাটা মিটিয়েই লম্বা দেব!" কিন্তু কাজে আর তাঁহার কাশী যাওয়া হইত না। দু'একজন বন্ধু পীড়াপীড়ি করিলে হরনাথ বলিতেন—"আরে ভাই, কিসের কাশী, গয়া? কলিতে হচ্ছে কি জান "হরের্নামৈব কেবলম্।" হরনাথ কতকগুলি খতখাতার মকর্দ্দমার কাগজপত্র, তলব বাকীর লিষ্টি, নিরিখবৃদ্ধির ফিরিস্তি, সুমারের গোসরা এবং আমলার মাসহারা লইয়া নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়াছিলেন, এমন সময়ে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—"দিদিরাণী ডাক্‌ছেন।" দিদিরাণীর কথাটা শুনিয়াই হরনাথ তাহার সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। এই মেয়েটীকে না কি দু'বৎসরের রাখিয়া হরনাথের স্ত্রী পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মেয়ের নামই যমুনা।

যমুনাকে আদর করিয়া কেহ দিদিরাণী, কেহ পল্লীরাণী, কেহ বা রাণী বলিয়া ডাকিত। বসন্তের রাণীর মত রূপের নদীতে যমুনার পূর্ণ যৌবনের বিকাশ হইয়া আসিতেছিল। পল্লীর স্নিগ্ধ, শান্ত কোলে এই নববসন্তেই যমুনা আপন মনে বসিয়া গাহিত—

"একলি মন্দিরে, অনিদ লোচনে
জাগি সাগর রাতিয়া॥"

যমুনা রূপবতী, গুণবতী; কিন্তু যমুনার আজিও বিবাহ হয় নাই। কেহ বলিত, হরনাথ মেয়ের বিবাহ দিয়া একটী ঘরজামাই রাখিতে চায়। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা আর ঘরজামাই থাকে না। কেহ বলিত, কি জানি ভাই, যমুনার মা না কি পাঞ্জাবে ছিল,—কি যেন কি ভাই, বড় ঘরের ছাই ভস্ম দিয়ে কি দরকার? ইত্যাদি। সেদিন গাঁয়ের ছেলে অমল দেওঘর হইতে যমুনাদের বাটীতে আসিয়াছিল—যমুনার জন্মতিথির নিমন্ত্রণ। কত বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়াছে। যমুনা একখানা ফিরোজা রংএর বারাণসী পরিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। বাসন্তী সন্ধ্যায়, বসন্তের রাণী যমুনার দিকে সকলেই হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল। পল্লীর বন্ধুরা পল্লীরাণীর জন্য কুসুমের মালা, কুসুমের হার সাজাইয়া আনিয়াছিল। আর সুদূর নগরের প্রবাসী বন্ধুগণ তাহার জন্য নগরের নিত্য নূতন বিলাস-সামগ্রী উপহার পাঠাইয়াছিল। পল্লীরাণী যমুনা আজ ফুলের মালা ফুলের হার পরিয়া সত্যিই "পল্লীরাণী" সাজিয়াছিল। যমুনা কাহাকে বা মিষ্টি কথায়, কাহাকে বা অর্গানের সাহায্যে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিতেছিল। অমল আসিয়া অর্গানের সাম্‌নে বসিল। যমুনা গান ধরিল—"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো" মুগ্ধ দর্শক এবং স্ত্রীলোকগণ সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল। সকলেই বুঝিয়া গেল—অমলই যমুনার বর।

অমল এ গাঁয়ের ছেলে হলেও তা'রা দেওঘরেরই পাকা বাসিন্দা। পূর্ব্বপুরুষের ছটাক-নটাক তালুক-মুলুক, ভাঙ্গা দালান-কোঠা, যখন সাত-শরিকের দেনার দায়ে নিলাম হইয়া গেল, তখন অমলের দাদা সবেমাত্র বি-এ পাশ করিয়া এম-এ আর "ল" পড়িতেছিল। তখন হঠাৎ তাহার পিতৃদেব দেওঘরে স্বর্গারোহণ করিলেন। অমল গাঁয়ের কাছে শেষ বিদায় লইয়া ভাইটীর হাত ধরিয়া দেওঘর চলিয়া গেল। তাহার বাবা সেখানে একখানা মেটে কোঠা আর

হাজার দু'চার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই দিয়া দু' ভাই বেশ একটা ছোটখাট সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু, পল্লীর মায়াটা সে একেবারে কাটাইতে পারে নাই। কারণ, পূর্ব্বপুরুষের পুরোন ভাঙ্গা বাড়ীটা, তার পেছন দিকের বাঁশ ঝাড়, আর নারিকেল-কুঞ্জের আড়ালে পিক-বধূর মনোহর কাকলি; সর্ব্বোপরি, বাল্যসাথী যমুনার স্নেহ ভালবাসা-মাখা মধুর স্মৃতি-বিজড়িত কচি কোমল হস্তের লিপিখানা, তাহার জন্মতিথির দিনে তাহাকে কোন্ সুদূর হইতে যেন পল্লীর মাঝে, পল্লীরাণীর হৃদয়-মন্দিরের পূজার দেবতার সাজে সাজাইয়া আনিত। সবদিকের সমস্ত কাজ ফেলিয়া অমলকে বৎসরের নববসন্তের বধূর মধুর জন্মতিথিতে পল্লীরাণীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতে হইত।

বসন্ত চলিয়া গেল, বর্ষা আসিল। মানবের জীবনেও ত এম্নি কত বসন্ত চলিয়া গিয়া কত বর্ষা আসে, কে তার খোঁজ রাখে? কীর্ত্তিনাশা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিশাল, বিপুল, অনন্ত তরঙ্গের প্রচণ্ড লীলা, বিশ্বপ্রকৃতির বুকে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। অদূরে রাজনগরের দু'একটা শেষ গরিমার শেষ নিদর্শন, তখনও ঘনবিন্যস্ত বনানীর অন্তরাল হইতে, বর্ষার গুরু গুরু শিহরণের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল—মাঝে-মাঝে যেমন প্রাচীন স্মৃতি আজিও কীর্ত্তির ডালা সাজাইয়া, মানবের অতীত গরিমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রচণ্ড তরঙ্গ-সমাকুলা কীর্ত্তিনাশা, রাজবল্লভের অসীম কীর্ত্তি গ্রাস করিয়া শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—অগ্নিদেব যেমন খাণ্ডব দাহন করিয়া শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। এবার অমল অনেক দিন থাকিয়া গেল। সবুজ বন, নারিকেল-কুঞ্জ, বর্ষার পূর্ণ জোয়ার, ভেকের রব, এগুলি যেন তার এবার নূতন করিয়া ভাল লাগিতেছিল। বর্ষার ভরাবুকে একখানা পান্‌সি ছুটিয়াছিল। পান্‌সি, ভরা জোয়ারের বুকে যমুনার পূর্ণ যৌবনতরী বহন করিয়া ছুটিয়াছিল,—সঙ্গে ছিল তার চিরদিনের সঙ্গী—অমল।

অমল—কি সুন্দর যমুনা, আজ যেন কীর্ত্তিনাশা তাহার সমস্ত কীর্ত্তিমেখলা লইয়া প্রাচীন ধ্বংসের বুকে নূতন কিছু একটা সৃষ্টি করিতে যাইতেছে।

যমুনা—আমারও মনে হয় অমল, আজ যেন কীর্ত্তিনাশা নূতন সাজে সাজিয়াছে। কিন্তু এ কি ধ্বংস না সৃষ্টি, প্রলয় না স্থিতি, কি ক'রে বল্‌ব।

অমল—আমি আর কতকাল আশায় আশায় ঘুর্‌ব যমুনা? আমি ত তোমার সব কথাই রেখেছি।

যমুনা—অমল, আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর; তার পর যদি তোমার প্রাণের যমুনার জন্য সত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, সব ত্যাগ কর্ত্তে পার, তাহলে সে তোমারই।

অমল—কেন যমুনা! সত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, ত্যাগ কর্ত্তে হবে কেন? অমল যমুনার হাতখানা নিজের হাতে তুলিয়া লইল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। যমুনার দেহলতা অমলের কোলে লুটাইয়া পড়িল। ঘাটের নৌকা ঘাটে ফিরিয়া আসিল।

যমুনার পত্র—

প্রিয়তম.

পাঞ্জাবে বাবা এক বাঈজিকে বিবাহ করেন। আমি সেই বাঈজি-মায়ের গর্ভজাত সন্তান। সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া আজিও আমি সমাজকে ধ্বংস করি নাই, কলুষিত হইতে দিই নাই। নইলে যমুনার বুকে কতজনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিয়াছে। প্রিয়তম, সুধু দুটো পুরুতের মন্ত্র না হলে কি বিবাহ হয় না? বাবা, মা চিরদিনই স্বামী, স্ত্রী ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা পাগল হ'য়ে দেশে ছুটে এলেন। আমি বাবার বুকে আশ্রয় পেলাম। কীর্ত্তিনাশা তাঁদের বংশের সমস্ত কীর্ত্তি ধ্বংস করেও প্রাচীন বংশ-গৌরবের স্মৃতি-চিহ্নটুকু মুছে ফেলে নাই। প্রিয়তম, জীবনসর্ব্বস্ব আমার, এখন দেখ্‌ব তুমি যমুনাকে কত ভালবাস।

যমুনা

সন্ধ্যার আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে! অমলদের পুরোন দালানে এক বৃদ্ধা পিসিমা আজিও শালগ্রাম শিলার সেবাযত্ন করিত। অমল আসিয়া পিসিমাকে প্রণাম করিল। পিসিমা আশীর্ব্বাদ করিলেন "—বাবা, সনাতন ধর্ম্মে যেন মতি থাকে।" অমল যমুনার বাড়ীর দিকে চলিল। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। যমুনা অমলকে দেখিয়া তেম্নি ছুটিয়া আসিল। অমল যমুনাকে সাম্‌নের চেয়ারে বসিতে বলিল মাত্র। যমুনার রুদ্ধ অভিমান ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। আকাশে "গুরু গুরু দেয়া" গর্জ্জিয়া উঠিল। কীর্ত্তিনাশা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। রাজবল্লভের শেষ কীর্ত্তির ধ্বংসের শঙ্খে গ্রামবাসীরা চমকিয়া উঠিল। প্রলয়ের পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিল।

যমুনা—ওগো নিষ্ঠুর, ওগো পাষাণ, এই কি পুরুষের ভালবাসা?

অমল—তা নয় যমুনা; ভাব্‌ছি একটা কথা। কথা কহিতে কহিতে তাহারা নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও কীর্ত্তিনাশা ভীষণা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে গ্রামখানিকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। সাম্‌নে ছিল তাদের পল্লীরাণী। যমুনাকে অনেকেই পল্লীরাণী বলিত।

চাঁদের ভরাবুকে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ খেলিতেছিল; আর তটিনীর বুকে অনন্ত গর্জ্জন থাকিয়া-থাকিয়া পল্লীবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দিতেছিল। নদীর তীরে তখন কেবল-মাত্র অমল আর যমুনা দাঁড়াইয়া ছিল। অমলের বুকের মধ্যে কেবলই রহিয়া-রহিয়া বাজিতেছিল—"ওগো নিষ্ঠুর! ওগো পাষাণ!" কোথা হইতে একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া যমুনাকে কীর্ত্তিনাশার বুকে টানিয়া লইল। অমলও সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত তটিনীর বুকে—'রাণী, রাণী, পল্লীরাণী' বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। নৈশ গগনে তখনও প্রতিধ্বনি হইতেছিল—"পল্লীরাণী!"

মুক্তির পথ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত

ভারতবর্ষ পুরাতন সভ্যতার ধারা হারাইয়া ফেলিয়া এখন মোহাবিষ্টের মত চলিতেছে। এত বড় একটা বিরাট দেশ, বেদনার বোধশক্তি পর্য্যন্ত আজ তাহার নাই। সাধারণ লোকের সহিত সাম্রাজ্য পরিচালনের ব্যবস্থার যোগ ভারতবর্ষে বরাবরই কম ছিল। কি উদ্দেশ্যে কোন্ অনুশাসন হইতেছে তাহা প্রজাসাধারণ প্রায়ই জানিত না। ব্যবহারিক শুভাশুভ ব্যবস্থার জন্য রাজার উপরই তাহারা নির্ভর করিয়া থাকিত। ইহা আজিকার কথা নয়, ইহা চিরাচরিত। রাজা প্রজার এই সম্বন্ধ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। স্বস্তি প্রজাভ্যঃ—প্রজার শুভ হউক, পরিপালয়ন্তাং ন্যায্যেন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ—রাজারা ন্যায্য পথে রাজ্য পালন করুন। প্রজার সহিত রাজার ধর্ম্মের দিক দিয়া যোগ থাকায় এই ব্যবস্থাতে শুভই হইত। রাজার ধ্যানই ছিল প্রজার হিতসাধন করা।

কিন্তু আজ এ ব্যবস্থার অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ বিদেশী শাসন ভারতবর্ষের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই শাসকদিগের উদ্দেশ্যই হইতেছে ভারতবর্ষের শাসন দ্বারা ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডবাসীকে লাভবান্ করা। রাজার প্রত্যেক প্রচেষ্টার মধ্যেই আজ এই স্বার্থের চেহারাটাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যেখানেই ভারতীয় স্বার্থের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থের সংঘাত বাধে, সেই স্থানেই ভারতবর্ষের স্বার্থ বলি দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন করা হইত। ইংরাজের স্বার্থে ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। রাজশক্তির সাহায্য লইয়া ইংরাজেরা এই অনিষ্টপাত করিয়াছেন।

ঐ একটি কেন্দ্রীয় শিল্প নষ্ট করার পর আমাদের একটির পর একটি শিল্প বলি দেওয়া হইয়াছে। সে জোলা-তাঁতীর ব্যবসা তো গিয়াছেই—সে কামার-কুমার, সে তামা-পিতল-কাঁসার বাসনওয়ালার ব্যবসাও নাই। ছুতারের বড় ব্যবসা ছিল নৌকা তৈরী করা। রেলের জন্য নৌকা লোপ পাইয়াছে। সে ছুতারের জাত আজ লুপ্তপ্রায়। যানবাহন ও যানবাহনের সমস্ত উপকরণ আজ বিদেশীর হাতে।

এক দিক দিয়া এমনি করিয়া যেমন দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া দেশ নির্ধন হইতেছে, অপর দিকে আবার তেমনি দেশের ভিতর নানা অনাবশ্যক বিলাতী দ্রব্যের প্রবেশ ও ব্যবহারের পথ খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার

পরিপন্থী নীতিসূত্র সকল কৈশোরেই শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করে। বিলাসোপকরণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং বিলাতী দ্রব্য দ্বারা সেই অভাবের পূরণ—এই কর্ম্ম সুনিপুণ ভাবে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। সেই জন্যই জাতি আজ মোহাবিষ্ট। যাঁহারা দেশের জন্য ভাবিবেন তাঁহাদের সেই ভাবনার উৎসই বিকৃত। ফলে ভারতবাসী পুরাতন সভ্যতার ধারা দিনদিনই হারাইয়া ফেলিতেছে। অথচ এই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্বই এই জাতিকে নানা যুগে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আলেকজান্দার উত্তর-ভারত আক্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বিশাল বটবৃক্ষের দুই চারিটি পল্লব কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহা পরবৎসরই পরিপূরিত হয়, আলেকজান্দারের অনুষ্ঠিত ক্ষতি—কয়েক লক্ষ লোকক্ষয়, তাহা দুই এক বৎসরেই পূরণ হইয়াছিল। আলেকজান্দার ভারতের প্রাণস্পর্শও করিতে পারেন নাই—ভারতের সভ্যতার উপর এতটুকুও আঘাত করিতে পারেন নাই। লোকক্ষয় দ্বারা ভারতবর্ষকে মরণাহত করা যায় না—এ সত্যের পরিচয় মুসলমান-যুগেও পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান আক্রমণ ও ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেও ভারতবর্ষের আর্থিক হানি হয় নাই এবং সভ্যতার পরিবর্ত্তনও ঘটে নাই।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। ইংরাজ বাণিজ্য ব্যপদেশে আসিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে ভারতবর্ষের প্রাণ-পদার্থেরও সন্ধান লইয়াছে। ইংরাজ জানিয়াছে যে, ভারতীয়কে অভারতীয় করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে চিরদিন বিদেশী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। মানুষ যেমন গো-জাতিকে কিঞ্চিৎ আহার দিয়া তাহাদিগকে নিজেদের শত প্রয়োজনে আনে, ভারতে ইংরাজশাসন-পদ্ধতি তেমনি ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রয়োজনে সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যবহার করিবার জন্য সচেষ্ট। কেহ কেরাণী, কেহ ডেপুটি, কেহ মুন্সেফ হইয়া শাসন অথবা শোষণ যন্ত্র পরিচালনা করিয়া এক দিক দিয়া ভারতের অর্থ বিলাতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন; অপর দিকে গ্রামবাসী ভারতীয়গণ কেবলমাত্র কৃষিজাত দ্রব্য, তুলা, পাট, ধান, গম উৎপন্ন করিয়া তাহা বিলাতে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিলাতজাত বস্ত্র ও শত শত অন্য আবশ্যক ও অনাবশ্যক দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতেই ভারতের ক্ষেম, ইহাই ভারতের উপযোগী—এমনি বিশ্বাস লোকের মনে গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবাসীর অভাবের বোধ বাড়াইলেই বিলাতের পণ্য ভারতের বাজারে বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডকে ধনশালী করিবার পথ হয়। সেই চেষ্টাতে ভারতবর্ষের অল্পে সন্তুষ্ট থাকার যে একটা মনোবৃত্তি, একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই মোহাবিষ্ট অবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় জনসেবা। সেবা দ্বারা কলহ নিবারণ করা, সেবা দ্বারা জনসাধারণকে ধর্ম্মাধিকরণের মন্ত্রচক্র হইতে বাহির করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান দান করা, ভারতবাসীকে তাহার আত্মিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা আজ দেশকে মোহমুক্ত করার শ্রেষ্ঠ পথ। সাহস, বীর্য্য ও সহন ক্ষমতা সমস্তই সেবাধর্ম্মের ভিতর দিয়া জাতির মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। সাময়িক ঘটনায় অথবা কোনও মর্ম্মন্তুদ ও আপাত-অসহনীয় ব্যথায় যখন শাসন-পদ্ধতির দুষ্টতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনও সাধারণতঃ সাময়িক ও উত্তেজনামূলক পথই একমাত্র প্রতিকারের পথ বলিয়া মনে হয়। উত্তেজক পন্থার দ্বারা জনগণের চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে, জাগ্রত করা যাইতে পারে; কিন্তু পরে অভীপ্সিত ফললাভের চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহার জন্য নিষ্ঠা ও সাধনা চাই। কেবলমাত্র ভাবোন্মাদমত্ততা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্য মহত্ত্বের চরম স্তরে পঁহুছাইয়া অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে সাধনা ও সেবা না থাকিলে অচিরেই এবং অল্প বাধাতেই উত্তেজনা দারুণ অবসাদে পরিণত হয়। পার্ব্বত্য নদী যেমন এক দিনের বৃষ্টিতে উদ্বেলিত হয়, পাহাড়ের সানুদেশের বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইতে থাকে, আবার অতি অল্পকালের মধ্যেই শীর্ণা ও ক্ষীণতোয়া হইয়া বালুকাপ্রান্তরে প্রায় অন্তর্হিত হয়, তাহার গতিবেগ আছে কি না উপলব্ধি করা যায় না—সাময়িক উত্তেজনাও তেমনি অবসাদের বিস্তীর্ণ বালুকায় অল্পকালেই অন্তর্হিত হয়। যে স্থান ক্ষণকালপূর্ব্বে তরঙ্গায়িত, উচ্ছ্বাসময় ও আবর্ত্তমান ফেনিল জলরাশিতে পূর্ণ ছিল, দুই দিনের বৃষ্টিপাত বন্ধ হইলেই সেই স্থানের তপ্ত বালুকারাশি যেমন পুর্ব্বস্ফীতিকে পরিহাস করিতে থাকে, রাজনৈতিক উত্তেজনাও ঠিক তেমনি যখন অন্তর্হিত হয়, তখন আর তাহার পরিচয় মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে বিপুল জনতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় নিদ্রিত। শহরে, বন্দরে, গঞ্জে আর সেই বৈদ্যুতিক আবহাওয়া নাই, উদ্বেগ ও চিন্তাকুল আকাঙ্ক্ষা, স্বরাজ-প্রাপ্তির ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হয় না—পল্লীগ্রামে ততোধিক অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করিতেছে। এই প্রকারই হইবার কথা। ইহার অন্যথা হইলেই আশ্চর্য্য হইবার কারণ হইত। বৃহৎ উত্তেজনার পর বৃহৎ অবসাদ। যদি সেই উত্তেজনার মুখে আমাদের স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটিত তাহা হইলে জন-সমাজে মহত্ত্ব পরিবর্ত্তমান বেগে প্রবাহিত হইয়া কোনও সাম্প্রদায়িক বাধাকেই আর গণ্য করিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, সেই জন্য জনতা হইতে অধিক পরিমাণে মহত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই জন্যই আজ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এমন উগ্র হইয়া কাঁটার মত বিঁধিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন না হইলে ভারতে স্বরাজ হইবে না বলিয়া সকলের ধারণা ছিল, সর্ব্ব প্রথমে যে মিলন আশুলব্ধ হইয়াছিল, আজ অবসাদের দুর্দ্দিনে সে মিলন স্বপ্নবৎ মিলাইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে হিংসা ও বিদ্বেষের নরককুণ্ড আবর্ত্তিত হইতেছে। যে পরাধীনতার ব্যাধি এই সকল সাময়িক সামাজিক বিদ্বেষের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভুলিয়া আমরা আজ সাময়িক প্রতিকারেই সর্ব্বপ্রযত্নে মন নিযুক্ত করিয়াছি।

দেশের মুক্তির পথ জনসেবাতেই আছে, উত্তেজনায় নাই; কিন্তু সেবার জন্য সাধনার আবশ্যক। এ সাধনা নানা সূত্র অবলম্বন করিয়া হয়। মহাত্মা গান্ধীজী এই সাধনার পথ চরকাতেই পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজ দৈন্যে পীড়িত। এই দৈন্য নিবারণের উপায় দেশের বস্ত্রশিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা—৮০ কোটি টাকা—যাহা প্রতি বৎসর বস্ত্রের জন্য দেশের বাহিরে চলিয়া যায়—তাহা যাহাতে দেশে থাকে, তাহার চেষ্টা করা। তাই তিনি চরকার দ্বারা সমগ্র দেশকে সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের যত ঐশ্বর্য্য তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষে বস্ত্র ব্যবসায় করিয়া লব্ধ। আর ভারতের দৈন্যের একটা বড় হেতু বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার। যে শিল্পে বাৎসরিক ৮০ কোটি টাকা দেশে থাকে, তাহা ত সাধারণ নহে। এই অসাধ্য সাধন করিবার জন্য অসামান্য সাধনা আবশ্যক। এই সাধনার জন্য যে যন্ত্র আবশ্যক, তাহা কিন্তু অতি সাধারণ। একমাত্র চরকার সাহায্যেই এই বিপুল কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইংরাজ আসিয়া আমাদের শিল্প নষ্ট করিবার পূর্ব্বে যেমন ঘরে ঘরে চরকা অবসর সময়ে চলিত, আর তাহার দ্বারাই দেশের বস্ত্রের অভাব মিটিত—পুনরায় সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনার দ্বারাই এ সমস্যার সমাধান করা যায়। নূতন কিছুই করার আবশ্যক নাই। যাহা ছিল, তাহারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, প্রাণনাশকারী অলসতা হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া জীবনদানকারী শিল্পে হস্তক্ষেপ করাই ভারতের মুক্তির উপায়।

কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা ভদ্র তাঁহাদিগকেই উদ্বুদ্ধ হইয়া জাগ্রত হইয়া এই কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষিত সমাজের পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই আজ সূতা কাটা আবশ্যক হইবে। বস্তুতঃ তাঁহাদের সম্মুখে আজ নিজে সূতা কাটা ও অপরকে সূতা কাটানো, নিজে খদ্দর ব্যবহার করা ও অপরকে খদ্দর ব্যবহার করানোর এক পরম কর্ত্তব্য উপস্থিত। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় চরকা গ্রহণ করেন, তবে অপামর সাধারণকেও চরকা গ্রহণ করাইতে সাহায্য করা হয়। নিজে যদি কেবলমাত্র খদ্দর ব্যবহার করি, অন্য সমস্ত বস্ত্র ত্যাগ করি, তাহা হইলেই খদ্দর দ্বারা জনসেবার পথ চলিতে পারিবে। বাংলার একদল কর্ম্মী যশখ্যাতি সম্পদের সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া এই সাধনার পথই গ্রহণ করিয়াছেন—তাহারই ফলে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজ অল্পবিস্তর চরকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের শিক্ষিত সমাজ যদি এই সাধনা গ্রহণ করেন, দীনতার দ্বারা গর্ব্বকে জয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে যদি তাঁহারা গণের সহিত মিলিত হন, তবে এমন দিন আসিবে, যখন তরঙ্গায়িত ভাদ্রের গঙ্গার মত জাগ্রত গণশক্তি চরকা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক কাম্য পথে বর্দ্ধিতবেগে ছুটিয়া চলিবে।

তাই যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিষ্ঠুর আঘাতে সমাজ-দেহ ক্ষত করিতেছে, তখনও খাদি কর্ম্মীর চরকা-সেবায় একনিষ্ঠ থাকিবার হেতু ও আবশ্যকতা আছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুদিনের; কিন্তু ভারতের একান্ত হিত কল্পে এই দৈনিক দুঃখ নিবারণের ভার অন্য কর্ম্মীর উপর দিয়া খাদি-কর্ম্মীকে একনিষ্ঠ থাকিতে হইবে। খাদি কর্ম্মে সম্প্রদায় নাই—প্রাদেশিকতা নাই। ইহা নিখিল সমাজের ও নিখিল

ভারতের। আজ সাম্প্রদায়িক দুর্য্যোগের দিনে যেন ভগবানের নাম স্মরণ করিয়াই খাদি কর্ম্মীগণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির সামান্য মাত্র ত্যাগের দ্বারা যে মহৎ ফললাভ হইতে পারে, চরকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই চরকার দ্বারা যে সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অনুপম। স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে নবযুবকগণ জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া দুরূহ দুর্গম পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সে সকল পথে যুবকগণেরই বিশেষ কৃতিত্ব ও অধিকার। কিন্তু চরকার দ্বারা দেশ-সেবা করিবার অধিকার সবল দুর্ব্বল, নরনারী, ধনী নির্ধন সকলেরই আছে। তাই অন্য সকল পথের তুলনায় আজ এই চরকা দ্বারা দেশসেবার পথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গান্ধীজী গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে এই পথে আসিতে প্রেমভরে ডাকিতেছেন। কতবড় মহৎ সুযোগ, কি আনন্দের সংবাদ যে দেশের মুক্তি-কামনায় প্রত্যেকেই প্রতি দিনই কিছু না কিছু কাজ করিতে পারে। শারীরিক শ্রম দিয়া অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারে। চৈতন্যদেব প্রেমের বন্যায় বাংলা মাতাইয়া ছিলেন, গান্ধীজী প্রেমের বন্যায় আজ ভারতবর্ষ মগ্ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ঋষিদের তপস্যার ভিতর দিয়া প্রেমের আদর্শই চিরকাল জয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং চরকার এই আন্দোলনও যে এক দিন জয়যুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং তাহার ফলে নষ্ট শিল্পের তো উদ্ধার হইবেই, তাহা ছাড়া যে সভ্যতা হারাইয়া সে আজ ইয়োরোপের হীন অনুকরণে নিঃস্ব, রিক্ত —সে সভ্যতাও আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার আত্মার বলে, ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া ত্যাগের রথে চড়িয়াই ভারতবর্ষ পৃথিবীতে জয়যাত্রার পথে বাহির হইবে।

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(৪)

বালি হইতে ত্রিবেণী (১)

কলিকাতার পর হুগলী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে যে সব নগরী আছে, তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি বাঙ্গালার অন্যান্য বহু গ্রাম সকলের তুলনায় অধিক। তদ্ভিন্ন পাশাপাশি এতগুলি গণ্যমান্য গ্রাম ও নগরী অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। দেশ বৈদেশিক শাসনাধিকারে আসার পূর্ব্বের কোন কথাই প্রায় জানিতে পারা যায় না। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা পুঁথিতে মাত্র কতিপয়ের নাম পাওয়া যায়। সে সকল পুঁথির মধ্যে "কবিকঙ্কন চণ্ডী" ও বিপ্রদাস কৃত "মনসা মঙ্গলের" নাম করা যাইতে পারে। "পাণ্ডব দিগ্বিজয়" বা "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থেও (২) বহু প্রাচীন গ্রাম ও নগরের কথা পাওয়া যায় এবং স্থানে স্থানে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া আছে; কিন্তু উহা সব ভাগীরথী-তটবর্ত্তী স্থান নহে।

এই সকল স্থানের যে সব ঐতিহাসিক বা অন্যান্য পরিচয় আছে, তাহার সমস্ত কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নহে। মাত্র যে কিছু পুরাতন বিশেষ কথা, বা যাহার জন্য স্থানের প্রসিদ্ধি তাহার মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহাই অতি সংক্ষেপে বলা উদ্দেশ্য।

বালি বৈদেশিকগণের আগমনের বহু পূর্ব্বের সহর। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ইহার উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল। যে অষ্ট স্থান হইতে পূর্ব্বে বাঙ্গালা পঞ্জিকা প্রকাশিত হইত, বালি তাহার অন্যতম। শ্রীরামপুর এই খ্যাতি ইহার পরে অর্জ্জন

(১) এই প্রবন্ধের অনেক কথা Calcutta Review, vol. iv, 1845, notes on the Right Bank of the Hooghly নামক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

(২) ইহা প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা ব্রাহ্মণ-প্রধান নগরী। কথিত আছে, সহস্রাধিক ঘর ব্রাহ্মণের এখানে বাস ছিল। বালির উত্তর প্রান্তস্থিত ছোট দুইটি মন্দির বিশপ্ হিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

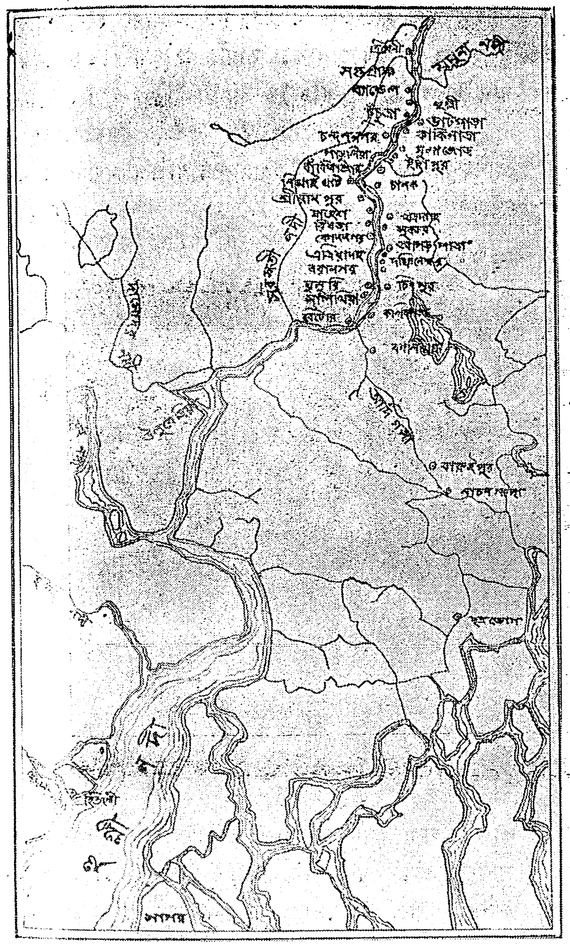

হুগলী নদী—দশম শতাব্দীর নক্সা

বিপ্রদাসকৃত মনসামঙ্গলে লিখিত—স্থানগুলি দেখান আছে।

বালিতে খালের উপর যে সেতু আছে উহা প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কাপ্তেন গুড্‌উইন (Captain Goodwin) নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গালায় এরূপ সুদৃঢ় ও সুন্দর অন্য কোনও সেতু কোথাও ছিল না। কিঞ্চিৎ ন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দেশী চিনির কাজ প্রবল ছিল।

এখানকার উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বংশের প্রথম গৌরব। তিনি প্রথম রেজিমেণ্টের একজন কেরাণীরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে প্রচুর ধনসঞ্চয় এবং তাহার অনেক অংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া কলেজ ও লাইব্রেরি তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। এই পুস্তকাগারের ন্যায় বড় ও মূল্যবান পুস্তকাগার বাঙ্গলায় খুব কমই আছে। এখানকার সকল প্রকার সমৃদ্ধির মূলে মুখোপাধ্যায়-বংশের বদান্যতা বিরাজিত। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩)

কোন্নগরও একটি পুরাতন স্থান। ইহাও পূর্ব্বে বেশ ধনজনপূর্ণ ছিল। তখন একটি ডক্ ছিল, উহা দ্বাদশ মন্দির ও ঘাটের উত্তরে অবস্থিত ছিল। উক্ত ঘাট ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরসুন্দর দত্ত। উল্লিখিত ডক্‌টি বাঙ্গালায় বৃটীশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

রিষড়ার সমৃদ্ধিও এখনকার তুলনায় পূর্ব্বে অধিক ছিল। এখানে সময় সময় দিনেমারদের জাহাজ লাগিত। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি সাহেবদের বড় ছাপা কাপড়ের কারখানা ছিল। এই কারখানা দীর্ঘকাল ধরিয়া একে একে বহু ইয়োরোপীয়ের হস্তান্তরিত হওয়ার পর বিশ্বম্ভর সেন নামক এক ব্যক্তির হাতে আইসে। এই ব্যক্তি মাসিক ৮৲।১০৲ টাকা বেতনে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে এই কার্য্যের দ্বারাই প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিলাতি কলের বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার এই ব্যবসা ক্রমে লোপ পায়। পরে উহার পরিবর্ত্তে রেশমি রুমাল ছাপার কাজ এই স্থানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়।

এখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের একটি পল্লীনিবাস ও তৎ-

(৩) District Gazetteers—Hughly.

সংলগ্ন সুন্দর উদ্যান ছিল। ইহাকে "রিষড়া হাউস্" বলিত। কথিত আছে, হেষ্টিংসের তথায় অবস্থানকালে তদীয় পত্নী স্বহস্তে এই উদ্যানে বহুসংখ্যক আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আজিও তথায় হেষ্টিংস ঘাট নামে একটি ঘাট দৃষ্ট হয়। কোন্নগর ও রিষড়ার নাম বিপ্রদাসের পুঁথিতে উল্লিখিত আছে।

মাহেশও একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও এই নামে এই নগর ছিল বলিয়া জানা যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরও এইরূপ পুরাতন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরীর পর এই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য যেরূপ

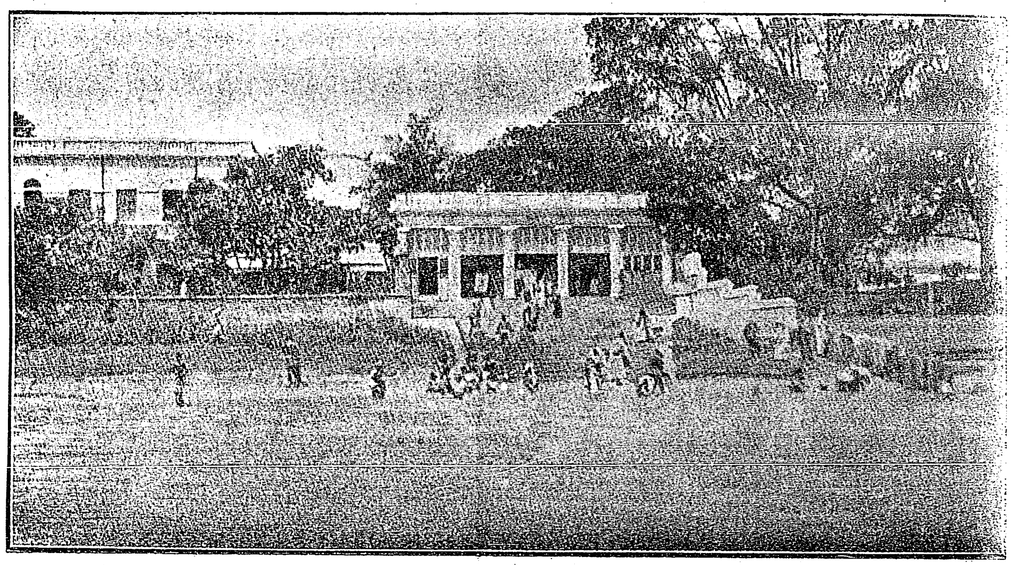

হেষ্টিংস ঘাট—রিষড়া

প্রচারিত, বোধ হয় অন্যত্র এরূপ নহে। কিংবদন্তী এইরূপ যে পুরী হইতে জগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেব-প্রতিষ্ঠা হইয়া তাহা স্মরণার্থ প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহা ধুমধামের সহিত স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরীতীর্থে গমন করিলে মাহেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং উহাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু দিন পরে এক দিন মুরশিদাবাদের নবাব ভাগীরথীবক্ষ দিয়া গমনকালে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ হওয়ায়, দেবসেবাইৎগণ তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়ায়, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া সেবাইৎকে অধিকারী উপাধি ও একখণ্ড নিষ্কর জমি দান করেন। এই সময় হইতেই মাহেশের মন্দিরের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। মাহেশের যে রথ সুপ্রসিদ্ধ তাহার প্রথমখানি এক মোদক দান করিয়াছিলেন। (৪)

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর জন্য প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, চাতরার রুদ্র পণ্ডিত দেবাদিষ্ট হওয়ায় তাঁহার দ্বারা গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা এই দেবমূর্ত্তি গঠিত হয়। এই প্রস্তর গঙ্গায় ভাসিয়া বল্লভপুরের ঘাটে আসিয়াছিল। উহা প্রথম যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তথা হইতে পরে স্থানান্তরিত হইয়া, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশের কোন মহাত্মার দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তমান মন্দিরে আনীত হন। রাধাবল্লভজী ও উহার মন্দির সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ রাধাবল্লভজীর একজন প্রধান

(৪) District Gazetteers—Hughly.

ভক্ত ছিলেন এবং তিনি এই দেবসেবাদির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

খৃষ্টান মিশনারীদের সংশ্রবেই শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার গঠনমূলে শ্রীরামপুরের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায় এখানকার প্রাচীন ইতিহাসও অজ্ঞাত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া হইতে দিনেমারদের এখানে আগমনের প্রসঙ্গেই উহার কথা জানা যায়। কার্য্যের সুবিধার জন্য মুরশিদাবাদের ফরাসী এজেণ্ট মসিয়ে ল' (Mons. Law)র চেষ্টায় নবাবের

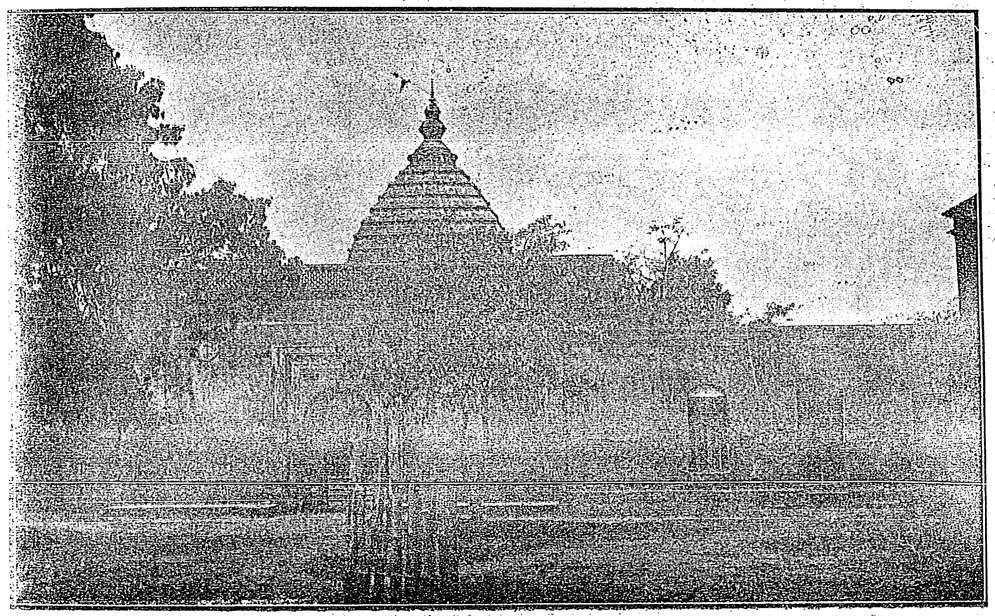

জগন্নাথ মন্দির—মাহেশ

নিকট হইতে তাঁহারা এই স্থান প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসরের ৮ই অক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরে দিনেমার পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য চারিজন জমাদার নিযুক্ত করা হয়। নবাবের নিকট হইতে ফরমান পাইতে ও জমি সংগ্রহ করিতে মোট ১৬ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছিল। দিনেমাররা মোট ৬০ বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিনেমাররা এখানে প্রথমে একখানি চালাঘর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহা মাটির প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া কুঠির কার্য্য আরম্ভ করেন। সে সময় তাঁহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ সোয়েৎম্যান্ (Mr. Soetman)। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা এখানে অব্যাহতভাবে ব্যবসাকার্য্য চালাইয়া সবিশেষ উন্নতিলাভ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের সহিত ডেন্‌মার্কের যুদ্ধ হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে প্রথম বাধা প্রাপ্ত হন। এই সময় ব্যারাকপুর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া শ্রীরামপুর দখল করে এবং ইহা ইংরাজদের হস্তগত হয়। পরে ইয়োরোপে শান্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উহা দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। এই সময় কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়। ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক হওয়ায়, ডেনমার্কের রাজা উহা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয়ের কল্পনা করেন; এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর শ্রীরামপুর ও ট্রানকোয়েবার, ঠিক ৯০ বৎসর ৩ দিনের পর ১২০০০ পাউণ্ডে হস্তান্তরিত হয়। শ্রীরামপুরকে ডেনমার্কের রাজার নামানুসারে তৎকালে ফ্রেড্রিক্‌নগরও বলা হইত।

১৭৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম খৃষ্টান্ মিশনারীরা আগমন করেন। তৎপরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্শম্যান্,

ওয়ার্ড ও তাঁহাদের দুইজন মিশনারী বন্ধু এখানে আগমন করেন। তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর বিবেচনায় প্রথম দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করেন। পরে ডেভিড্ ব্রাউনের (Rev. David Brown) চেষ্টায় এই ভ্রম সংশোধিত হয় এবং তাঁহারা এখানে বসবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় মত মালদহে ডাক্তার কেরির নিকট যাওয়ার চেষ্টায় তাঁহারা বাধা প্রাপ্ত হন এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের মধ্যেই বসবাস করিতে বাধ্য হন। কয়েক সপ্তাহ পরেই কেরি

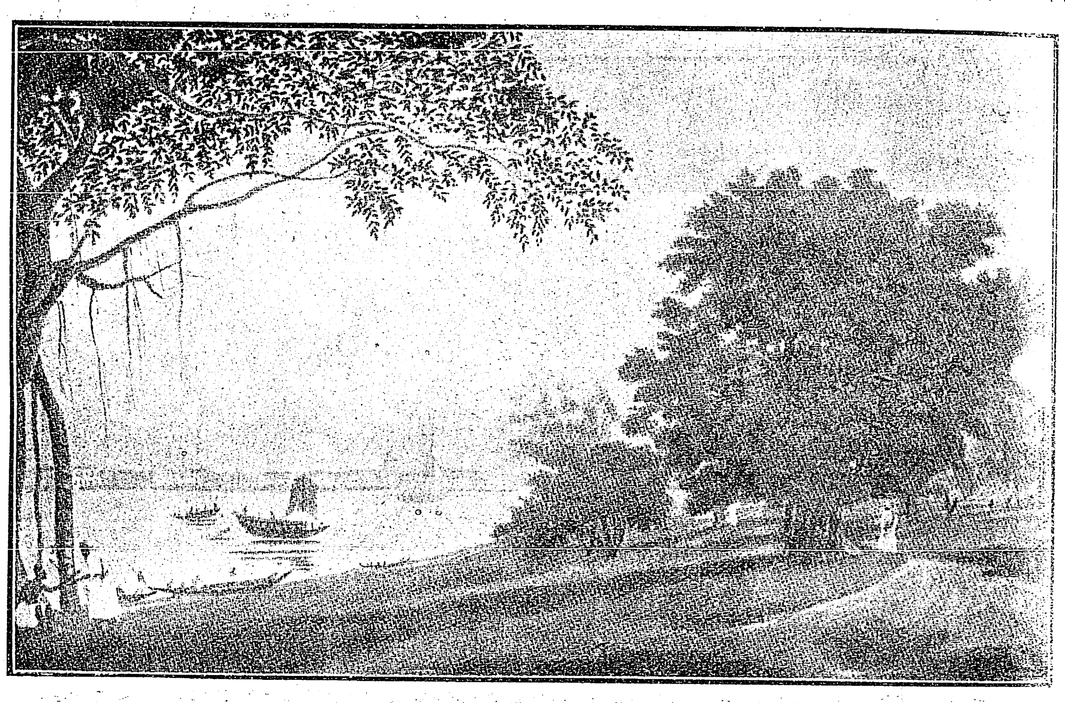

ব্যারাকপুর পার্ক হইতে শ্রীরামপুর

এখানে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এই তিনজনে মিলিয়া শ্রীরামপুর মিশনের সৃষ্টি করেন। এই মিশন, উহাদের মধ্যে শেষ মিশনারী মার্শম্যানের মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৮৩৭ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।

এই মহাত্মাত্রয়ের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিবার স্থান এখানে নাই। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় যেমন বাঙ্গালায় দেশীয়দের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তেমনই তাঁহাদের পরিশ্রমে বঙ্গভাষারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম বিষয় গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ এখান হইতে তাঁহারাই প্রকাশ করেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই প্রথম বাঙ্গালায় মিশনারী ছাপাখানা স্থাপিত হয়। মিশনারী মিঃ ম্যাকের চেষ্টায় প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র বাঙ্গালা অক্ষরে নাম সহ প্রকাশিত হয়। (৫) বৈদেশিকভাবে প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করিয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মার্শম্যান সম্পাদিত "সমাচার দর্পণ" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। (৬) Friend of Indiaও এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইত। এতদ্ভিন্ন ভারতে প্রথম ষ্টীম্ এঞ্জিন্ শ্রীরামপুরের কাগজের কলেই আনীত হয়। প্রথম বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষালাভ করে এই স্থানে। খৃষ্টানী মতে বাঙ্গালীর বিবাহ হয় প্রথম এইখানে। বর্ত্তমান শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের প্রতিষ্ঠার মূলও শ্রীরামপুরের ডাক্তার কেরি।

(৫) The Life and Times Carey, Marshman and Ward, vol. 11.

(৬) A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature—Long.

শ্রীরামপুর কলেজ মিশনারীদের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানকার গোরস্থানে এই তিন মহাত্মার সমাধি আজিও দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মিশনারীগণ ভিন্ন এখানে মিঃ ম্যাক্, ডেভিড্ ব্রাউন, মার্টিন্, কুরি, বুকানন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মিশনারীগণও বাস করিতেন। তাঁহাদের বহু নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানকার মিশন চার্চ্চ, ডাক্তার কেরি ও তাঁহার সহযোগীদের দ্বারা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বাসভবনের সংলগ্ন জমির উপর নির্ম্মিত হয়। রোম্যান ক্যাথলিক্ গির্জ্জা সর্ব্বপ্রথম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্রাকারে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান সুন্দর গির্জ্জাটি ১৩৩৬৲ টাকা ব্যয়ে ইং ১৭৭৬ সালে প্রস্তুত হয়। লুথেরান গির্জ্জা ১৮০৫ অব্দে ১৮৫০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। কনভেণ্টটি অপেক্ষাকৃত নূতন, উহার নির্ম্মাণকাল ১৮৪০এর পর।

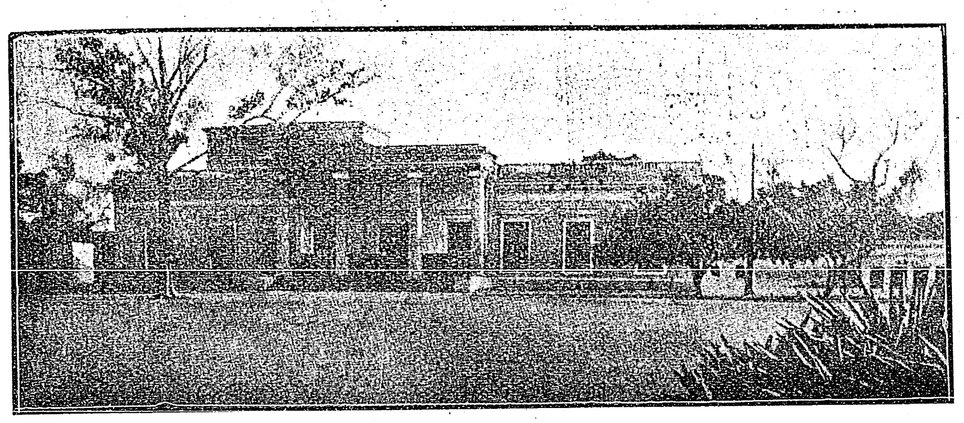

দিনেমার গভর্ণরের বাটী—শ্রীরামপুর; এক্ষণে কাছারীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে চন্দ্রের পুত্র ধরাধর গোস্বামী-বংশের আদিপুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামে ইঁহাদের আদি বাস ছিল। সেওড়াফুলি ও বংশবাটীর রাজাদের আদি বাসস্থানও এই স্থানে ছিল। গোস্বামীদের প্রকৃত উপাধি চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী শান্তিপুরের গোস্বামী বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামগোবিন্দ মাতুলের জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায়, তিনিই প্রথম গোস্বামী নামে খ্যাত হন। কথিত আছে, একদা নৌকা জলমগ্ন হইলে তিনি সন্তরণ করিয়া শ্রীরামপুরে উঠেন এবং তদবধি এই স্থানে বাস করেন। সুতরাং তাঁহাকেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি বাসের জন্য সেওড়াফুলির রাজাদের নিকট হইতে জমি প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক

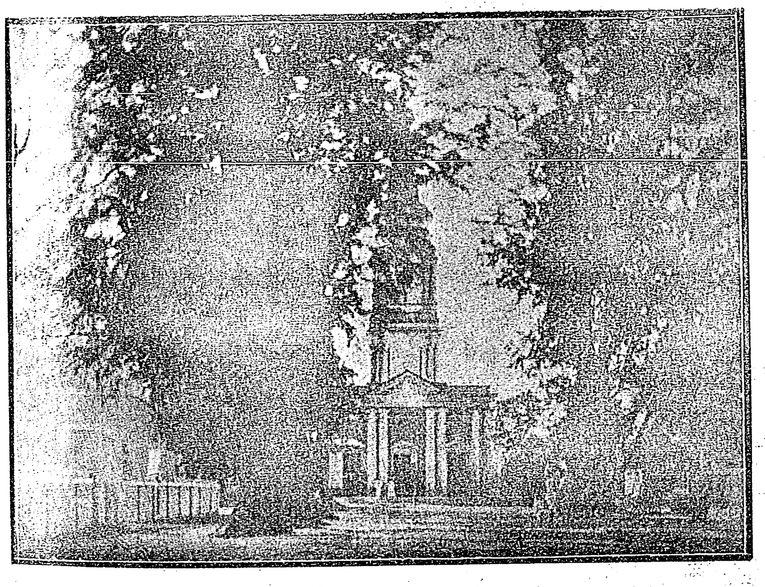

শ্রীরামপুরের গির্জ্জা

শ্রীশ্রী রাধামোহন, গোপাল ও রাধিকা এই তিন দেব-দেবীর সেবাইৎ নিযুক্ত হন ও তৎসহিত উক্ত রাজার প্রদত্ত নিষ্কর দেবোত্তর জমি প্রাপ্ত হন। এখনও এই তিন

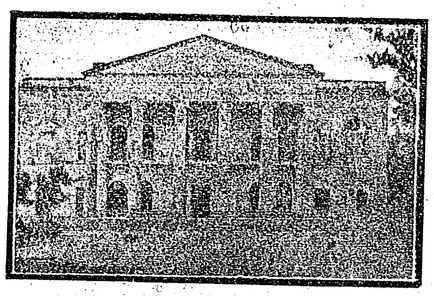

শ্রীরামপুর কলেজ

দেব দেবী গোস্বামীবংশের গৃহদেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

রামগোবিন্দের পুত্র হরিনারায়ণ দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

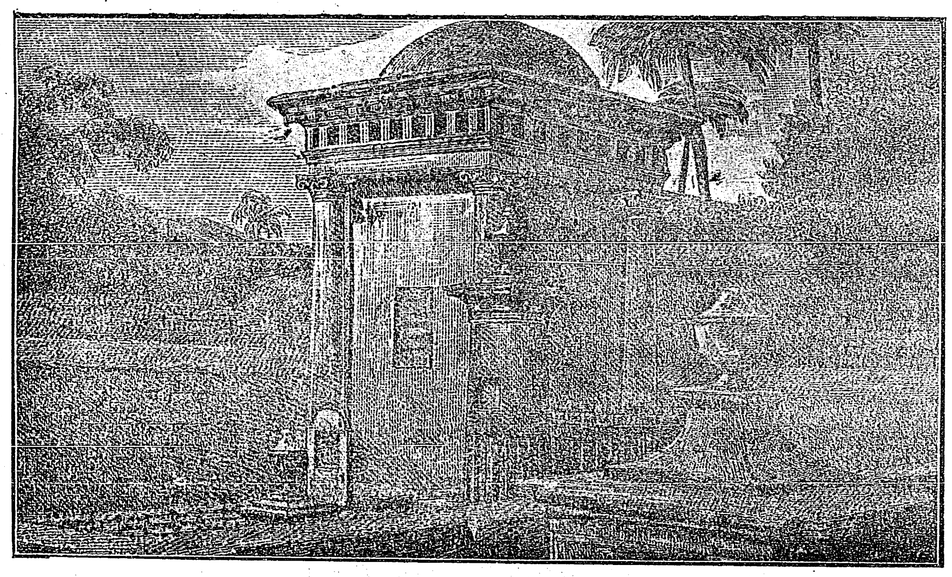

ডাক্তার কেরির সমাধি-স্তম্ভ—শ্রীরামপুর

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথও পামার কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি হইয়া, এবং ব্যবসা কার্য্যের দ্বারা বিস্তর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ডেন্‌মার্ক্-অধিপতি যখন শ্রীরামপুর বিক্রয়ের অভিলাষ করেন, তিনি দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় উহা খরিদ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন নাই। (৭)

এখানকার দে-বংশও খুব প্রাচীন ও সম্পদশালী। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দমদমার নিকটবর্ত্তী গাঁতি নাম গ্রামে ইঁহাদের আদিম বাস ছিল। তৎপরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রিষড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র দে ব্যবসায় উপলক্ষে শ্রীরামপুরে উঠিয়া আইসেন। উক্ত দে মহাশয়ের একখানি মুদির দোকান ছিল। তাঁহার পুত্র সাথলীরাম তুলার ব্যবসা ও দিনেমার কোম্পানী আনীত বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। তিনি কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের লবণের কাজে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করিয়া, শেষে নিজ চেষ্টা ও কার্য্যদক্ষতায় লবণের ব্যবসা দ্বারা বিপুল সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং উপার্জ্জিত অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। ১২৩০ সালের আষাঢ় মাসে রামচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। তাঁহার

(৭) District Gazetteers—Hughly.

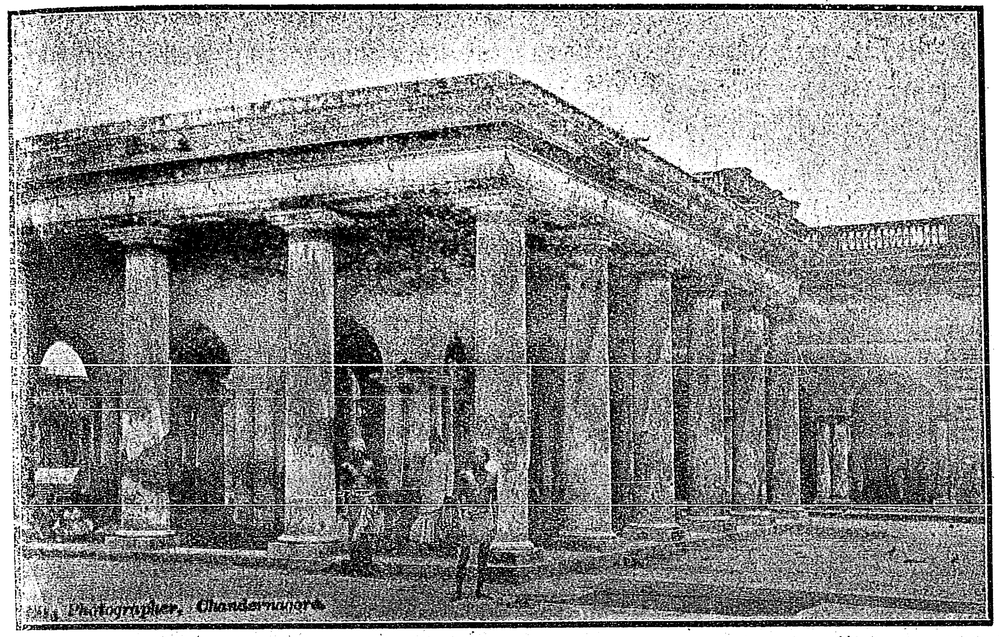

নিস্তারিনী-কালীমন্দির—সেওড়াফুলি

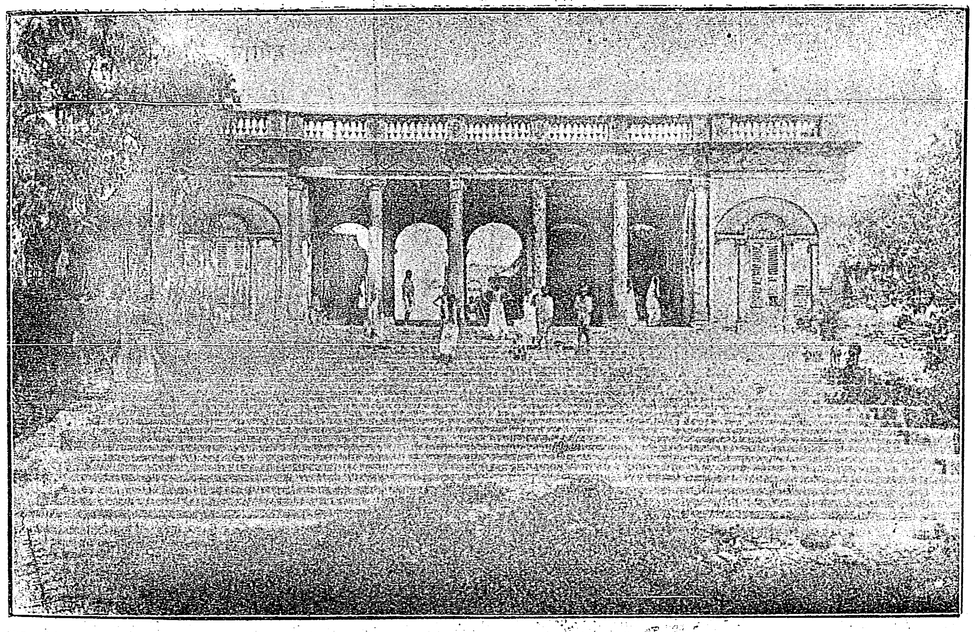

নিমাইতীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটী

সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়া এই বংশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

এই দে-বংশ পূর্ব্বাপর অত্যন্ত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। শ্রীরামপুরস্থ যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহেই প্রায় ইঁহাদের অর্থসাহায্য আছে। শ্রীরামপুরে শ্রীশ্রী৺কালী-

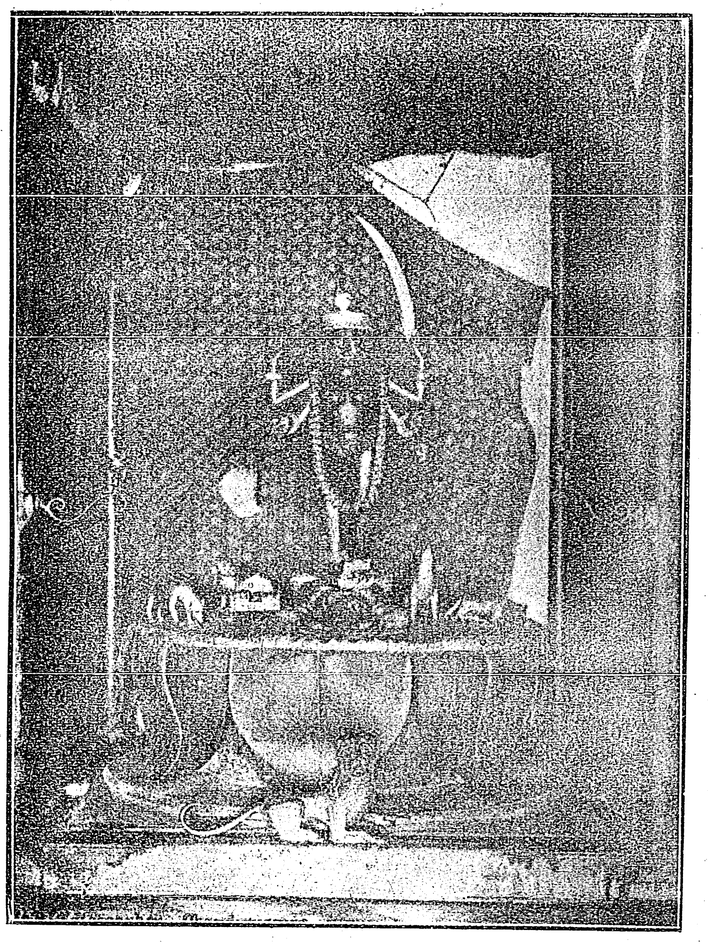

শ্রীশ্রীনিস্তারিনী কালী—সেওড়াফুলি

মাতার পূজার জন্য এক সুবৃহৎ মণ্ডপ ও কাশীতে শ্রীশ্রী৺শিব স্থাপন ইহাঁদের অন্যতম কীর্ত্তি। (৮)

শ্রীরামপুরের পর চাতরা। এখানে উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। তৎপরে সেওড়াফুলি। এখানকার হাট ও কালীবাটী প্রসিদ্ধ। এই উভয়েরই প্রতিষ্ঠাতা সেওড়াফুলির রাজারা। বৈদ্যবাটীর পুরাতন ও সমৃদ্ধ হাটের প্রচুর আয় দৃষ্টে উক্ত বংশের প্রধান হরিশ্চন্দ্র প্রতিযোগিতা করিয়া এই বাজার স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বোক্ত নিস্তারিণী নামে এক অতি সুগঠিত কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির ও মূর্ত্তি গঠন কার্য্যে তাঁহার দশ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই কালী দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সেওড়াফুলির রাজারা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইঁহাদের আদি বাস ছিল কাটোয়ার অনতিদূরে পাটুলি নামক গ্রামে। মুসলমান রাজত্বকালে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায় কোন ব্রাহ্মণ জমিদারকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করার জন্য, মুরশিদ কুলিখাঁর সময়ে নবাব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বংশগত "সুদ্রমনি" উপাধি প্রদান করেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা এই উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এমন বিখ্যাত মন্দির এ অঞ্চলে কমই আছে, যাহা কখন না কখন তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াছে। মাহেশের জগন্নাথদেবের সেবার্থ জগন্নাথপুর নামক পল্লী তিনি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

সেওড়াফুলির উত্তরে বৈদ্যবাটী। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু বৈদ্যের বাস থাকায় বৈদ্যবাটী নামের উৎপত্তি। বৈদ্যবাটীর যে প্রসিদ্ধ হাট আজিও বর্ত্তমান আছে, পূর্ব্বোক্ত সেওড়াফুলির বাজার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে পাট ও তরিতরকারীর এতাদৃশ হাট আর কোথাও ছিল না। এখনও কলা ও কুমড়ার এতাদৃশ হাট এ অঞ্চলে আর আছে কি না সন্দেহ। এখানকার শ্রীশ্রীভদ্রকালী অতি প্রাচীন দেবতা। সুপ্রসিদ্ধ নিমাই তীর্থের ঘাটটিও

(৮) বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা, ১৩৩২ সাল।

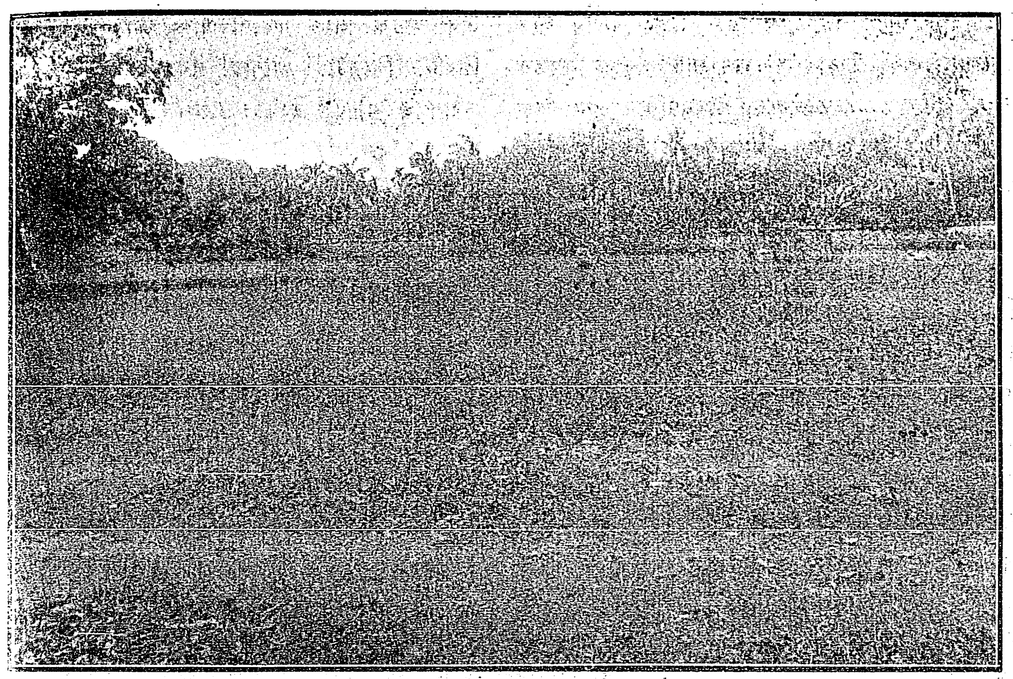

চাঁপদানীর মাঠ—কথিত আছে—এই স্থানে ছাউনি ছিল।

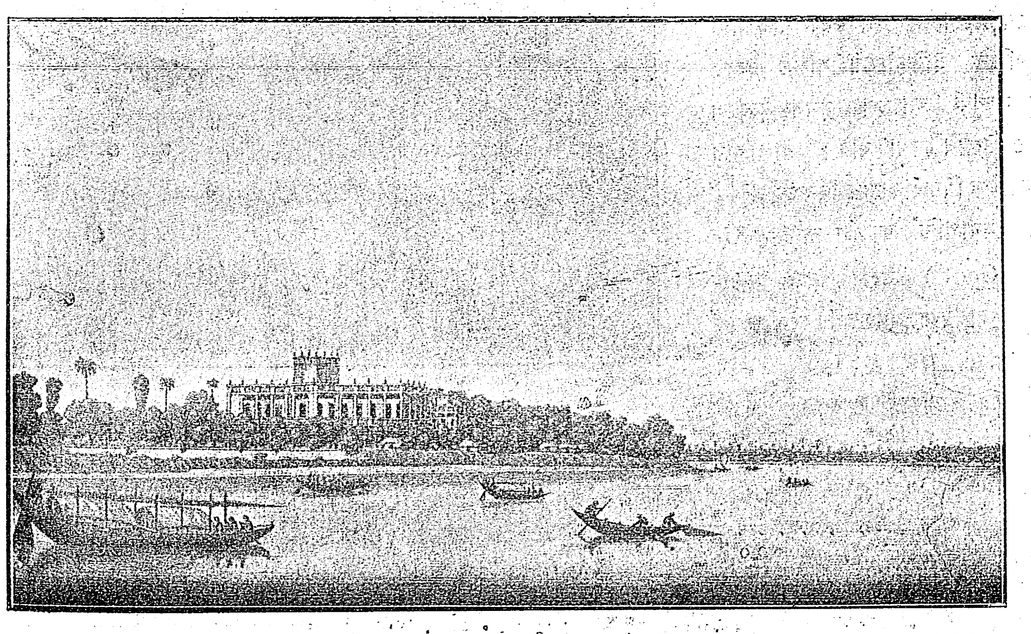

গরুটি প্রাসাদ

খুব প্রাচীন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শনার্থ যাইবার কালে গঙ্গাতীরে এই ঘাটে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার আদেশে ঘাট সান্নিধ্যে নিম্বতরু রোপিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনচরিতে এবং অন্য বাঙ্গালা কবিতায় এরূপও লেখা আছে—এই নিমগাছ-ঘটিত ব্যাপার হইতে তাঁহার অন্য নাম নিমাই হইয়াছে। (৯)

এখানকার পুরাতন ঘাটটি পরে সংস্কৃত করা হয় এবং উহার উপর চাঁদনী নির্ম্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি ও বারুণীর সময় এখানে দুইটি বড় মেলা হইয়া থাকে। উক্ত চাঁদনী প্রভৃতি চন্দননগরের স্বনামধন্য কাশীনাথ কুণ্ডুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্যে পথিকদের জন্য ডাক্-বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রথম এই বৈদ্যবাটীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১০) বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের সহিত এই স্থানের সম্পর্ক আছে। (১১)

বৈদ্যবাটীর পর চাঁপদানী। এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রসিদ্ধি তেমন না থাকিলেও ইহা একটি প্রাচীন স্থান এবং বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত ইহার একটু সম্পর্ক আছে। মনসা মঙ্গলে ইহারও উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবনাজিম মিরজাফরের নিকট হইতে প্রধান সেনাপতি কর্নেল্ কুট্ (Sir Eyre Coot) ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাইদার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রেরণ জন্য, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে প্রেরিত সৈন্যের অবশিষ্ট সৈন্য পরিদর্শনার্থ হেষ্টিংস্ এই স্থানে আসিয়াছিলেন। (১২) পূর্ব্বকালে এই স্থান ডাকাতি ও খুনের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল।

এই স্থানের পর গৌরহাটী। ইহার কতক অংশ বৃটীশ এবং কতক অংশ ফরাসী দ্বারা অধিকৃত। এই স্থানকে গিরটি, গিরেটা, আবার কেহ বা গরুটি বলিয়াছেন। ফরাসগঞ্জ নামেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১৩) বোল্টের ম্যাপ, জোসেফ্ সার্ভে ম্যাপ প্রভৃতি পুরাতন মানচিত্রে এই স্থান ফ্রেঞ্চ্ গার্ডেন বলিয়া উল্লিখিত

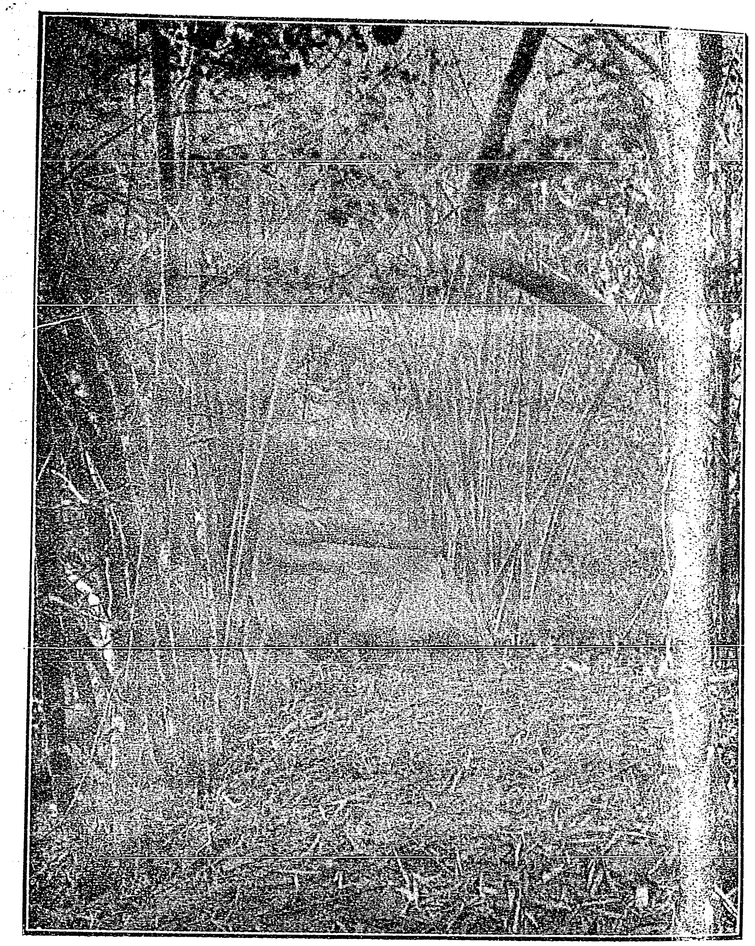

গরুটি প্রাসাদের শেষ চিহ্ন

আছে। সচরাচর লোকে ইহাকে গরুটি বলিয়া থাকে।

এই স্থানটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ইহা এক সময় চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণর

(৯) District Gazetteers—Hughly.
(১০) Rural Life in Bengal.
(১১) District Gazetteers—Hughly.
(১২) District Gazetteers—Hughly.
(১৩) District Gazetteers—Hughly.

দুপ্লের একটি রম্য উদ্যানভবন বা পল্লীবাস ছিল। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে গভর্ণরের নিমন্ত্রণে ক্লাইব, ভিন্সিটার্ট, হেষ্টিংস, স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্, ফিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রমুখ চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার ইয়োরোপীয় সৌখিন নরনারীগণের সর্ব্বদা

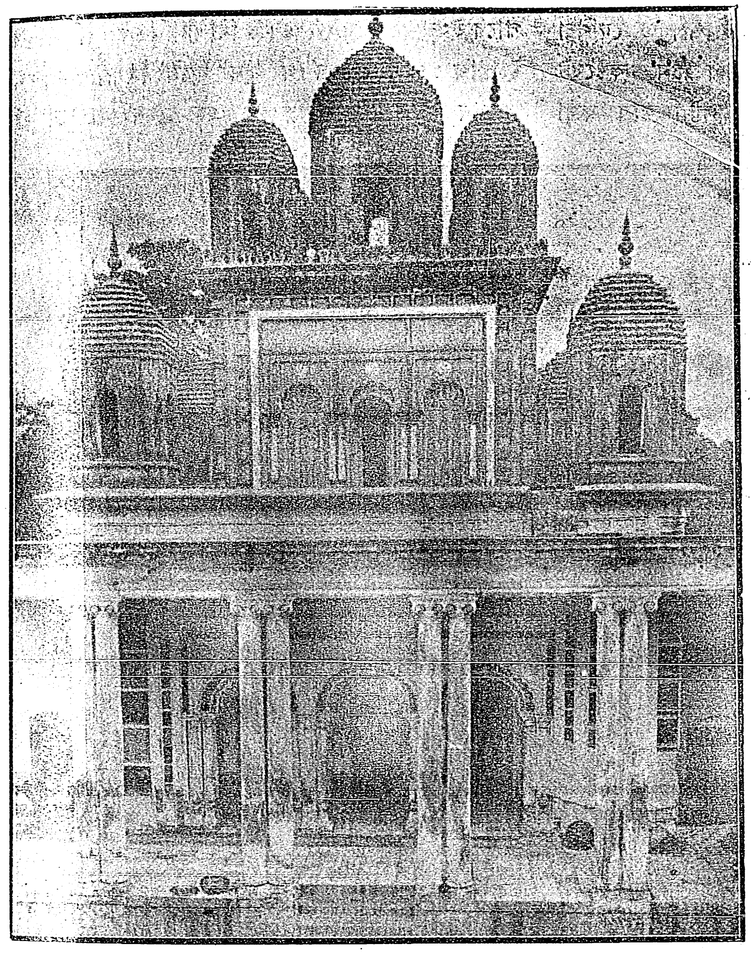

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির—তেলিনীপাড়া

সম্মিলন হইত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা সময় সময় নিমন্ত্রিতগণের শতাধিক যানাদিতে পরিপূর্ণ থাকিত। (১৪) এই ভবন যেমন আনন্দ আড়ম্বরে সদা মুখরিত থাকিত, সেই রূপ রাজ্য-সংক্রান্ত পরামর্শ-দির জন্য মিলনেরও ইহা স্থান ছিল।

এই প্রাসাদের মধ্যে একটি এতবড় হল ছিল, যাহার মধ্যে একসঙ্গে একশত নরনারী স্বচ্ছন্দে পান-ভোজন করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ৩৬ ফিট ছিল। এই সুসজ্জিত বিচিত্র গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে অকস্মাৎ ভার্সেইএর কোন কোন সম্ভ্রান্ত পল্লী-নিবাসের কথা মনে হইত। এমন কি, এই পল্লীকে কেহ কেহ পূর্ব্বের ভার্সেই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রাঁপ্রি (১৫) (Grandpre) ও কুরি (১৬) (Right Rev. Daniel Currie) এই প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবন বলিয়াছেন। যে দেশে তাজমহল আছে, যে দেশের দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরে মুসলমান বাদশাহদের অনুপম প্রাসাদ সকল অবস্থিত, যাহার স্থাপত্যের স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য সকলেরও উপর বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সেখানে অবশ্য এ কথার কোন বিশেষ অর্থ আছে মনে হয় না। মনে হয়, লেখকের বলিবার উদ্দেশ্য, তৎকালীন ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত এ দেশের ইয়োরোপীয় ধরণের অট্টালিকা সমূহের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পল্লী-আবাসের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া ঐতিহাসিক মার্শম্যান্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজেদ সমূহ দর্শনে দর্শকের

(১৪) Selections from unpublished Records of Government for the year 1748 to 1767.

(১৫) A voyage in the Indian Ocean and Bengal undertaken in the years 1789 and 1790.
(১৬) Heber's journey through the upper Provinces of India.

মনে উহার পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এরূপ দুঃখের নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গর্ভর্ণরের ভগ্ন-প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটীর বাগান।

বিশপ কুরি ভারত-ভ্রমণ কালে এই পরিত্যক্ত অসংস্কৃত প্রাসাদের সুন্দর সোপান, বৈচিত্র্যময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভ সকল, বিবিধ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বোর্ডিমণ্ট প্রভৃতি দেখিয়া বিলাতের শ্রপসায়ারের ধ্বংসপ্রায় মোরেটন করবেট (Moreton Corbet) নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা

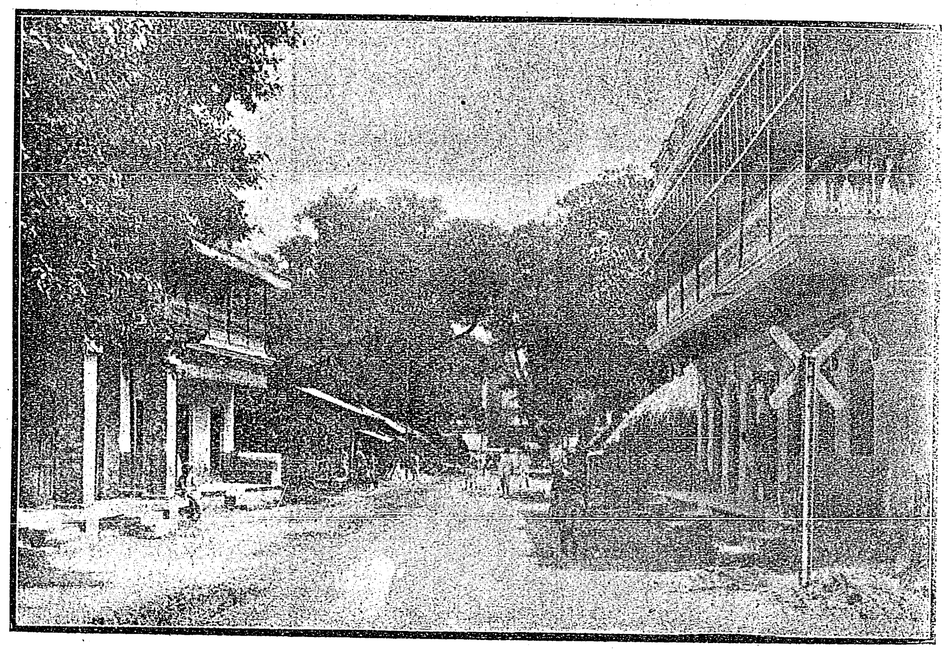

বর্ত্তমান গরুটি

তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, এই প্রদেশের মধ্যে ইহাই পতনোন্মুখ উন্নতির একমাত্র (১৭) নিদর্শন। ফরাসী গভর্ণর মসিয়ে শেভালিয়ে (Mons Chevelier) ইহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইহাকে একবার সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা আক্রান্ত হইলে তিনি এই স্থান হইতেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন।

(১৭) Heber's journey through the upper Provinces of India .

গৌরহাটীর পূর্ব্ব কথা, এমন কি কিরূপে তাহা ফরাসীদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার কিছুই জানা যায় না। মোটামুটি পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদের সহিতই ইহার ইতিহাস বিজড়িত। তদ্ভিন্ন ক্লাইবের সময় বাঙ্গালার সৈন্যদলের অধিক অংশ সময় সময় এই স্থানে থাকিত বলিয়া জানা যায়। ষ্ট্রাভোরিনস্ (Stravorinus) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক লোক থাকিতে পারে ইংরাজদের এমন একটি মিলিটারি দুর্গ দেখিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৭৫৭ অব্দের মে জুন মাসে মিরজাফরের সহিত গোপন সন্ধির উদ্দেশ্য ক্লাইব এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন তিনি এই স্থান হইতেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া পলাশী প্রাঙ্গণে জয়লাভ দ্বারা ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। (১৮)

প্রাচীন কালের গৌরবময় যুগে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী কবি আণ্টুনি সাহেব এক হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতেন।

(১৮) District Gazetteers—Hughly. The Musnud of Murshidabad ও অন্য কোন কোন গ্রন্থে ১৩ই জুন লেখা আছে।

এই পল্লীর পরই ভদ্রেশ্বর। বিপ্রদাসের কবিতায় ভদ্রেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী৺ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ভদ্রেশ্বরের বাজারের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। এই দেবতার নাম হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। বুদেসি নামেও এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এত বড় বাজার আর কোথাও ছিল না। কলিকাতা ও ভদ্রেশ্বরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ ক্রোশের সকল স্থানের ধান চাউল এই স্থান হইতে সরবরাহ হইত। পাটের ব্যবসাও এখানে যথেষ্ট ছিল। ভদ্রেশ্বর দেবের উৎপত্তির বিবরণ অজ্ঞাত। সাধারণের বিশ্বাস—ইনি কাশীর বিশ্বেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথ দেবের ন্যায় স্বয়ম্ভু। এই স্থানে এক সময় সংস্কৃত শিক্ষার চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল এবং শিক্ষার জন্য ১০টি টোল ছিল। (১৯)

ভদ্রেশ্বর অতিক্রম করিয়া চন্দননগরের মধ্যে তেলিনী-পাড়া নামক একটি ছোট গ্রাম আছে। এখানকার পুরাতন কথা বা প্রসিদ্ধির বিষয় কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা মন্দির প্রসিদ্ধ। এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই এই বংশের উন্নতি হয়। ক্রমশঃ—

(১৯) Adam's Report on vernacular education in Bengal.

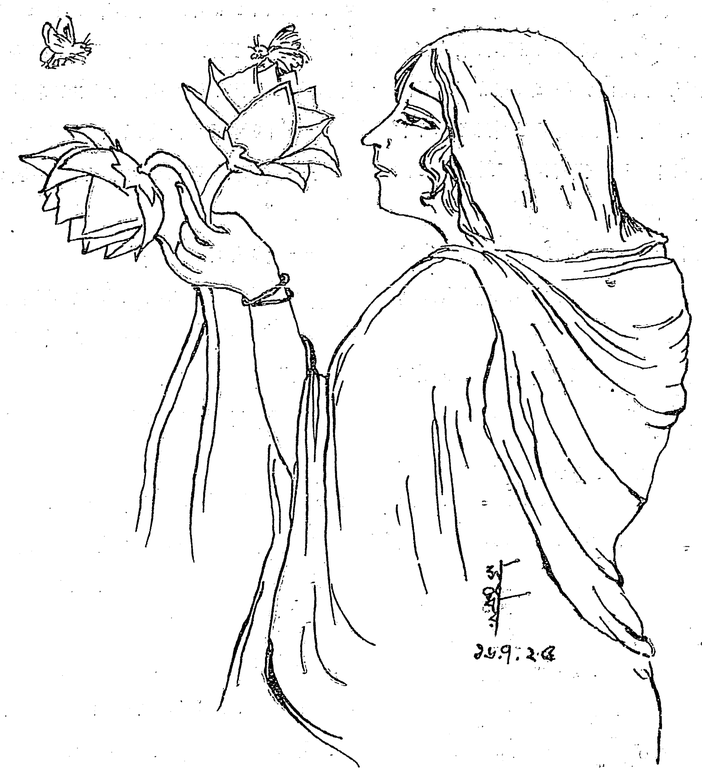

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর মধুলুব্ধ

তিন অঙ্ক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম

রঙ্গালয়,—নাটকের প্রথম অঙ্কের পরে তখন যবনিকা পড়েছে।

'কন্‌সার্ট' বাজছিল—সপ্তপাতালভেদী ভীষণ নিনাদে! ত্রেতাযুগে বোধ করি বাংলা রঙ্গালয়ের 'কন্‌সার্টে'র অস্তিত্ব ছিল না, কারণ তাহ'লে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গের জন্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণকে নিশ্চয়ই বেশী আয়াস স্বীকার করতে হ'ত না!

চারু বললে, "ওহে চন্দর, এখানে তো আর ব'সে থাকা অসম্ভব! চল, বাইরে পালাই চল!"

চন্দ্র একটি 'বক্সে'র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললে, "চারু, আমি যেদিকে চেয়ে আছি, সেইদিকে একবার তাকাও দেখি, 'কন্‌সার্টে'র অস্তিত্ব আর তোমার মনেও থাকবে না!"

চারু সেইদিকে তাকালে। যা দেখলে, তাতে তার চোখ হয়ে গেল একেবারে নিষ্পলক!

'বক্সে' এক সুন্দরী ব'সে আছে—যদিও ব্যাপারটা খুবই সাধারণ! তবে এর মধ্যে যদি অসাধারণতা কিছু থাকে, তবে তা আছে ঐ সুন্দরীর সৌন্দর্য্য!

পৃথিবীতে সুন্দরী আছে অনেক, কিন্তু সকলেই কি সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করতে জানে?

ইতিহাস বলে, মিসরে ও রোমে এমন সুন্দরী ছিল অসংখ্য, ক্লিওপেট্রা যাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য ছিল না। কিন্তু ক্লিওপেট্রার রূপ বার বার দিগ্বিজয় করেছিল সেই মিসরে এবং রোমেই!

দেহকে কি-ক'রে চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা যায়, সে হচ্ছে এক অদ্ভুত আর্ট!

চারু যার দিকে এমন পলক-হারা চোখে তাকিয়ে আছে, এই দুর্লভ আর্ট সে জানে!

চারু মোহিত স্বরে বললে, "চন্দর, এযে আশ্চর্য্য রূপ! এ কে ভাই?"

চন্দ্র বললে, "ডাইনি কিরণ।"

চারু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ডাইনি কিরণ?"

—"হাঁ, কলকাতার এক বিখ্যাত বিলাসিনী। এর নৈশ নিকেতনে আজ পর্য্যন্ত কত হৃদয় ভগ্ন হয়েচে, তার হিসাব কেউ রাখতে পারে-নি!"

—"এমন সুন্দরীর এমন নাম!"

—"হ্যাঁ, কারণ এর আঁচল একবার যার পায়ে জড়িয়েচে, সে আর কখনো মুক্তি পায় নি। আমি অন্তত দশজন এমন বিখ্যাত ধনীকে জানি, এর জন্যে যারা আজ পথের ভিখারী! লোকে বলে, ডাইনি কিরণের বুকের তলায় হৃদয় ব'লে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই।"

—"কিন্তু ওর পিছনে ব'সে আছে ও কে?"

—"কুমার নরেন্দ্রনাথ রায়—ডাইনি কিরণের নতুন শিকার।"

—"খুব ধনী বুঝি?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু ও ধনদৌলৎ আর বেশীদিন থাকবে না, ইতিমধ্যেই কুমারের লোহার সিন্ধুকে বোধ হয় ভাঙন ধরেচে।"

"কেন, কুমারকে সাবধান করবার কেউ কি নেই?"

—"সাবধান ক'রে ফল হয় নি। পতঙ্গ যে নিজ্ঞানেই আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দেয়! কুমার বিবাহ করেচেন, তাঁর সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবই রয়েচে, কিন্তু তিনি তাদের দিকে ফিরে চেয়ে দেখবার অবকাশ পান না।"

—"কি অন্যায়!"

—"তুমি শুন্‌লে অবাক হবে যে, অর্থাভাবে কুমারের স্ত্রীর কষ্টের আর অবধি নেই। নিজের আর ছেলে-মেয়ের জন্যে স্বামীর কাছ থেকে তিনি তো একটি কানাকড়িও পান না, কাজেই তাঁকে ধার করে খরচ চালাতে হয়!"

—"কেন, কুমারে স্ত্রীর কি কোন আত্মীয় নেই?"

—"এক ধনী খুড়ো আছেন, মধুবাবু। তাঁর অনেক টাকা, তিনি বিবাহ করেন নি। শুনতে পাই, তাঁর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হচ্ছেন না কি কুমারের স্ত্রী।"

—"তবে?"

—"কিন্তু মধুবাবুর কাছ থেকে কুমারের স্ত্রী এখন পর্য্যন্ত কোনই সাহায্য পান-নি।"

—"তুমি এত কথা কি ক'রে জান্‌লে চন্দর?"

—"কুমার যে আমার প্রতিবেশী।"

চারু আর একবার 'বক্সে'র দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সর্ব্বাঙ্গে রূপ, রত্ন আর বিচিত্র বর্ণের চমক নিয়ে সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে; তার মুখে অতি মৃদু হাসির লীলা! চারু, লিওনার্ডো ডা ভিন্সির আঁকা মোনালিসার প্রসিদ্ধ ছবি দেখেছিল। তার মনে হ'ল এ হাসি সেই মোনালিসার হাসির মতই রহস্যের আবরণে ঢাকা!

ঠিক পিছনেই ব'সে আছেন, কুমার। চারিদিক থেকে শত শত নেত্র যে আগ্রহ-ব্যাকুল হয়ে তাঁর সঙ্গিনীর দিকে ছুটে আসছে, এজন্যে তাঁর মন গর্ব্বে আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল! কারণ কুমারের বিশ্বাস, এই যে সার্ব্বজনীন দর্শন-লালসা, এটা মৌন বিস্ময়ে তাঁরই পছন্দের তারিফ করছে!

চারু ভাবতে লাগল, ইউরিপাইড্‌সের মতই ঠিক। মনুষ্য সৃষ্টির ভিন্ন একটা উপায় ক'রে ভগবানের উচিত, দুনিয়া থেকে স্ত্রীজাতিকে একেবারে লুপ্ত ক'রে দেওয়া!

দ্বিতীয়

একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে শুয়ে আছে, কিরণ। টুক্‌টুকে 'স্লিপার'-পরা পা দুখানি রয়েছে ঘরের মেঝেতে ছড়ানো একখানা বাঘের ছালের উপরে। একটা লোমশ কুকুর তার পায়ের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে, নিজের পেটের ভিতরে মুখ গুঁজে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।

দ্বারবান এসে কিরণের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

কিরণ খামখানা চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেখলে, শিরোনামার লেখা স্ত্রীলোকের হাতের। লেখাটাও অচেনা।

"পুরুষের চিঠিই বরাবর পাই। এ চিঠি কে লিখলে?" —ভাবতে ভাবতে সে খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করলে। তার পর পড়তে লাগল,

"শ্রীমতী কিরণমালা,

আমরা কেউ পরস্পরকে দেখি-নি, কিন্তু আমরা দুজনেই বোধ হয় দুজনের নাম জানি। আপনি কুমার"—" বাবুর প্রিয়তমা, আর আমি হচ্ছি তাঁরই উপেক্ষিতা, অভাগিনী সহধর্ম্মিণী।"

চিঠি থেকে মুখ তুলে কিরণ খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর আবার চিঠির উপরে দৃষ্টিপাত করলে—

"মনের কি অবস্থা নিয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি, ভগবান তা জানেন। হয় তো আপনিও তা কিছু-কিছু বুঝতে পারবেন, কারণ নারীর মন বোধ হয় নারীর কাছে লুকানো থাকে না।

আমার স্বামীকে মুক্তি দিন—পৃথিবীতে আরো অনেক পুরুষ আছে!

তাঁর সম্পত্তির প্রায় সবই গেছে, যা আছে তাও যেতে বসেছে। তাঁকে এখনো না ছেড়ে দিলে পুত্র-কন্যার হাত ধ'রে আমাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

আমার এই কাতর ভিক্ষায় যদি আপনার মনে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহ'লে আপনি যাহাই হোন—আপনাকে আমি চিরদিন দেবী ব'লে মনে করব।

আর কিছু আমি বলতে চাই না। ইতি—

নিবেদিকা

শ্রীমতী কনকলতা দেবী।"

কিরণ আবার ভাবতে লাগল.....মনের ভিতরে লজ্জা ও ধিক্কারের কত-বড় আঘাত নিয়ে যে একজন পতিব্রতা সতী তার মত কোন নারীকে এমন পত্র লিখতে পারেন, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা কি তার আছে?.....

নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল। অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সবে সে যৌবনে পা দিয়েছে। রাতের পর রাত কেটে গেছে, তার স্বামী বাড়ীতে ফেরেন নি, তার চোখে ঘুম নেই। যেদিন স্বামীর দেখা পেয়েছে, সেদিন তার কি নির্য্যাতন! একে একে তার সমস্ত গহনা কোন্ উপদেবীর পূজার জন্যে অদৃশ্য হয়েছে, তবু সে স্বামীর মন পায় নি।

তারপর আর সইতে না পেরে, একদিন সে গৃহত্যাগ করলে,—মনের ভিতরে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, জগতের কোন পুরুষকে আর সে ক্ষমা করবে না!.....

কিরণ হঠাৎ নিজের মনে উচ্চ-স্বরে হেসে উঠল!

পিছন থেকে শোনা গেল—"ও কি, পাগল হ'লে না কি, অত হাস্‌চ কেন?"

কিরণ মুখ ফিরিয়ে দেখলে, কুমার নরেন্দ্রনাথ কখন্ ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে!

সে হাসতে হাসতেই বললে, "তোমার স্ত্রীর চিঠি প'ড়ে হাসচি।"

নরেন ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "আমার স্ত্রীর চিঠি?"

—"হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী আমাকে চিঠি লিখেচে।"

—"বটে, এত-বড় আস্পর্দ্ধা! কৈ, দেখি!"

—"না, এ চিঠি তোমার দেখবার কোন অধিকার নেই।"

—"কিন্তু কি লিখেছে সে?"

—"তাও আমি বল্‌ব না!"

নরেন নীরবে নিজের ওষ্ঠ দংশন করলে।

কিরণ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "শুন্‌চি তোমার বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা না কি বড়ই খারাপ হয়ে পড়েচে?"

নরেন গর্জ্জন ক'রে বললে, "কে বললে এ কথা? নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী চিঠিতে—"

বাধা দিয়ে কিরণ অধীর স্বরে বললে, "আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!"

—"না, না, সমস্ত মিছে কথা! তুমি বিশ্বাস কোরো না কিরণ!"

—"বেশ, তোমার অবস্থা যদি এতই ভালো, তাহ'লে কাল দোকানে যে মুক্তার মালা দেখে এসেছি, সেই ছড়া আজ আমাকে কিনে দাও!"

নরেনের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "তার যে অনেক দাম!"

—"দাম! দামের খোঁজে আমার দরকার কি! সে মুক্তার মালা আমার পছন্দ হয়েচে, তাই-ই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

—"কিন্তু এই গেল সপ্তাহেই আমি যে তোমাকে দশ হাজার টাকার জিনিষ কিনে দিয়েচি। তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখ!"

কিরণ আবার হা হা ক'রে হেসে উঠে বললে, "বিবেচনা? আমি ও-সবের ধার ধারি না—বুঝেছ? তাই তো আমার নাম ডাইনি কিরণ! দয়া-মায়া-বিবেচনার দরকার থাকে তো অন্য যায়গায় যাও, ডাইনি কিরণের কাছে সে-সব কোনদিনই পাবে না!"

তৃতীয়

চন্দ্র ও চারু দুই বন্ধু মিলে পূজোর ছুটিতে পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছে। হাওড়ায় এসে তারা ট্রেণে উঠল। গাড়ী ছাড়তে তখনো দেরি ছিল। চারু জানলায় মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের জন-সমারোহ দেখতে লাগল।

একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর হাত ধ'রে একজন পুরুষ ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দিকে তাকিয়েই চারুর চোখ সচকিত হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ডাকলে, "চন্দর, চন্দর! শীগ্‌গির দেখে যাও!"

চন্দ্র জান্‌লার ধারে এসে সেদিকে চেয়ে বেশ সহজ ভাবেই বললে, "হুঁ, ডাইনি কিরণ যাচ্চে!"

চারু বললে, "কিন্তু সঙ্গের লোকটি কে?"

—"ডাইনির নতুন শিকার।"

—"কুমার কোথায় গেল?"

—"তুমি শোনো নি বুঝি? কুমার যে এখন দেউলে! কাজেই আর রুধির মিলবে না ব'লে ডাইনি তাকে চিবুনো মাছের মুড়োর মত পরিত্যাগ করেচে!"

—"কি নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক!.....তবে কুমারের মত লোকের এমনি শাস্তি হওয়াই উচিত! কুমার এখন আবার তার অভাগী স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে তো?"

—"তা গেছে। কিন্তু কুমারের স্ত্রীকে আর অভাগী ব'লে ডেকো না। তাঁর এখন অনেক টাকা।"

—"সে কি! এই যে বললে, কুমার এখন দেউলে।"

—"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে সেদিনই তো বলেছিলুম, কুমারের স্ত্রীর এক ধনী খুড়ো আছেন, মধুবাবু। ব্যাপারটা হয়েছে ঠিক উপন্যাসের মতন। মধুবাবু হঠাৎ তাঁর স্বভাবসুলভ উদাসীনতা ত্যাগ ক'রে কুমারের স্ত্রীকে এত অর্থদান ক'রেচেন যে, তাঁকে আর এ জীবনে টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না! কুমারকে এখন একটি পয়সার জন্যেও স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। স্ত্রীর একান্ত অনুগত হওয়া ছাড়া এখন আর তাঁর অন্য উপায় নেই!"

—"অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!"

—"হুঁ।.....কিন্তু মধুবাবুর এই আকস্মিক উদারতায় সন্দিগ্ধ হয়ে আমি তলে তলে কিছু খোঁজ নিয়ে আর একটি আশ্চর্য্য আবিষ্কার করেচি!"

—"কি আবিষ্কার?"

—"মধুবাবুকে মধ্যস্থ রেখে আর একজন গোপনে কুমারের স্ত্রীকে এই অর্থ দান করেচে। কুমার বা তাঁর স্ত্রী এ-কথার কিছুই জানেন না।"

—"সে কি হে?"

—"হ্যাঁ। এ একটা বিচিত্র খেয়াল, না মৌলিক রসিকতা, না অনুতপ্ত পাপীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতা, তা আমি বলতে পারি না। তবে স্বামীকে ভিখারী করেচে সে স্ত্রীকে রাণী করবার জন্যেই!"

—"এ আবার কি রহস্য! কে সে?"

—"ডাইনি কিরণ।"

"ওয়াটার সাইকেল বোট"

শ্রীউমাপতি ঘটক

প্রায় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার একখানি সংবাদ-পত্রে নিম্নের চিত্রের ন্যায় একটী চিত্র সহ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে ঐ নূতন রকম জলযানের নির্ম্মাতাকে উহার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ও ঐ যানের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ও লিখিত হইয়াছিল।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, আমার যতদূর মনে হয়, আর একখানি পত্রিকায় ঐ প্রকার আর একটী ছবি দেখিয়াছিলাম

ওয়াটার সাইকেল বোট

ও তাহার নির্ম্মাতাও একজন বিদেশী। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে, ঐ সাইকেল বোট আমাদের দেশে একজন বাঙ্গালী প্রথম উদ্ভাবন করিয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহার কোনই সংবাদ রাখি না, বরং উহা নির্ম্মাণের প্রশংসা একজন বিদেশীকে দিয়া দিলাম।

এই যে বাঙ্গালীর প্রত্যেকের কত আদরের সামগ্রী যে "চাউল", তাহাও প্রস্তুত করিবার কল একজন বাঙ্গালীই উদ্ভাবন করেন, কই আমরা কয়জন তাঁহার খবর রাখি? খবর রাখিতাম—যদি তিনি বিলাত যাইয়া তাঁহার আবিষ্কার ঘোষণা করিতেন।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণ চেৎলা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল ৺কাশীশ্বর ঘটক মহাশয়ের পুত্র ২৪ পরগণা বেহালানিবাসী জগদীশ্বর ঘটক ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঐ ওয়াটার সাইকেলের আবিষ্কার করেন।

এই জলযান দেখিতে অতি সুন্দর ও ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা জলে ডুবিয়া যায় না, বা তুফানে উল্টাইয়া যায় না। ইহার নির্ম্মাতা স্বয়ং ইহাতে আরোহণ করিয়া পদ্মানদী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

ইহার সুন্দর গঠন ও জল-ভ্রমণের নির্ভয়তা উপলব্ধি করিয়া রাজা জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, সাজাহানপুরের মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান বাহাদুর প্রত্যেকেই একখানি করিয়া ঐ জলযান খরিদ করিয়া নির্ম্মাতার উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। *

* লেখকের আক্ষেপ একেবারে অসঙ্গত না হইলেও, সম্পূর্ণ সঙ্গতও নয়। এই ওয়াটার সাইকেল বোট পুরাতন "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এক্‌জিবিশন", "মোহন মেলা" প্রভৃতি শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হইয়াছিল, সংবাদপত্রেও আলোচিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কারের গৌরব হইতে আবিষ্কারককে বঞ্চিত করা হয় নাই। সে সময়ে সেই বোট আমরাও দেখিয়াছিলাম, পত্রান্তরে তাহার প্রশংসাও করিয়াছিলাম। তাই বলিয়া বিদেশী কোন আবিষ্কারের পরিচয় লইতে পারা যাইবে না, এমন কোন কথা নাই। আমাদের নিজ-দেশের আবিষ্কার যে উপেক্ষিত হয়, তাহা আমাদেরই ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবের পরিচায়ক; সেজন্য বিদেশীকে দোষী করা যায় না। লেখক আমাদের কাছে উহার বিবরণ পাঠাইবামাত্র আমরা উহা প্রকাশ করিলাম। আবিষ্কারক নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিলে অপরে কি করিতে পারে?

—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৬

অনতিবিলম্বে সুকুমারীর মনোযোগ অপর সকল বিষয়ে হ্রাস পাইয়া সরমার পুত্রের উপর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া, বুকে ফেলিয়া, আদর করিয়া, চুমা খাইয়া, হাসাইয়া, কাঁদাইয়া, নাচাইয়া, অস্থির করিয়া দিল। তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ের গোপন ক্ষুধা, দীর্ঘকালের অপরিতুষ্টিতে যাহা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরে অগোচরে বাস করিতেছিল, সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া কিছুতেই যেন পরিতৃপ্তি মানিতেছিল না। নিজের গাছে যে ফল একবার মাত্র ফলিয়া ভবিষ্যতে পুনরায় ফলিবার সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য অপহৃত করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সুমিষ্ট ফলের রসাস্বাদে সুকুমারীর অবরুদ্ধ মাতৃত্ব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার গভীরতম সংক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, যে-অক্ষমতা মাতৃত্বের পূর্ণতা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে সে-অক্ষমতা লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই! বিধাতার হস্তে সে যাহা পাইয়াছিল মানুষের হস্তে তাহা হারাইয়াছে!

রান্নাঘরে সরমা রান্নার যোগাড় করিয়া লইতেছিল, সুকুমারী খোকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "এমন সুন্দর ছেলে কিন্তু এত রোগা কেন রে?"

"অসুখ যে দিদি। রোজ শেষ রাত্রে লিভারের জ্বর হয়।"

"চিকিৎসা করাস নে?"

"করাই। ডাক্তার বলেছেন শীতটা একটু বেশী চেপে পড়লে জ্বর ছাড়বে।"

"সে ত' সময়ের গুণে ছাড়বে—ওষুধের গুণ তাহলে কি হল? খাওয়াস কি?"

"খাওয়াই দুধ সাবু। জ্বর না থাকলে কিম্বা কম থাকলে চারটি করে দুধ-ভাত দিই।"

"কি দুধ খাওয়াস? ভঁয়সার দুধ না ত? ভঁয়সার দুধ ছেলেকে কখনো খাওয়াস নে!"

সরমা বলিল, "কিন্তু ভঁয়সার দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে খুব উপকার হয় দিদি।"

সুকুমারী বলিল, "ভঁয়সার দুধ হজম করতে পারলে শরীর যেমন মোটা হয় বুদ্ধিও তেমনি মোটা হয়। গরুর দুধ বেশী করে না খেলে বুদ্ধি গরুর মত হয় তা জানিস নে?"

সুকুমারীর এই অদ্ভুত মন্তব্যে হাসিতে হাসিতে সরমা বলিল, "না, তা' ত জানি নে!"

"হয়। দুধ-সাবু আর দুধভাত ছাড়া আর কি দিস খেতে?"

"আর ত কিছু দিই নে।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুকুমারী বলিল, "সর্ব্বনাশ! এই খাইয়ে তুই ছেলে মানুষ করবি! গয়লা বাড়ীর দুধ আর বাজারে কেনা সাবু, যা মোটেই সাবুদানা নয়, তাই খেয়ে তোমার ছেলের জ্বর সারবে?"

সুকুমারীর কথায় চিন্তিত হইয়া সরমা বলিল, "কিন্তু জ্বরের উপর আর কি দেবো দিদি?"

"যা দিলে শরীরে একটু রক্ত আর মাংস হয়ে জ্বরটাকে তাড়াতে পারে জ্বরের উপর তাই দিতে হবে! এখন এর প্রধান দরকার হচ্ছে শরীরে একটু পুষ্টি হওয়া; সেই জন্যে ভেবে চিন্তে যা-কিছু পুষ্টিকর অথচ হাল্কা খাওয়া সব একে খাওয়াতে হবে। পেটে যখন লিভার রয়েছে তখন বেশী, করে ফলের রস দিতে হবে। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, কমলালেবু, পাতিলেবু এ সব ফলের রস এর পক্ষে আহার আর ওষুধ দুইয়ের কাজ করবে। তারপর দুধের সঙ্গে টাটকা ডিমের কুসুম, মগুর ডালের জুস্, কই-মাগুর মাছের সুপ্, মটন ব্রথ্, একটু করে টাট্‌কা মাখন, কোনো দিন বা একটু বার্লি-সিদ্ধ-করা রুটি, এ-সব দেওয়া দরকার। ছ মাসে ভাত হয়েছে সে আজ ছ মাস হতে চল্ল, এক মুখ দাঁত বেরিয়েছে—এখন একে না খেতে দিলে চলবে কেন? এ বুড়ো মানুষ নয় যে উপোস দিইয়ে জ্বর ছাড়াবি। এ জ্বর দুর্ব্বলতার জ্বর—অপুষ্টির জ্বর। বেশী দিন এ জ্বর লেগে থাকলে কঠিন সব রোগ এসে জুটবে। ছোট ছেলেদের প্রথম

বনেদটা ভারী শক্ত হওয়া দরকার। দু বছরের মধ্যে যে ছেলে স্বাস্থ্যবান না হল, কোনো রকম করে প্রাণে বেঁচে গেলেও, চিরজীবন সে রুগ্ন আর দুর্ব্বল হয়ে থাকবে। ছেলেকে অযত্ন করিস নে সরো।"

ছেলেকে সরমা অযত্ন নিশ্চয়ই করে না; কিন্তু সুকুমারীর এই সুদীর্ঘ খাদ্য-তালিকা আবৃত্তির পর ছেলেকে কেবল মাত্র দুধ-সাগু এবং ভাত খাওয়াইয়া রাখা যে অযত্ন করা নহে, এ কথা বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়, তাই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সুকুমারীর কথায় তাহার মনের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল। সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল সুকুমারীর তালিকার কত দফা তাহার সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব।

সুকুমারী বলিল, "শুধু খাওয়াই নয়। পরার বিষয়েও বিশেষ মন দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ এ সব শীতের দেশে। যথেষ্ট জামা কাপড়ের অভাবে ছেলেদের যে কত ক্ষতি হয় তা বলবার নয়। ঠাণ্ডা লেগে গেলে শুধু যে সর্দ্দি কাসি আর পেটের অসুখ হতে পারে তাই নয়, উপযুক্ত গায়ের কাপড়ের অভাবে শরীরের উত্তাপ নষ্ট হয়ে শরীর মোটা হতে পারে না।"

এবার সরমা মৃদুভাবে একটু তর্ক তুলিল; বিশেষতঃ তাহার পুত্র যে সজ্জা পরিয়া ছিল তদ্বিষয়ে তেমন কিছু অনুযোগ করিবার ছিল না বলিয়া এ কথাটা সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবার পক্ষে সেরূপ বাধা ছিল না। সে বলিল, "কিন্তু দিদি, তা হলে গরীব দুঃখীদের ছেলেপিলে বাঁচে কেমন করে? তারা যা খাইয়ে-পরিয়ে ছেলে মানুষ করে দেখেছ ত?"

সুকুমারী বলিল, "দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যেমন পৃথক ধাত আছে, প্রত্যেক জাতেরও তেমনি পৃথক ধাত আছে। দেহ খাটিয়ে যাদের খেতে হয় তাদের ধাত, আর মাথা খাটিয়ে যাদের খেতে হয় তাদের ধাত কখনো এক হয় না। এক মণ বোঝা মাথায় নিয়ে যে এক মাইল পথ চলে যেতে পারে তার ছেলে যা খেয়ে মানুষ হবে, এক খানা বড় উপন্যাস এক রাত্রি জেগে যে পড়ে ফেলতে পারে তার ছেলে তাই খেয়ে মানুষ হতে পারে না। তাই বিশুয়ার ছেলে যখন ছোলা খাবে তোর ছেলেকে মাখন খেতে হবে। গয়লা বাড়ীর দুধ দিয়ে মুদিখানার সাবু খাওয়া দুজনের মধ্যে কারো পোষাবে না। তা ছাড়া তোর ছেলের যা অসুখ আর আকৃতি—খাওয়া-পরার বিশেষ ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন?"

সরমা আর তর্কে অগ্রসর হইল না; হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি তুমি এত কথা জানলে কি করে?"

সুকুমারী সবিস্ময়ে বলিল, "এত কথা আবার কি রে? এ সব মামুলী কথা না জানলে ছেলে মানুষ করবি কি করে? নিজেরি আমার নেই, কিন্তু তাই বলে কি চোখে দেখি নি? আমার ননদের বড় জায়ের দৌত্তুরকে পাড়াগাঁ থেকে নিয়ে এল জরাজীর্ণ—জলবার্লি খাইয়ে খাইয়ে একেবারে জল-বার্লির মত চেহারা করে দিয়েছে। তার দিদিমা তাকে ছ মাস বেদানার রস খাইয়ে বেদানার মত চেহারা করে পাঠিয়ে দিলে। ভাল জিনিস খাওয়ালে যদি ভাল চেহারা না হত তা হলে সাহেবদের ছেলেদের অমন চাঁদের মত চেহারা হত না।"

এ অকাট্য যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ নজীরের বিরুদ্ধে সরমার কিছুই বলিবার ছিল না। সে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে চুপ করিয়া রহিল। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে কয়টা বেদানায় একদিন পান করিবার মত রস হয়, এবং তাহার মূল্য কত; কিন্তু পাছে উত্তর শুনিয়া বেদানার রসের দ্বারা পুত্রকে সুস্থ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই বলিয়া জানিতে পারে সেই আশঙ্কায় সরমা সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

দুই হস্তে খোকাকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার নাসিকায় নিজ নাসিকা ঘষিয়া ঘষিয়া সুকুমারী আদর করিতেছিল; হঠাৎ সুবিধা পাইয়া খোকা অতর্কিতে সুকুমারীর নাসিকাগ্র বার দুই চুষিয়া দিল।

সুকুমারী বলিল, "তোর ছেলে শুধু দুধ-সাবু আর দুধ-ভাতই খায় না সরো, আরো একটা জিনিস খায়!"

কাজ করিতে করিতে ফিরিয়া চাহিয়া সরমা বলিল, "আবার কি খায়?"

"মাসির নাক খায়!"

সরমা হাসিয়া বলিল, "মাসি যে রকম বেদানা আর ডালিমের গল্প করছিল, মাসির টুক্‌টুকে নাক দেখে ভেবেছে ডালিম কিম্বা বেদানাই বা হবে!"

শিশুকে আদর করিতে করিতে সুকুমারী বলিল, "চুষে দেখলে মাকাল ফল। ছেলের নাম কি রেখেছিস রে?"

মৃদু হাস্য করিয়া সরমা বলিল, "শ্রীপদ।"

সুকুমারী বলিল, "রমাপদর সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীপদ? এ নাম কে রাখলে? রমা, না তুই?"

সরমা কিছু বলিল না। স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। "শ্রীপদ ত' পোষাকী নাম; ডাক-নাম কিছু রাখিস নি?"

"ডাক নাম ঘিণ্টু।"

"ঘিণ্টু? তা বেশ নাম! শ্রীপদর চেয়ে ভাল।" বলিয়া ঘিণ্টুর সহিত সম-ধ্বনিত আরও চার-পাঁচটি অর্থ-বিহীন শব্দের দ্বারা আদর করিতে করিতে ঘিণ্টুকে বুকের উপর ফেলিয়া সুকুমারী প্রস্থান করিল স্বামী সমীপে। (ক্রমশঃ)

ভোরের শিউলী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

শরৎ-আলোর অরুণ-চুমায় ঝরা
আমি তরুণ করুণ শেফালী,
ঘাসের বুকে মনের দুখে মরা—
সরম আমার নয়গো সে খালি!
ভোরের হাওয়া, তুইত' আমার কাণে
কইলি,—"জাগো উষার আলোর গানে
আস্‌ছে দয়িত!" বিহ্বল আমার প্রাণে—
আশার মোহন স্বপ্ন দেখালি!

কোথায় ভ্রমর, কোথা গো অবন্ধ?
বক্ষে মধু নাই যে পিয়াবো,
একটু ছিল ঈষৎ সুগন্ধ,
আর কত'খন তায় বা জীয়াবো?
আস্‌ছে প্রভাত মরণ-দূতী মোর,
চক্ষে ঘনায় ঝাপ্‌সা ঘুমের ঘোর,
শেষ-কামনা কুসুম-চিত্ত-চোর
তোমার গলার গান শুনি যাবো!

রূপের ঠমক, গন্ধ-গমক নাই
চমক যা' দেয় গোলাপ-বাগানে,
রঙীন পরিমল পাবে না ভাই
তোমার প্রেমের গুঞ্জন তানে;
পঙ্কজিনীর মর্ম্মকোষের মধু
পিয়াল-পরাগ নাইক' হেথায় বঁধু!
কিশোরী এই শিউলী সই'য়ের শুধু
সুবাস মৃদু—বিলাস না জানে!

হলুদ্‌-বোঁটা ব্যথায় বিবশ তার
হানলে আলোক—আঁধার—নয়নে!
মৃত্যু-শিথিল দলগুলি একবার
কাঁপ্‌ল' যেন কালের চয়নে!
নীড়ের পাখী গাইল উদাস স্বরে
তরু-লতার অশ্রু শিশির ঝরে
শিউলী যখন সজল তৃণের' পরে
মুদ্‌ল আঁখি মরণ-শয়নে।

কলির দাতাকর্ণ

শ্রীনন্দি শর্ম্মা

দাতারাম্ পড়তো যখন আগড়্‌পাড়ার ইস্কুলে,
পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খায়নি সে কভু ভুলে।
পোষাক্ পরিচ্ছদের প্রতি ছিল না তার কিছুই টান্,
দানাপুরী জুতো পায়ে;—দিলেও খেত'নাক' পান্।
চুলের সঙ্গে চিরুণীরও ছিল না কভু সাক্ষাৎ,
লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকুতো কেবল দিনরাত।
সন্ধ্যা-আহ্নিক্ কর্‌ত' খুবই, সেটায় ছিল খুবই আটা;
বিতেষ্টা তার ছিল মাছে,—কখন সে খায়নি পাঁটা।
পাড়ার ছেলের বড়ই মুস্কিল্,—সবাই দিত উদাহরণ,
"ছেলে যদি হয় কারো ত, হয় যেন সে দাতার মতন।"
প্রাইজ্ পেতো, মেডেল্ আন্‌তো, চারদিকে তার হ'ত নাম,
সবাই ব'লত "গ্রামের ছিরি, বাহবা ছেলে দাতারাম!"
লেখাপড়া শেষ ক'রে সে হ'ল একজন্ প্রফেসার্,
একেবারে একশ' টাকা মাসোহারাও হল' তার।
কর্ত্তা হয়ে খরচটার সে করলে এমন কড়াকড়ি,—
ডাল্ ভাত, আর কুমড়া কচু, শাকপাতার এক চচ্চড়ি।
আম্‌ড়া, না হয় আমরুল দিয়ে,—খোসার একটা জোঁদা টক্,
বারোমাসই একটানা, এই আহারের তার বাড়লো সখ্।
বছরে চারখানা সাড়ী,—ন'হাত হলেই,—তাই প্রমান্,
পুরুষদের বরাদ্দ হল,—এক থানে হবে ছ'খান।—
স্বতন্ত্র গজ্‌খানেক ক'রে পাবে সবাই আলাদা,—
কোঁচার স্থানে কুঁচিয়ে সেটা গুঁজে নিতে কি বাধা?
কাচ্‌লেই হল' মাঝে মাঝে, একটাতেই তার চল্‌বে বেশ,
আবার একটা নতুন পাবে—বছরটা যেই হবে শেষ।
কামিজপরা ছেলেগুলয়—বাড়ীর সবাই হয়ে' বাম্,—
সদাই ব'লত, "দেখে আয়গে—কিবা ছেলে দাতারাম।"
সংসার-বাবদ চল্লিশ রেখে—যাট যেত' তার ব্যাঙ্কের খাতে,
খেতে প'র্‌তে আট্‌টি, তবু খেলাফ্ কভু হয়নি তাতে।
বলা ছিল—"যে যা পারবে ও-থেকে বাঁচাতে যা,—
আমি আর চাইনা সেটা,—তারি হবে সে লাভটা!"
শুনে সবাই জ্বলে যেতো,—কেউ বা হাসত' পাগল্ ভেবে,
বুঝ্‌ত' সবাই,—ম'রে গেলেও—এক পয়সা না অধিক্ দেবে।
বল্‌লে একদিন বোন্‌কে ডেকে—"ফেন্‌টা তোরা কি করিস্!
ওই'টেই ত' আসল্ জিনিস্,—কেউ না খায় ত' আমায় দিস্।"
"ওটা যে দাদা, গরুকে দি—দুবেলার সব ক'রে জড়;"
"আজ থেকে আমাকে দিবি, গরু বড় না আমি বড়?
জানিস্ না সব বিলেতেতে ও জিনিসটার কত দাম্।"
সবাই বল্লে, "ধন্য ধন্য, ছেলে বটে দাতারাম!"
বরাবরই দাতারামের ঝোঁক্‌টা ছিল দানের দিকে,
মেডেল্ এনেছিল একবার—ঐ বিষয়ে "এসে" লিখে।
কথা পড়লেই বল্‌ত তখন,—"দুনিয়ার যা বড় কিছু—
ধর্ম্ম বলো কর্ম্ম বলো,—দানের কাছে সবই নীচু।
না খেয়ে না পোরে, আর নিত্য পাঁচকোশ্ হেঁটে চোলে—
টাকাটা যে বাঁচাই, কেবল—ওই নেশাটা আঁছে বোলে!
খাওয়া-পরায় বৃথা জেনে—ঐটেই আমি করেছি সার্,
আনন্দ, কি সুখ শান্তি,—ঐটেতেই সব হয় আমার।
দানটা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বটে,—অপাত্রে না পড়ে কিন্তু;
মহাপাতক হয় তাহাতে, পুণ্য তাতে নাই এক বিন্দু।"
অবাক্ হয়ে শুনতেছিল—সহপাঠী ঘনশ্যাম,
লাফিয়ে উঠে বল্লে শেষে—"ক্যাবাৎ ভায়া দাতারাম!"
সংসার বাড়লো বছর্ বছর্,—বেতনটাও বাড়লো ক্রমে,
খরচ কিন্তু বাড়লো না তার,—এক পয়সাও, ভুল, বা ভ্রমে।
মায়ের জ্বালা বাড়লো বটে,—লুকিয়ে ফেলেন চোখের জল,
ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি—অনুনয়েও হয় না ফল।
গোপনেতে গয়না-গাঁটি—বাঁধা রেখে চালান তিনি,
অভাগিনীর কি যে কষ্ট,—জানেন অন্তর্য্যামী যিনি।
কাট্ ফুরুলে বেড়া ভেঙে,—লুকিয়ে তিনি উনুন ধরান্,
দশমীতেও জল খান্ না, শিশুদের তায় খাবার আনান্।
চাল কেঁড়ে, তার খুদ্‌গুলি নে'—নিজে রাঁধেন স্বতন্তর,
পূজোর তত্ত্ব, কাপড়, নিয়ে ফি-বছর হয় মনান্তর।
"দাতা" বলে—দানটা আগে,—তার পরেতে অন্য কাম্,
সবাই বলে, "ভাগ্যবতী,—বিইয়েচে যে দাতারাম।"
ছেলে পড়িয়ে দাতারামের—টাকা ষাটেক্ তাতেও আসে,
এ টাকা সে রাখে, কোনো দুঃখীর মেয়ের বিয়ের আশে।
গৃহ-হীনে ক'রে দেওয়া ঘর,—অনাথ ছেলের শিক্ষার ভার,
আতুরেরে অন্ন দেওয়া,—সখের মধ্যে ছিল তার।

অন্ধ খঞ্জ দেখে পথে—বড়ই কষ্ট হ'ত প্রাণে,—
বলতেন তিনি—"এরাই আমার দানের দিকে প্রাণটা টানে।"
জননী তার দেবতার কাছে—কাঁদতেন কেবল মৃত্যু চাই।
খাওয়া-পরার কষ্টে শেষে—চুরি বিদ্যে শিখলে ভাই!
ঘটিবাটি যা পেত' সে—লুকিয়ে নিয়ে আসত' বেচে,—
কাপড় কিনে, খাবার খেয়ে,—একরকমে থাক্‌তো বেঁচে।
দান-খাতেতে জমার অঙ্ক বাড়্‌তে লাগল অবিশ্রাম্,
দেখে সবাই চোম্‌কে উঠে, বল্লে—"সাবাস্ দাতারাম্!"
সহপাঠী বল্লে একদিন;—"দয়ায় বটে শরীর গড়া,—
কিন্তু তোমায় দেখিনি ত' দিতে কারোয় একটি কড়া!"
দাতা বল্লে—"বলো কি হে—করলেই হল' দান্‌টা বুঝি?—
অপাত্রে দান ক'রে, শেষে—পাতক্ নিয়ে আমি যুঝি!"
"অন্ধ খঞ্জ আতুর যারা—তারা ত অপাত্র নয়?"
"তুমি আমি বল্লে কি আর—সে-কথাটা প্রমাণ হয়?
বিশিষ্ট কেউ বড় ডাক্তার,—সাহেব কিন্তু হওয়া চাই,—
পরীক্ষান্তে বলেন যদি,—তাতে মোর আপত্তি নাই।—
তবু কিন্তু ধোঁকা থাকে;—ভাল রকম সন্ধান বিনা,—
কি পাপে হয়েছে অমন—সেটাও আবার কুৎসিত কিনা;—
কথাটা আমার বুঝেছ ত?—ভাব্‌তে হয় ত' পরিণাম?"
"তা ত' বটেই" বল্লে বন্ধু,—"তুমিই সত্য দাতারাম!"
"ধর'না কারুর চোখ গেলে' দে—অন্ধ হয়ে থাকে যদি,
কিম্বা কারুর ঠ্যাং ভেঙ্গে' দে—নিজের পায়ের এ দুর্গতি।
অথবা কারেও সবংশেতে মেরে, এবার হয় অনাথ,
কাঙ্গাল হয়ে থাকে যদি,—কারুর টাকা আত্মসাৎ
ক'রে কোনো জন্মেতে সে;—কিম্বা কারুর মুখের অন্ন,—
কেড়ে খেয়ে, এবার আতুর—হয়েছে সে মতিচ্ছন্ন;—
দয়ায় অন্ধ হয়ে আমি—তাদের যদি দানটা করি,—
ভাবতেও তা, শিউরে উঠি,—রক্ষা আমায় করেন হরি!
তা না ত', এ সব টাকাই ত' দানের তরেই রাখাটা মোর,
পাত্র কিন্তু পাই না খুঁজে,—এইটেই তো আপশোষ্ ঘোর।
সদাই ভাবি—দূর ক'রে দি—দুঃখ হতে ধরাধাম্;
বন্ধু বল্লে—"অমর হয়ে—বেঁচে থাক ভাই দাতারাম!"
"ধর না আবার, টাকাটা নিয়ে—করে যদি কেউ অসদ্ব্যয়,
কাজের চেষ্টা না ক'রে, আর কুড়ের মত' ব'সে রয়,
অথবা মদ্ খেয়ে বসে,—কিম্বা যদি খায় সে গাঁজা,
সে সব পাপে আমাকেই ত' নিতে হবে কড়া সাজা;
ঘরে আগুন দিছলো কারুর, হয়েছে তাই গৃহ-হারা,
তাদের দানটা করে কি শেষে—পাপে আমি যাব' মারা?
অন্নের তরে টাকাটা দিলুম,—সে যদি গে খায় কচুরী,
নিজে মজ্‌লুম, তারে মজালুম,—মিছেই আমার সব মজুরী।
পাপ শেখাবার তরেই লোকে, হয় যদি মোর দানটা করা,
বলো দিকি বাড়বে কি না—হু হু ক'রে পাপের ভরা।
তার চেয়েতে, তাদের পাওনা থাকুক্ না আমারই কাছে,
মনে মনে দিয়েইচি ত';—তার চেয়ে আর সুখ কি আছে!"
বন্ধু বল্লে—"এ ভাবটা ভাই, একদমই খাঁটি নিষ্কাম্,—
দান ক'রবে ত' এই রকমই,—বাহা রে বাহা দাতারাম!"
"ক'নের পাত্র জোটে বরং—হাজার পাঁচেক যদি বর্ষে,
দানের পাত্রের বড়ই অভাব,—বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে।
কথাটা বেশ বুঝেছ ত',—বড়ই কঠিন দানের প্রশ্ন,
রয়েছি হয়ে দানেই ফতুর,—দানের তরেই এত যত্ন।"

* * * * *

অনেক জ্বলে মা মরেছেন,—জায়াও গেছেন হাড় জুড়িয়ে,
দানের তরে দাতারাম কিন্তু,—আজো আসছেন টাকা কুড়িয়ে।
সাধ আহ্লাদ মেলা-মেশা—না আছে বন্ধুবান্ধব,
ভয়টা, পাছে কইলে কথা—গুড়ুক খেতে আসে সব!'
ফ্যান্ খেয়ে আর ডাঁটা চিবিয়ে—ধোরলো শেষে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া,
খায় সে এখন সাত সের জল,—বলে'দিছলো কোন্ এক মিয়াঁ।
ব'লতো "এটা জ্যান্তো ওষুদ,—পেয়েছি এতে খুবই আরাম"।
সবাই বল্লে "তা ত বটেই,—সন্দেহ তায় নাই দাতারাম।"
পাত্রাভাবে দাতারামের দান করা না হলো এবার,
পাই-পয়সা রইলো মজুদ্,—সুদে বাড়তে লাগ্‌লো দেদার।
সহপাঠী ছিল যারা সব—বল্লে তারা অবশেষে,—
"এমন দাতা জন্মায়নি কেউ,—জন্মাবেনাও কোন দেশে।
দুঃক্ষু,—মা বাপ্ ম'রে গেছেন,—দেখাতে পারলুম না কারে,
দাতারামের উন্নতিটা,—উদাহরণ দিতেন যারে!"
মৃত্যুকালে দেখলে গুণে,—জমা মজুদ্ আটাশ হাজার!
ছেলেয় ডেকে, পা ছুঁইয়ে,—মতলবটা (তার) করলে প্রচার—
"মধুমিত্তিরের বিধবার ওই জমীদারিটে নেওয়াই চাই,—
অনেকদিনের ঝোঁকটা আমার,—টাকাগুলো রেখেছি তাই;
সুদে আসলে গোণাই আছে,—এই চোতেতেই হবে নিলাম,
আর যা লাগে দিয়ে দিও,—শেষ কথাটা বলে গেলাম।"
ঠাকুরদের নাম করতে বলায়,—কষ্টে বল্লে "গন্ধমাদন,"
"ভস্মলোচন্" বল্‌তে গিয়ে—ছিঁড়ে গেলো ভবের বাঁধন!
দেশ শুদ্ধ, অবাক শুনে, সবাই ঝুঁকে করলে প্রণাম্,
বল্লে "কলির দাতাকর্ণ—সরে পড় ভাই দাতারাম!"

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক—

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ হার্বার্ট জে, স্পিন্‌ডেন Guatemala এবং Honduras নামক স্থানের কয়েকটি ভাঙ্গা মন্দিরাদি হইতে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শিলালিপি-গুলি ২৫০০ বছরেরও পূর্ব্বের লেখা। এই শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিখ্যাত মায়াজাতির

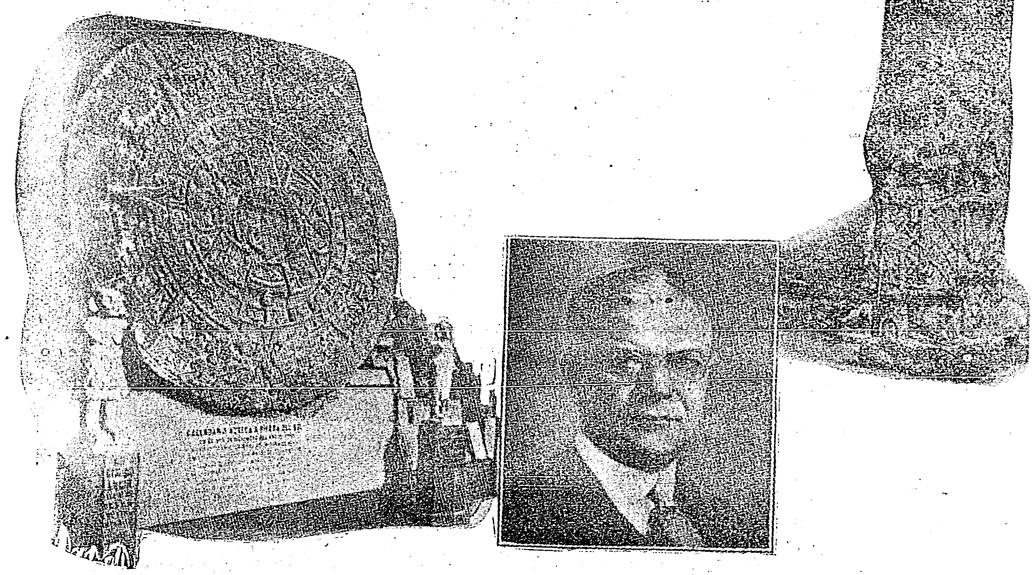

আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক

কোন পণ্ডিত এই লিপি রাখিয়া গিয়াছেন। এই লিপি-গুলিতে অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি সুকঠিন নিয়মের অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যা সাধারণ পণ্ডিতের কাজ নয়। অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে ইহা করা অসম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতকগুলি বিষয় এই সকল শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

মায়াজাতি আমেরিকার আদিম অধিবাসী। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব্বে তাহারা এই দেশে বাস করিত। তাহাদের সভ্যতা প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীন, কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। প্রস্তর-খণ্ডের উপর খোদিত তাহাদের যে Timepiece বা ঘড়ি ছিল, তাহার দ্বারা বর্ত্তমান জগতের ঘড়ির কাজ খুব সহজে এবং ঠিকভাবে চলিত, অধিকন্তু এই ঘড়িতে সূর্য্যের গতিবিধি এবং ঋতু পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে পারা যাইত। স্পেনের লোকেরা এই প্রাচীন মায়া-সভ্যতার বহু নিদর্শন ধ্বংস করিয়াছে। যে সময়-নিরূপণকারী প্রস্তর-খণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার খানিক অংশও তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। বিশপ লাণ্ডার এই সকল ধ্বংস-লীলার কর্ত্তা ছিল। মায়া-সভ্যতার সময়ের অনেক প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদিও বিশপ লাণ্ডার নষ্ট করে।

ডাঃ স্পিন্‌ডেন বলেন, "যে ব্যক্তি এই সকল আশ্চর্য্য

শিলালিপির লেখক এবং আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহাকে পারস্যের জোরোয়াষ্টার এবং ভারতবর্ষের বুদ্ধের সহিত এক আসনে বসানো যাইতে পারে।"

মায়াজাতির সভ্যতার পতন যে কেমন করিয়া হইল, তাহা কোনো বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না। কিন্তু ইহাদের

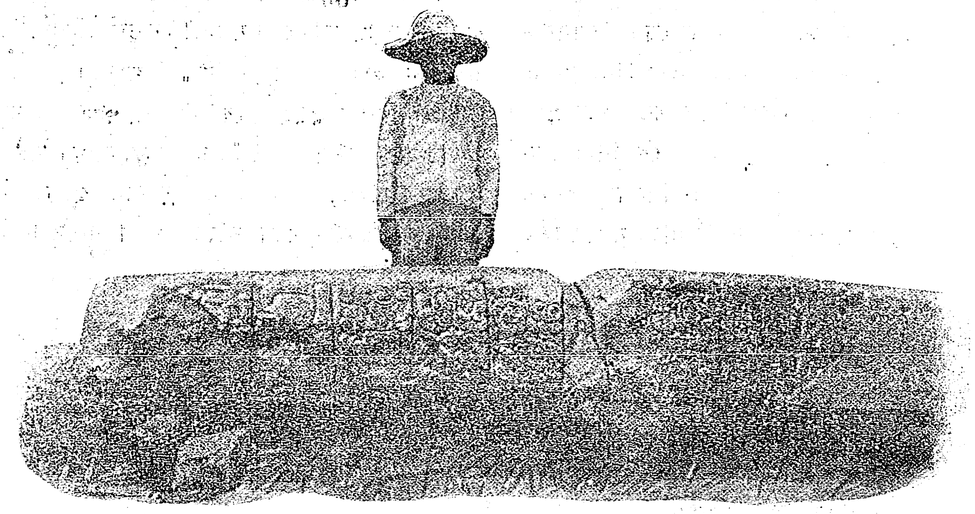

প্রাচীন শিলালিপি

পতন যে পৃথিবীর পক্ষে একটি মহৎ ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়াজাতির লোকসংখ্যা প্রায় দেড়কোটি ছিল। তাহাদের বংশধর বলিতে এখন প্রায় ৪০০০ লাল মানুষ মাত্র (Red Indians) আছে।

আমেরিকার ডাকঘরের কথা—

ডাকঘরের ডেড্‌লেটার আপিসে যে কত প্রকার অদ্ভুত চিঠিপত্র পার্শেল আদি আসিয়া জমা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকার ডেড্‌লেটার আপিস এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। ওয়াশিংটন শহরে এই ডেড্‌লেটার আপিস অবস্থিত। চিঠিপত্র, পার্শেল আদি ছাড়া নানা প্রকার বন্দুকাদি, মদ, কোকেন, মারাত্মক বোমা ইত্যাদি নানা প্রকার ভয়ানক ভয়ানক জিনিষপত্র এখানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে। সামান্য একটা প্যাকেটের মধ্যে হয়ত ডিনামাইট ভরা আছে। ইহা কোন প্রকারে ফাটিয়া গেলে, একটা প্রকাণ্ড বাড়ীকে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে। অতি বিষাক্ত জীবন্ত সাপ, মশা আদি, পোকা-মাকড়, বিছা ইত্যাদিও পার্শেলের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দিন ৬০,০০০এরও বেশী পত্রভ্রান্ত চিঠিপত্র এই আপিসে আসিয়া হাজির হয়। গত বৎসর ওয়াশিংটনের ডেড্‌লেটার আপিসে ২১,০০০,০০০ চিঠিপত্র এবং ৮০৩,০০০ পার্শেল আসিয়া জমা হয়। ইহার মধ্যে ১০০,০০০ শাদা খামের চিঠি—কোন ঠিকানা লেখা নাই, কেবল মাত্র টিকিট লাগাইয়া পোষ্ট করা হইয়াছিল। এক শাদা খামে হাজার বা তাহা অপেক্ষাও বেশী টাকার নোট ভরা থাকে। বছরে এই রকমে প্রায় ১৬৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়।

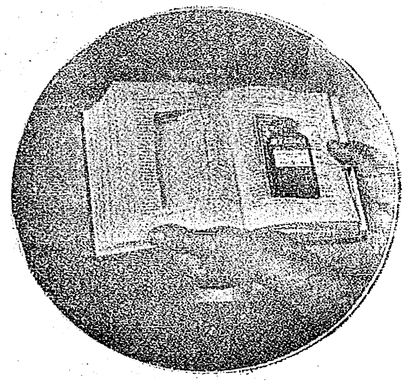

ডাকে নিষিদ্ধ বস্তু

প্রত্যেক বছর নীলাম করিয়া ডেড্‌লেটার আপিস হইতে মালপত্র বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। নানারকম গয়না,

বাজনা, পুস্তকাদি নীলাম হয়। নীলাম হইতে প্রায় ১২০০০০ টাকা আসে।

দীর্ঘজীবী হইবার উপায়—

যাঁহারা খুব বেশী দিন বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাল্য এবং যৌবন সম্বন্ধে খোঁজ লইলে দেখা যায় যে, তাঁহারা বরাবর নিয়ম করিয়া কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়াছেন। এইখানে কয়েকজন লোকের বিষয় লেখা হইল, যাঁহারা সকলেই দীর্ঘজীবী, এবং তাহার একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ তাঁহারা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিয়াছেন।

ডেড্‌লেটার আপিসে সঞ্চিত মালপত্রের নিলাম

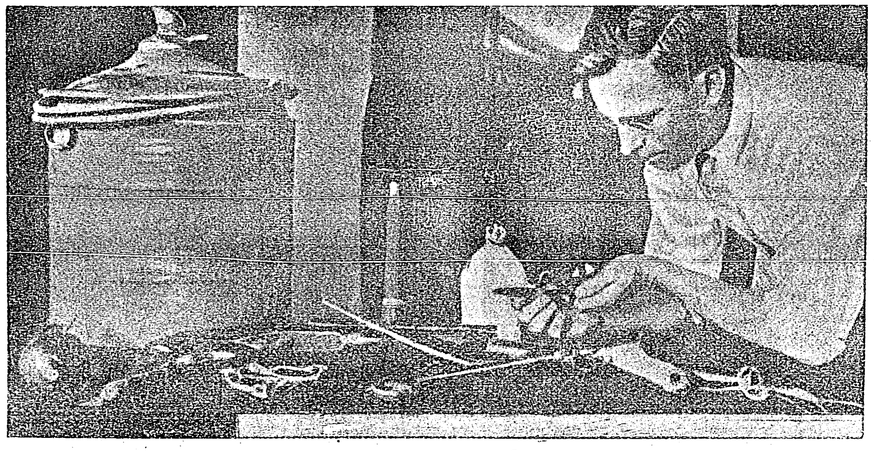

ডেড্‌লেটার আপিসে নিষিদ্ধ বস্তুর সমাবেশ

একেবারে ব্যায়াম না করা কিম্বা অত্যধিক ব্যায়াম করা উভয় প্রকারেই শরীর নষ্ট হইয়া মানুষের পরমায়ু ক্ষয় হয়।

(১) লুই মারকুইট্—বয়স ৬৮। ইনি সকল ঋতুতে এবং প্রত্যহ সমুদ্রে স্নান করেন। শীত, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি কিছুই ইঁহার স্নান বন্ধ করিতে পারে না।

(২) জর্জ্জ এফ, বেকার—বয়স ৮৫। ইনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি, ব্যাঙ্কার এবং রেলওয়ালা। ইনি প্রত্যহ সকালে গল্‌ফ্ খেলিয়া থাকেন।

(৩) আব্রাহাম ফাষ্ট—বয়স ৯০। ইনি গত ৭৩ বছর ধরিয়া শিকার করিবার লাইসেন্স বা পরওয়ানা লইয়া থাকেন। খরগোষ শিকারে ইঁহার প্রধান আনন্দ।

পালোয়ান নারী—

ছবিতে দেখুন একজন মহিলা কেমন একটা প্রকাণ্ড পিপাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইঁহার নাম মিসেস ফ্রান্‌সেস্‌কা। ইনি গত বৎসর বোষ্টোন সহরের

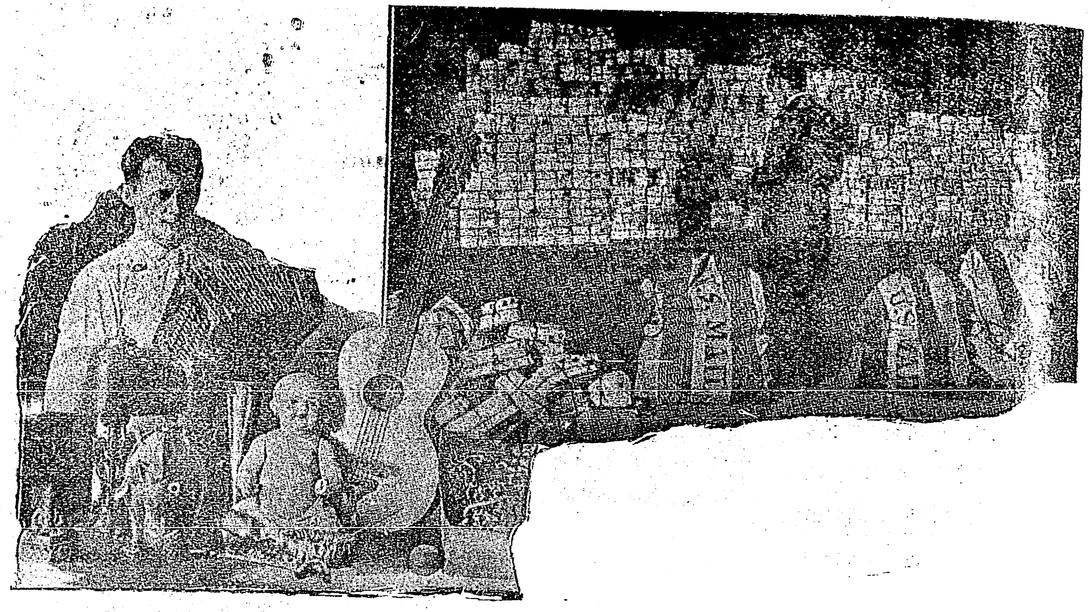

ডেড্ লেটার আপিসে সঞ্চিত পার্শেল

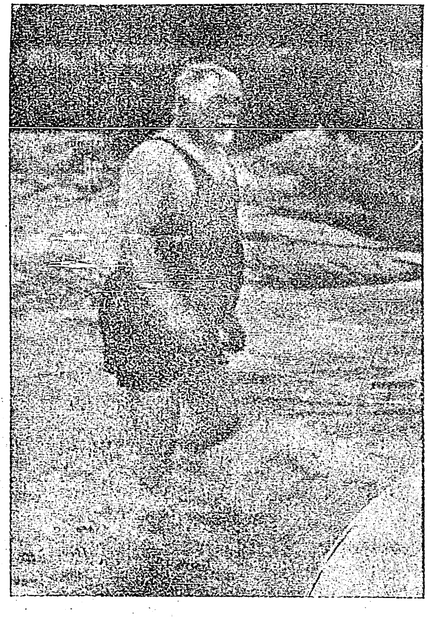

দীর্ঘজীবীর নিত্যস্নান

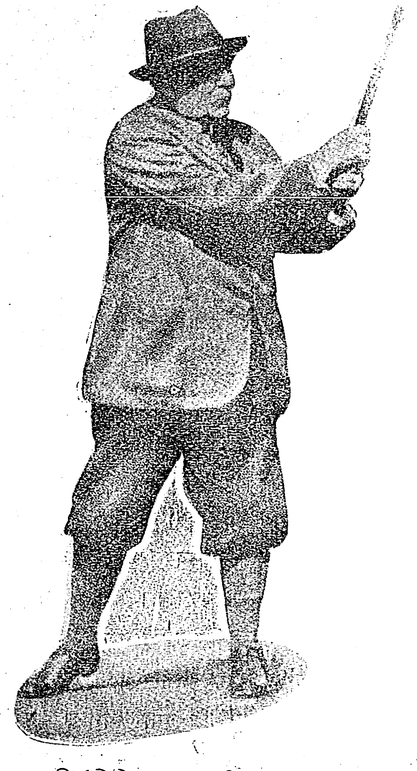

দীর্ঘজীবী গোল্‌ফ্ ক্রীড়

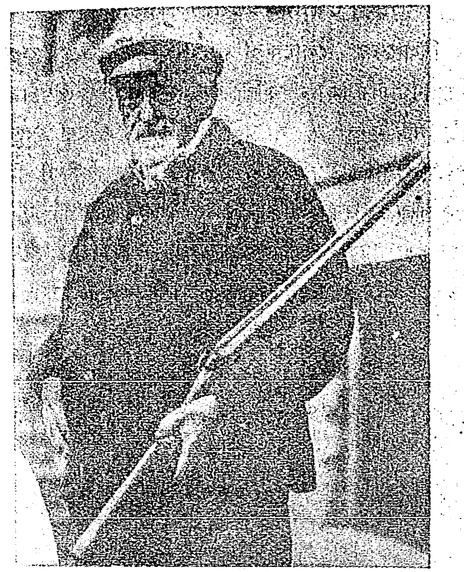

৯০ বৎসর বয়স্ক শিকারী

এক পিপার কার-খানায় কাজ করিতেন। ইহাঁর মত শক্তিমতী নারী খুব কম আছে।

অভিনব ঢাল—

পুরা কালে যোদ্ধারা সর্ব্বাঙ্গ লোহার বর্ম্মে আবৃত করিত। নিউইয়র্কে পুলিস বর্ত্তমান সময়ে বর্ম্ম ব্যবহার করে না, তাহারা একপ্রকার ঢাল ব্যবহার করে। এই ঢাল গলার সঙ্গে বাঁধা থাকে এবং সমস্ত মাথা বুক পেট আবৃত করিয়া

পালোয়ান নারী

রাখে। দুই হাত খালি থাকে, তাহাতে ইচ্ছামত অস্ত্র ব্যবহার করা যায়। চোখের কাছে গোল করিয়া কাটা

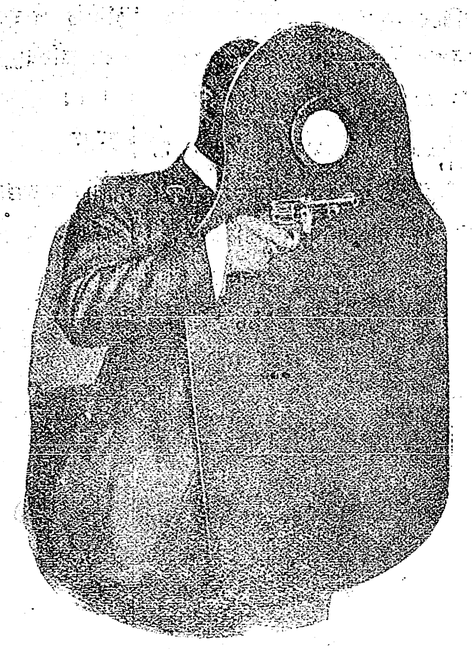

অভিনব ঢাল

আছে—তাহাতে মোটা কাঁচ আটা। পুলিস তাহার সামনের সব জিনিস দেখিতে পায়।

অভিনব ট্যাক্‌সি মোটর—

সম্প্রতি প্যারিসের এক রাস্তায় একটি অভিনব ট্যাক্‌সি দেখা দেয়। এই ট্যাক্‌সিতে চালকের বসিবার স্থান গাড়ীর

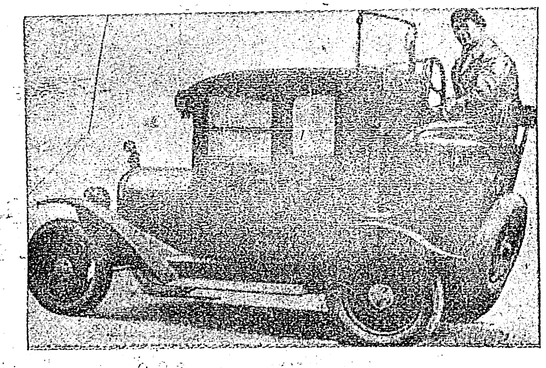

অভিনব ট্যাক্‌সি মোটর

পিছন দিকে উপরে। গাড়ীতে যাহারা বসিয়া থাকে, তাহারা সামনের সব কিছু বেশ বিনা বাধায় দেখিতে পায়। ব্যবসায়ী

বা অন্যান্য যে কোন লোক গাড়ীতে বসিয়া তাহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপন কথাবার্ত্তা এই ট্যাক্সিতে বসিয়া বলিতে পারিবে—ড্রাইভার কোনো কথা শুনিতে পাইবে না। চালকও উঁচুতে বসিয়া রাস্তার বহুদূর ভাল করিয়া দেখিতে পায় এবং ভাল করিয়া গাড়ী চালাইতে পারে।

মাথার কেরামতি—

ছবিতে দেখুন, একজন লোকে মাথায় কতগুলি ঝুড়ি পর পর বসাইয়া বহন করিতে পারে। এই ভদ্রলোকের

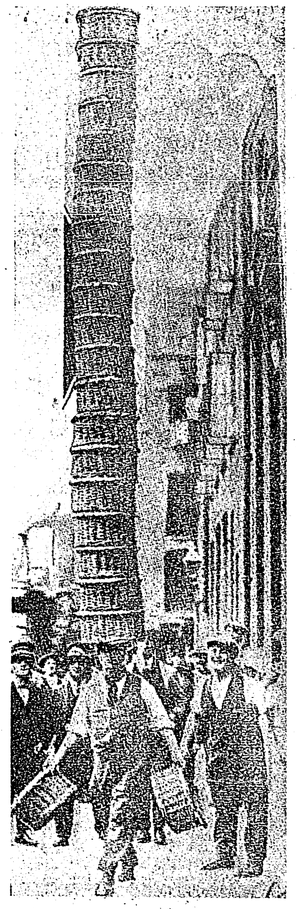

মাথার কেরামতি

নাম জেম্‌স্ সেন্‌স্‌বারি। এতগুলি ঝুড়িকে পর পর বসাইয়া মাথায় করিয়া চলিতে পৃথিবীতে আর কেহ পারে না। এই বিষয়ে সেন্‌স্‌বারি অদ্বিতীয়।

কুকুরের খরগোষ ধরার দৌড়—

বিলাতের লোকেরা পোষা গ্রেহাউণ্ড কুকুর দ্বারা খরগোষ ধরার দৌড় করিতে ভালবাসে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ কুকুরকে সারিবন্দি করিয়া ধরিয়া দাঁড় করায়, তাহার পর কিছু দূরে একটি খরগোষকে ছাড়িয়া দিয়া সেই সঙ্গে কুকুরগুলিকেও ছাড়িয়া দেয়। যাহার কুকুর প্রথমে গিয়া খরগোষকে ধরিয়া ফেলে সেই বাজি মারে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বার দৌড়ের জন্য একটি করিয়া নিরীহ

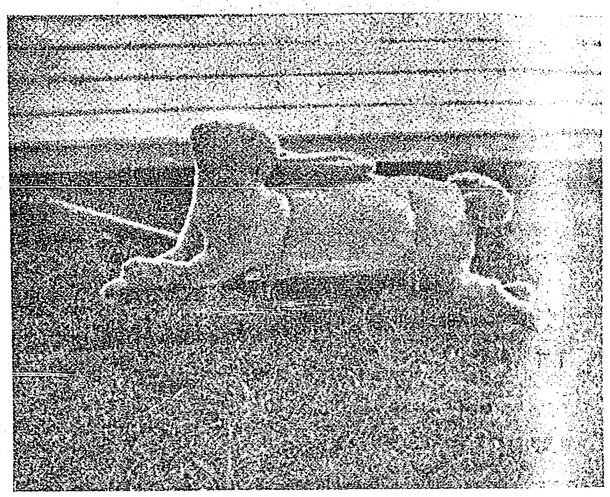

কলের খরগোষ

খরগোষ মারা যায়। কুকুরের দল তাহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ছাড়ে। হঠাৎ সাহেবদের মনে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তাহারা আর জীবন্ত রক্তমাংসের খরগোষ দৌড়ের সময় ব্যবহার করে না। এখন কলের খরগোষ ব্যবহার করা হয়। এই খরগোষ বিদ্যুতের জোরে দৌড়ায়। কলের খরগোষের একখানি ছবি দেওয়া হইল।

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের ভালুক—

প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি, কে, এ্যাব্‌সোলোন সম্প্রতি চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রেড্‌মোষ্ট নামক স্থানে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের (২০,০০০ বছরেরও আগের) বৃহদাকার ভালুকের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ভালুকগুলি ১২ ফিটেরও বেশী লম্বা

হইত। সেই সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেমন করিয়া খাদ্যের জন্য এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভালুক শিকার করিত তাহার একখানি চিত্র দেওয়া হইল। চিত্র দেখিয়া ভালুকের দেহের আকারের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সময়ের ভালুকরা অত্যন্ত অসমসাহসী এবং বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি চিরকাল জন্তুদের অপেক্ষা বেশী বলিয়া সেই

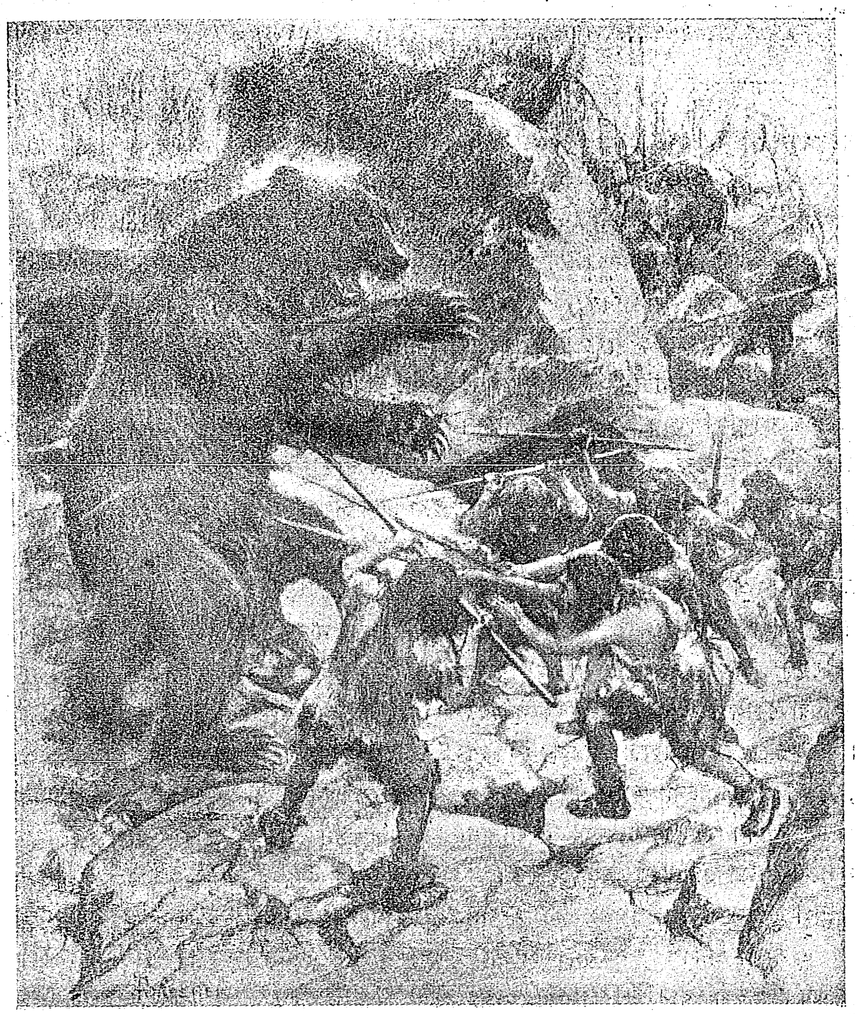

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের ভালুক

সময়ের ভালুকরা সেই সময়ের মানুষদের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না।

খবরের কাগজ

কপিঞ্জল

(নক্সা)

জ্ঞানই শক্তি। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগৎপতির পুত্র এই মানব-জাতি একান্ত জ্ঞান পিপাসু। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হইবার স্পৃহা তাহার অস্থিমজ্জাগত। বিপুল পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, সুবৃহৎ মানব-পরিবারের কোথায় কি ঘটিতেছে, ইহা জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। সে অনন্ত পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই খবরের কাগজের সৃষ্টি। সুতরাং ইহার আধ্যাত্মিক মূল্য বার্ষিক মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। খবরের কাগজ শিক্ষার একটী সচল বাহন। ইহা রাজাকে উপদেশ দেয়, মূককে বাচাল করে, মূর্খকে পণ্ডিত করে, শান্তকে হুজুগে করে। ইহা পরমানন্দ মাধবের কৃপা বই আর কিছুই নহে।

এহেন খবরের কাগজ প্রকাশ করা সহজ-সাধ্য রহিল না। যদি ইহার বিলোপ হয়, এমন ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। রাজদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার নবকলেবরের একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত দোষ পরিহার করিয়া কিরূপে ইহা চলিতে পারে, তাহার আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে। খবরের কাগজের খবরই প্রাণ। যদি নূতন খবর না থাকিল তাহা হইলে উহা ফুটানো সোডা ওয়াটারের ন্যায় বিস্বাদ।

অনেক চিন্তা করিয়া কতকগুলি চিরন্তন সত্য সংবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সকল প্রকাশ করিলে, রাজদ্রোহে পড়িবার সম্ভাবনা কম। ইহা পাঠ করিলে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইবে, পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, এমন কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভেরও সম্ভাবনা। ভগবানের লীলা যেমন নিত্য, সংবাদগুলিও তেমনি নিত্য।

আদর্শ।

(Reuter)

নাগলোকে বেঙের অভাব হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ফরাসী দেশ হইতে খাদ্যসম্ভার লইয়া কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি রওনা হইয়াছেন। সুন্দরবনের অজগরগণ সভা করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন; কিন্তু চাঁদা তোলার চেষ্টা করেন নাই।

মহাচীনে একটী কদলীবৃক্ষ তিনছড়া দগ্ধ কদলী প্রদর্শন করিয়াছে। এই কলা লইয়া একটা আন্তর্জাতিক কলহ না বাধিলেই মঙ্গল।

লঙ্কাদ্বীপে একপ্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পাতা সবুজ, এবং ফল মিষ্ট। তাহাতে লাভজনক ব্যবসায় চলিতে পারে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বিদ্যা হইতে অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ লঙ্ক যোগে রওনা হইয়াছেন।

উচ্ছন্ন নামক নবাবিষ্কৃত দেশটীকে বসবাসের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার মধ্যেই দোকান, হোটেল, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আড়ত খোলা হইয়াছে। একা বাঙ্গলা হইতেই প্রায় দুই হাজার যুবক সেখানে যাইবার জন্য এবং উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তুত।

মিঃ গালিভার ভারত পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের সহিত লিলিপুটের অনেকটা মিল আছে।

মিঃ গাউট সি-আই-ই এবার স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা হইলেন। অনেকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করিবেন।

তুতঙ্কামন মিশরের রাজা হইলেন।

বরুণপুরে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছে। ইন্দ্ররাজার নিকট আবেদন করায় বিষময় ফল হইয়াছে, তিনি জলকর বসাইয়া দিয়াছেন। মৎস্যের চাষ চলিতে পারে কি না

পরীক্ষা করিবার জন্য মৎস্য বিভাগের কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আসিয়াছেন।

দশের কথা।

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; শকুন্তলা সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা করিবেন।

* * * *

লর্ড সদাশিব কৈলাস ত্যাগ করিয়াছেন, দক্ষযজ্ঞ দর্শন করিয়া তথায় অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। তার পর তারকেশ্বরের এলোকেশী ও মহান্তের ডেপুটেশন গ্রহণ করিয়া কামাখ্যা রওনা হইবেন।

* * * *

সাধু জরদ্‌গব ১৩৩৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১লা এপ্রিল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে।

* * * *

নিউটন নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া এবার নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

* * * *

কালিদাস নামক বাঙ্গালী কবি উজ্জয়িনীর রাজকবি হইয়াছেন। বাঙ্গালী বীর দুর্গাদাস রাজপুতানায় এবং বাঙ্গালী যুবরাজ লিওনিদাস গ্রীসের থার্মোপলিতে অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

* * * *

খলিফা হারুণ আল্ রসিদ বাগদাদের বিখ্যাত নাবিক-সদাগর সিন্ধুবাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন।

* * * *

আলাদীন তাঁর আশ্চর্য্য প্রদীপটী বিশকোটী টাকায় বীমা করিয়াছেন।

* * * *

বাগদাদের খলিফা গুণের বড়ই পক্ষপাতী। তিনি এক জন বাঙ্গালী মুসলমানকে মন্ত্রীত্ব দিবার বাসনা করিয়াছেন। চারিদিকেই বাঙ্গালীর জয়জয়কার। আমরা ভাবী মন্ত্রীকে অভিনন্দিত করিতেছি—

'জয়যাত্রায় যাওহে উঠ জয়রথে তব'

* * * *

মহাবীর আলেক্‌জণ্ডার শুদ্ধি লইয়া হিন্দু হইয়াছেন। তাঁহার নূতন নাম হইল অলীকচন্দ্র শর্ম্মা। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন।

* * * *

সেখ সাদী তাঞ্জিমের সেক্রেটারী হইলেন।

আইন আদালত।

নারদ নামে একটী স্বামীর উপর সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক কলহ বাধাবার জন্য ১৪৪ ধারা জাহির হইয়াছে। তিনি আর ভারতের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে পারিবেন না। তাঁহার টেঁকীটী ক্রোক করা হইয়াছে। সেটী কুমীর হয় কি না দেখিবার জন্য লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। পুলিশ অগত্যা গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। ৪৯ জন লোক ধৃত ও বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

জাষ্টিস্ পাইলেটের এজলাসে যীশুখৃষ্টের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

সক্রেটিসের মামলা এক মাসের জন্য মুলতুবী রহিল।

ভিনিসে Antonioর বিচার লইয়া একটা দারুণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

মিঃ লাঙ্গলচরণ আঢ্যের এজলাসে মুরগী-চুরির গুরুতর অভিযোগে এক নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য্য অভিযুক্ত হইয়াছেন। সুযোগ্য বিচারক মামলাটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা সেসন্ সোপরদ্দ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ৫২৬ করিয়াছে। হাইকোর্ট রুল জারি করিয়াছেন। হাকিমের অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রশংসনীয়।

সৈয়দ ইয়ার মহম্মদ এবার কালীপূজার রাত্রিতে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করেন। কয়েকজন প্রাচীন ধর্ম্মান্ধ মুসলমান বাধা দেওয়ায় সদনুষ্ঠান হইতে পায় নাই। মামলা রুজু হইয়াছে।

হাজি শমস্‌উদ্দীনের দৌহিত্র তাঁহার নামাজের সময় টুমটুমি বাজানর জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। বালক

শুদ্ধির ভয় প্রদর্শন করায় ব্যাপারটী আপোষে মিটিয়া গিয়াছে।

নারী-নিগ্রহ।

রামচন্দ্র নামক একজন বিদেশী যুবক পঞ্চবটীতে সূর্পনখা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার নাসিকা ছেদন করায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রোহিনী নাম্নী ব্রাহ্মণ বিধবার কেশ কর্ত্তন করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছেন। জমিদারের অত্যাচার আর কতদিন লোকে সহ্য করিবে? রায়ত সভা কি করিতেছেন?

মহিলার কাণ্ড।

পুতনা নামে এক সুন্দরী যুবতী স্তনে বিষ মাখাইয়া বহু দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণনাশ করিয়া বেড়াইত। এবার গোকুলনগরে তাহার কাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। গৃহলক্ষ্মীরা সাবধান!

বিধবা-বিবাহ।

মন্দোদরীর সহিত বিভীষণের বিধবা বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যার অনুসরণে বিধবা বিবাহ রাক্ষস-সমাজে এই প্রথম।

অসবর্ণ-বিবাহ।

ভীমসেন শ্রীমতী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। অসবর্ণ বিবাহ বিল কবে পাস হইবে!

মহারাজ শান্তনু মাহিষ্য-কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ভারতে নবযুগের উদ্বোধন করিলেন।

সমাজ-শাসন।

চণ্ডীদাস একঘরে হইয়াছেন। এক নকুল পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহার সঙ্গে পংক্তি-ভোজন করেন নাই। চণ্ডীদাস বোধ হয় বিলাত-প্রত্যাগত।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম।

গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ হইয়াছে। পিণ্ড দিবার জন্য লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বলীরাজা বামনকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন।

লোমশ মুনি হরিনাম করিতে করিতে অকালে স্বইচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজী সন বা বাঙ্গালা শকাব্দায় তাঁহার বয়সের পরিমাণ হইবে না বলিয়া কত বয়স জানা গেল না।

চুরি-ডাকাতি

গরিবপুরের ন্যাংটেশ্বর বাবু জমিদারের গৃহে দিনদুপুরে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। থানায় সংবাদ দেওয়ায় পুলিশ আসিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি নিজের হেপাজতে লইয়া তাঁহার চৌর্য্য-ভয় নিবারণ করিয়াছেন। ন্যাংটেশ্বর বাবু এইবার নিশ্চিন্ত মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তজ্জন্য একটী লোটার দরকার। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সদাশয় ডাকাত-দল ডাকযোগে তাঁহাকে একটী সুন্দর কটকী লোটা পাঠাইয়া দিয়াছে। দস্যুরও ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়।

সুমস্তক নামক মণিটী সম্প্রতি অপহৃত হইয়াছে—অনেকে মথুরেশকে সন্দেহ করিতেছে। কু লোকে বলে বাল্যকালে তিনি সৎস্বভাবের ছিলেন না। দেখা যাক ব্যাপার কি দাঁড়ায়। শেষে হোলকারের মত না হয়।

খুন!

ভাস্করক সিংহকে কে খুন করিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ড্যালিলা স্যাম্‌সনকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

সঙ্কট আইন।

আমোদ ও রসিক নামে দুই গুণ্ডা সঙ্কট আইনে বাঙ্গলা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মন্দির-ধ্বংস।

মামুদ গজনী নামক একটা লোক দাঙ্গা করিয়া সোমনাথের মন্দিরটী ধূলিসাৎ করিয়াছে। সংবাদদাতা একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তথাপি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

মসজিদ ভাঙ্গিয়া গুরুদ্বার।

শিখেরা অমৃতসরে একটী মসজিদ ভাঙ্গিয়া গুরুদ্বার তৈয়ার করিয়াছে এইরূপ গুজব। সোমনাথের ঢেউ ওখানে গড়াইয়াছিল না কি?

বাজার দর।

সায়েস্তা খাঁ দুদিনেই দেশ সায়েস্তা করিয়া দিয়াছেন। টাকায় ৪ মণ চাউল বিকাইতেছে।

ভোটের জন্য সর্ষপ তৈলের দর অত্যধিক চড়িয়াছে। খেঁসারি মুগের দরে এবং ভেড়া ঘোড়ার দরে বিক্রীত হইতেছে।

স্বর্গে পমফ্রেড মৎস্যের দর চড়িয়াছে।

বাজারে নূতন সরিষা ফুলের আমদানী হইয়াছে। দেখিবার জন্য বাঙ্গালীদেরই সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহ।

সেয়ারের বাজার।

শ্রীশ্রীঘণ্টেশ্বরী টি কোম্পানী লিমিটেডের সেয়ার ২ টাকা চড়া মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

বৈতরণী নাভিগেশন কোম্পানীর সেয়ার দশটাকা ধরাট দিয়াও লোক পাইতেছে না।

চুলো একস্‌প্যানসান স্কীম কোম্পানীর সেয়ার প্রায় সব বিক্রয় হইয়া গেল—৫০৲ টাকা above par.

কর্ম্মখালি।

এবার চিত্রগুপ্তের দপ্তরে বিশহাজার কর্ম্মচারী আবশ্যক। ভারতবর্ষ হইতেই শতকরা ৮০ জন লওয়া হইতেছে। Indianisation of service ওখানে একটা খেয়াল দাঁড়াইয়াছে। এক বাঙ্গলা হইতেই লওয়া হইয়াছে শতকরা ৪৯ জন। তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৭৫টী চাকুরী বাঙ্গালীর জন্য রক্ষিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই লইয়া হিন্দু মুসলমানে এখানে বিবাদ না বাধে!

মাসিক দশটাকা ভাতায় দশজন ম্যাট্রিক পাস শিক্ষা-নবীশ আবশ্যক। গাভী পরিচর্য্যাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহাদের আবেদন অধিক আদরণীয় হইবে।

মাসিক একশত টাকা বেতনে ভদ্র অন্তঃপুরে নৃত্যগীত শিখাইবার জন্য একজন আদর্শচরিত্রা নটীর প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে দেবতার ভোগ রন্ধনের জন্য একজন নিষ্ঠাবান বাবুর্চ্চি আবশ্যক। বেতন গুণানুসারে।

জাহাজী খবর।

মিঃ বেরিবেরি কলিকাতা বন্দরে নামিয়াছেন।

মহামায়ার ভ্রাতা, হিমগিরির পুত্র শ্রীমান মৈনাক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় সাগরে গা ঢালিয়াছেন, যেন পরজন্মে পাস করিতে পারেন।

* * * *

ডিঙ্গা মধুকর তুষার-ক্ষেত্রে ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হইতেছে।

বেহুলার মন্দাশ ফিরিয়াছে। লখিন্দর সাগর-বায়ু সেবন করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন। গাঙ্গুর নদীতে এবং চম্পাই নগরে আনন্দের উৎসব-বন্যা বহিতেছে।

বৈজয়ন্তধামের প্রমোদালয়ে পঞ্চানন্দের 'বিহারে বেঘোরে চড়িনু এক্কা' ও পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের 'বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দিব না' নামক প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত দুখানি রেডিও বেতারে গীত হইয়াছিল। শ্রোতা দেবগণ ভক্তিভরে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আবার গঙ্গার উদ্ভব হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

সমালোচনা

ফষ্ট :—জার্ম্মাণ কবির এ পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। ইহা একটী ভোজের বিবরণ—কি কি সন্দেশ হইয়াছিল তাহারও তালিকা আছে। কথাটা ফিষ্ট। জার্ম্মাণ উচ্চারণ পৃথক।

জুলিয়াস সিজর :—সেক্ষপীর-জীবনীখানি বেশ সুপাঠ্য। লেখকের হাত কাঁচা, তবে অনুশীলন করিলে উন্নতি করিবেন।

যোগদর্শন :—পতঞ্জলি। এইরূপ গাঁজাখুরী পুস্তক এ-যুগে অচল। এই ভাবে বুজরুক তৈয়ার করিলে দেশ উৎসন্নে যাইবে। ইউরোপ হইলে গ্রন্থকারকে পুড়াইয়া মারিত। চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে।

চার্ব্বাক :—ইহা একখানি তথাকথিত দর্শন। বাস্তবিক ইহা একটী ঘৃতের দোকানের পুরস্কার-রচনা। কৌশলে ইহাতে ঘৃতের কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বলিয়া গ্রাহকগণকে প্রলোভিত করা হইয়াছে। ককোজেম, ভেজিটেবল ঘি, বাদামের তৈল প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ এক সাহিত্যিক অভিযান।

কুন্তলকণ্টক তৈল :—ইহা পুস্তক নহে, কেশ তৈল। শ্রীযুক্ত কৃতান্তমোহন কবিরাজ এই মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন। একবার মাখিলে আর মাখিতে হয় না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কেশদাম উঠিয়া গিয়া মস্তক বেশ মসৃণ করে। এই তৈলের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

বাদসাহী ভেঁপু :—তানসেন কোম্পানী ইহার নির্ম্মাতা। ইহাতে সারে গামা সাধা চলে, সাধিলে তিনদিনে কালোয়াৎ হওয়া যায়। তানসেন স্বয়ং এই ভেঁপু বাজাইয়া আকবর শাহকে মোহিত করিয়াছিলেন।

বালকরঞ্জন বিঁড়ি :—হেল কোম্পানী লিমিটেডের প্রস্তুত। ইহার তামাক বেশ মিঠে-কড়া,—বালকদের উপযোগী; অধিক কাসিতে হয় না। আমরা শুনিলাম, কলিকাতার সেনেট সভা ইহার প্রচারের বিরুদ্ধবাদী! হায় রে ইংরাজী শিক্ষা,—বিলাতী না হইলে কোনো জিনিষ মনে ধরে না।

সরস্বতী হুইস্কী :—আমরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি, তথাপি সাহ মহাশয়ের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি ইহার সহিত সরস্বতীর নাম সংযোগ করিয়া দীনা বীণাপাণিকে গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। হিন্দু মাত্রেই তজ্জন্য কৃতজ্ঞ। হুইস্কী ও ব্রাণ্ডির বিজ্ঞাপন আমাদের সাময়িক পত্রগুলিকে সুশোভিত করিতেছে।

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি

জয়ন্ত :—নন্দনভিলা :—আপনার প্রবন্ধে উর্ব্বশীর নাচের যে সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ মুন্সীয়ানা আছে। আপনি সালোম নাচ প্রভৃতির যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সমজদারের উপভোগ্য। আমরা উহা আগামী সংখ্যায় ছাপিব।

বৃহস্পতি :—আপনার প্রবন্ধটী নিতান্ত অসার। উহাতে না আছে জ্ঞান, না আছে গবেষণা, না আছে ভূয়োদর্শন। এমন কি শব্দ-জ্ঞানেরও পরিচয় উহাতে নাই। আপনি বোধ হয় শিশু। 'শতংবদ মা লিখ' কথাটী স্মরণ রাখিবেন।

লুলু—হনলুলু :—আপনার অঙ্কিত চিত্রের ব্লক এদেশে কেহ প্রস্তুত করিতে পারিল না।

ভুষণ্ডি—থানেশ্বর :—ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আমরা ছাপি না। এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় পাঠাইবেন।

সমাপ্ত

প্রথম বাঙ্গালী *

(দ্বিতীয় তালিকা)

গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন, লর্ড সিংহ।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রথম প্রেসিডেণ্ট, নবাব সার সামসুল হুদা।

রেজিষ্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটী, রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর।

ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারল অফ্ রেজিষ্ট্রেশন রায় টি, কে, ঘোষ বাহাদুর।

বড়লাটের কাউন্সিলের ফাইনেন্স মেম্বর স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র (অস্থায়ী)।

সৈনিক বিভাগে এরোপ্লেন ডিপার্টমেণ্টে কিংস কমিশন পান মিঃ রায়।

মধ্যপ্রদেশের জুডিসিয়াল কমিশনার স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু।

একাউণ্টেণ্ট জেনারল, সেণ্ট্রাল রেভিনিউজ মিঃ উপেন্দ্রলাল মজুমদার সি-আই-ই।

বিদেশে এঞ্জিনিয়ারিংএ যশোলাভ করেন মিঃ বীরেন্দ্রকুমার দে।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ও পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় হরচন্দ্র ঘোষ (১৮৫২)।

চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট (অস্থায়ী) নবাব সৈয়দ আমীর হুসেন সি-আই-ই (১৮৯৫)।

কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের জজ হরচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮)

স্মলকজ কোর্টের প্রধান জজ (অস্থায়ী) এ হাসান।

কলিকাতার করোনার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৭৭)

কলিকাতার কালেক্টর কৈলাসচন্দ্র দত্ত (১৮৫৫)

কলিকাতার ইনকম্‌ট্যাক্স কালেক্টর পি, কে, বসু (১৮৮৮)

ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, রেজিষ্ট্রেশন নবাব সৈয়দ আমীর হুসেন (১৮৯৫) (অস্থায়ী)।

কুমার গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব (১৮৯১) (স্থায়ী)।

এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জীনীয়ার ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৪)।

সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (১৯০১)।

বাংলা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী।

কলিকাতা হাইকোর্টের লিগ্যাল রিমেম্ব্রানসার বিহারীলাল গুপ্ত।

ডিরেক্টর জেনারেল অব পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস মিঃ জি, পি, রায়।

আবগারী বিভাগের কমিশনার স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই-সি-এস।

প্যারিসের ডি-লিট্ ডাঃ কালিদাস নাগ।

আমেরিকার কলেজে অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রিন্স উপাধিধারী দ্বারকানাথ ঠাকুর।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যাঃ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ জাষ্টিস যতীশরঞ্জন দাশ।

চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ডাইরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ মিঃ ডি, সি, গুপ্ত।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভানেত্রী প্রথম বাঙ্গালী মহিলা শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী।

আইন পরীক্ষোত্তীর্ণা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা রেজিনা গুহ।

চীন দেশ হইতে সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি ডাঃ পি, কে, রায়।

ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

নাইট উপাধি বর্জ্জন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালাভাষায় রেখাক্ষর প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বাঙ্গলা মাসিক পত্র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী।

---

* গত শ্রাবণ (১৩৩৩) মাসের ভারতবর্ষে "প্রথম বাঙ্গালী"র তালিকা প্রকাশিত হইবার পর শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী "প্রথম বাঙ্গালী"র দ্বিতীয় তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন; এবং আরও অনেকে এক একটী করিয়া তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীমতী হিমাংশুবালার দ্বিতীয় তালিকা অবলম্বন করিয়া, এবং তৎসহ অন্যান্য তালিকায় লিখিত প্রথম বাঙ্গালীর নামগুলি যোগ বিয়োগ করিয়া একসঙ্গে এই দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুত হইল। অন্যান্য প্রেরকগণের নাম, যথা, স্বামী শুদ্ধানন্দ, শ্রীবিজয়কুমার বড়াল, শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি-এ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামাম্বুজ কর, শ্রীবলাইচাঁদ দে, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, শ্রীভুজঙ্গভূষণ ঘোষ, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত, শ্রীবিভূতি রায় চৌধুরী প্রভৃতি।—

গত বারের তালিকায় একটী মারাত্মক ভুল ছিল। বেলুনে উঠেন প্রথম বাঙ্গালী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন।

অভিনয়োপযোগী নাটক-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার।

সংস্কৃত অভিধান-সঙ্কলয়িতা স্যার রাধাকান্ত দেব।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জগদীশনাথ রায়।

ভারতের বাহিরে কুস্তীগীর পালোয়ান যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর)।

বঙ্গভাষায় অমিত্র ছন্দ প্রবর্ত্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতার সেরিফ দিগম্বর মিত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাতে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা তরু দত্ত।

লাহোর চীফ কোর্টের জজ সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ ও অস্থায়ী প্রধান জজ সার আবদর রহিম।

বিলাতে হাই কমিশনার সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র (অস্থায়ী) ; সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্থায়ী)।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ সার প্রমদারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান জজ সার বসন্তকুমার মল্লিক।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ আমীর আলি।

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার রাজা দুর্গাচরণ লাহা।

দেশের কাজে জেল খাটেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে-সি-এস-আই উপাধি পান সার রাধাকান্ত দেব।

এম-এ পাশ করেন প্রথম বাঙ্গালী মহিলা চন্দ্রমুখী বসু।

এফ-জেড্-এস উপাধি পান সত্যচরণ লাহা।

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পি, কে, রায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-ভাইস-চ্যান্সেলার যদুনাথ সরকার।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্ণর হৃষীকেশ লাহা।

বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহের আন্দোলনকারী রাজা রাজবল্লভ।

বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রথম বাঙ্গালী কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয়)।

বিলাত যাত্রা করেন রামমোহন রায়।

ষ্টাটুটারী সিবিলিয়ান সূর্য্যকুমার অগস্তি।

বিলাতে ডাক্তারী পাশ করেন গুডিভ চক্রবর্ত্তী।

সখের সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করেন ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

London Universal Races Congressএর সভাপতি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে, International Laws and Politicsএ পিএইচ্-ডি তারকনাথ দাস।

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের জজ স্যর আশুতোষ চৌধুরী।

Meteorological officer প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

রুড়কী এঞ্জিনিয়ারীং কলেজের পাশ করা এঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র।

ধাত্রী বিদ্যায় পাশ্চাত্য জগতকে চমৎকৃত করেন—ডাঃ কেদার দাস।

বড় লাটের কাউন্সিলের আইন সদস্য স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

ডক্টর অব্ সায়ান্স উপাধি পান অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বার্লিনের ডি-এস্সি প্রথম বাঙ্গালী মহিলা—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।

শিক্ষাবিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টার ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বিদেশে মিউজিক ডক্টর উপাধি অর্জ্জন এবং ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করেন দিলীপকুমার রায়।

উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনীর সভাপতি কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়।

ওয়াশিংটন লেবার কনফারেন্সে প্রতিনিধি স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইম্পীরিয়াল কনফারেন্স ও লীগ অব নেশন্সে প্রতিনিধি লর্ড সিংহ

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভাইস প্রেসিডেণ্ট স্যার কে, জি, গুপ্ত

ইম্পীরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে প্রতিনিধি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটক উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বভারতীর প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্ভিদে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণকারী স্যার জগদীশ বসু।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানে বিশেষ নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বাঙ্গলার (অস্থায়ী) ইন্স্পেক্টর জেনারেল অব সিবিল হস্পিট্যালস ডাক্তার আর, সি, চন্দ্র আই-এম-এস।

বিলাতী এম-ডি ডাক্তার ভোলানাথ বসু।

ইন্টারন্যাসন্যাল্ ফিলজফিক্ কংগ্রেসে প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

আই-এম-এস্'এ প্রথম বাঙ্গালী রসিকলাল দত্ত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকারী সভাপতি (অস্থায়ী) গোপাললাল মিত্র।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বেসরকারী সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নবাব নবাবআলি চৌধুরী ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার্ জি, এন্, চক্রবর্ত্তী।

দেশীয় রাজ্যে বিখ্যাত মন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষায় সর্ট্হাণ্ডের প্রবর্ত্তক দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।

লণ্ডনের রয়েল ইকনমিক সোসাইটির সদস্য—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়াল ঐতিহাসিক সোসাইটির সদস্য—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

চিতোর

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

রাত্রি ১০ টার সময় আজমীর হইতে ট্রেণ ছাড়িল। সকালে ৬টার সময় চিতোরগড় ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া দুইটি টাঙ্গা ভাড়া করিলাম এবং চিতোরগড় পাহাড় অভিমুখে চলিলাম। ষ্টেশনের নিকট ডাক-বাঙ্গলো, কয়েকটি দোকানঘর এবং একটি পুলিসের থানা আছে। থানা হইতে গড় দেখিবার জন্য অনুমতি-পত্র (pass) পাইলাম। দুইটি টাঙ্গার জন্য ।০ আনা করিয়া ॥০ মাত্র লাগিল। তাহার পর প্রান্তরের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। পলাশ-বৃক্ষের পত্রহীন শাখাগুলি লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। অদূরে পূর্ব্বগগনে চিতোর পাহাড় দেখা যাইতেছিল। পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে মন্দির বা প্রাসাদ-শীর্ষ দেখা যাইতেছিল। আমাদের পথ কিছুদূর পর্য্যন্ত উত্তর দিকে গিয়া তাহার পর পূর্ব্বদিকে চলিল। একটি ক্ষুদ্র নদী পার হইলাম। নদীর নাম গম্ভেরা। কোথাও বালুকাময় নদী-সৈকতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও নদীর কাল জলে তীরস্থ বৃক্ষ-রাজির এবং নীল আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। রাজ-পুত রমণীগণ কলসীকক্ষে নদীতে জল আনিতে যাইতেছিল। পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি বড় গ্রাম। গ্রামের নাম তলহাটি। গ্রামটি চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। দ্বারপথে একজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল। আমাদের পাশ দেখিয়া সে যাইতে দিল। দুই পাশে দোকান, মধ্যে পথ। একটি সীতারামের মন্দির ও ডাকঘর দেখিলাম। অবশেষে আমরা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি বৃহৎ দরজা পাহাড়ে উঠিবার পথ রক্ষা করিতেছিল। দরজার প্রকাণ্ড কপাট বহুসংখ্যক লৌহ-শলাকা দ্বারা রক্ষিত। হাতী যাহাতে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য ধাক্কা দিতে না পারে সেজন্য এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। দরজার বাহিরে পাহাড় অত্যন্ত খাড়া। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পাথর। পাহাড়ের নিম্নভাগ জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলে হরিণ, বাঘ, এমন কি পূর্ব্বে সিংহও থাকিত।

পাহাড়ে উঠিবার পথটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের উপরিভাগে কাঙ্গড়া (battlement)। পথটি দুইবার ফিরিয়া ইংরাজী z অক্ষরের আকারে উপরে উঠিয়াছে ; এবং পাহাড়ের উপরিভাগ সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত করিয়া যে প্রাচীর আছে সেইখানে গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রাচীর এবং কাঙ্গড়া সম্প্রতি মেরামত করা হইয়াছে। কাঙ্গড়াগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। রাজপুত কবিগণ এই কাঙ্গড়া-সমলঙ্কৃত প্রাচীরকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুকুট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দূর হইতে ইহা মুকুটের মতই দেখায়। ফটক পার হইয়া আমরা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। পথের একপাশে প্রাচীর, অপর পাশে পাহাড় ; পাহাড়ের উপর ধাও গাছের জঙ্গল। প্রাচীরে সংলগ্ন একটি প্রস্তর-বদ্ধ বিস্তৃত উচ্চ পথ রহিয়াছে। দুর্গ রক্ষা করিবার সময় সৈনিকগণ এই পথে চলাফেরা করিত এবং প্রাচীর-নিহিত অন্তরালের মধ্য দিয়া শত্রুদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত বা অস্ত্র নিক্ষেপ করিত। পাহাড়ে উঠিবার সময় মাঝে মাঝে প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী দেখিতে পাইলাম। বেদীর উপর সুন্দর কারুকার্য্য। এগুলি ইতিহাসের অতীত ঘটনার স্মৃতি-চিহ্ন। আমরা একে একে সাতটি সুদৃঢ় দরজা পার হইলাম। তাহাদের নাম পটলপোল, ভৈরবপোল, হনুমানপোল, গণেশপোল, জোড়লাপোল, লক্ষ্মণপোল ও রামপোল। পথটি প্রায় একমাইল দীর্ঘ। চিতোরগড়ে প্রবেশ করিবার ইহাই সর্ব্বপ্রধান পথ। ইহা পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার ইহা ছাড়া আরও দুইটি পথ আছে। একটি পূর্ব্বদিকে, অপরটি উত্তর দিকে। রামপোলের নিকটেই দুখিয়ানা ; বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রাজপুত সর্দ্দারগণ এখানে মিলিত হইতেন। প্রবাদ এই যে, আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পূর্ব্বে এখানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া রাণাকে বলিয়াছিলেন "ম্যা ভুঁখা হুঁ" (আমার ক্ষুধা পাইয়াছে)।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চিতোর পাহাড়ের উপরি-

ভাগ প্রায় সমতল। ইহা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ এবং আধ মাইল প্রস্থ। পাহাড়ের উপর ভাল রাস্তা আছে। তাহাতে গাড়ী চলে। আমরা পাহাড়ে উঠিয়া একজন পথ-প্রদর্শক লইলাম। লোকটি জাতিতে হিন্দু দর্জি। পাহাড়ের অধিকাংশ ভগ্নস্তূপে সমাচ্ছন্ন। কয়েকখণ্ড জমিতে চাষ হয় দেখিলাম। পথে একটি ক্ষুদ্র দেবীর মন্দির রহিয়াছে। দেবীর নাম তুলজা ভবানী। মন্দির পার হইয়া আমরা গোমুখা গঙ্গা নামক স্থানে চলিলাম। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, মীরাবাঈয়ের মন্দির, উদয়পুরের রাণার নূতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া দুইচারি মিনিট ভগ্ন গৃহ এবং দেবালয়ের পাশ দিয়া চলিয়া আমরা নীচে নামিবার প্রশস্ত সুগঠিত সোপানশ্রেণী পাইলাম। সোপানশ্রেণী সম্প্রতি সুন্দর ভাবে মেরামত করা হইয়াছে। উদয়পুরের আধুনিক রাণাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিবার এই চেষ্টা প্রশংসার্হ। সিঁড়ি দিয়া কিছুদূর নামিয়া আমরা একটি কুণ্ড বা ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি খুব প্রাচীন। ইহার জল কিয়ৎ পরিমাণে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটি পাহাড়ের এক প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে দুর্গ-প্রাচীর। কুণ্ডটির পূর্বদিকে একটি শিবালয় আছে। শিবালয়ের মধ্যে একটি ছোট ঝরণা আছে। ঝরণার জল অতি পরিষ্কার এবং পান করিবার উপযোগী। এই জল কুণ্ডের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এখানে একটি সুড়ঙ্গের মুখ আছে। এই সুড়ঙ্গ না কি এখান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই শিবালয়ের উপর একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। তাহার মধ্যে আমরা জিনিষপত্র রাখিলাম এবং নিকটে একটি উন্মুক্ত স্থলে বৃক্ষতলে রাঁধিবার উদ্যোগ করিলাম। পাচক ও ভৃত্যকে এখানে রাখিয়া আমরা শীঘ্র দর্শনীয় স্থান সকল দেখিতে চলিলাম; কারণ, ক্রমশঃ রৌদ্রের তেজ প্রখর হইতেছিল। এখান হইতে গাড়ী করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। পশ্চিমে পুত্ত ও জয়মল্লের বাসভবন দেখিতে পাইলাম। নিকটে একটি সরোবর দেখাইয়া পথ-প্রদর্শক বলিল, ইহা সূর্য্যকুণ্ড,—আকবরের সহিত যুদ্ধের সময় এখান হইতে প্রত্যহ যোদ্ধৃবর্গ সহিত রথ নির্গত হইত। অবশেষে মুসলমানগণ গোরক্ত দ্বারা ইহা অপবিত্র করিয়া দিল। তাহার পর আর রথ বা যোদ্ধা উঠিল না। টডের রাজস্থানে কিন্তু উল্লেখ আছে যে, মেওয়ারের রাণাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান গুজরাটের নিকটবর্ত্তী বল্লভীপুরে একটি সূর্য্যকুণ্ড ছিল; এবং বল্লভীপুর যখন বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়, সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সূর্য্যকুণ্ডের নিকটে আরও দুই একটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সর্বশুদ্ধ পাহাড়ের উপর ৩২টি পুষ্করিণী এবং একটি ঝরণা আছে। এ কারণ পাহাড়ের উপর জলকষ্ট হইত না। সূর্য্যকুণ্ড পার হইয়া একটি মন্দিরের নিকট আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। মন্দির-প্রাঙ্গণটি পথ হইতে খুব উচ্চ; অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। শুনিলাম, ইহা কালীর মন্দির। বিগ্রহটি সাদা পাথরের। কেবল মুখটি দেখা যায়, অবশিষ্টাংশ লাল কাপড় দিয়া ঘেরা। মূল মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। চারি সারি স্তম্ভের উপর নাটমন্দিরের ছাদটি অবস্থিত। মন্দিরে পুরোহিত আছেন, এখনও পূজা হয়। (১) কালীর মন্দির দেখিয়া আমরা পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখিতে চলিলাম। কালীর মন্দির এবং পদ্মিনীর প্রাসাদের মধ্যে বীরবর চণ্ডের স্মৃতি-মন্দির ("Vaulted cenotaph of Chonda") আছে বলিয়া টড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের ইহা দেখা হয় নাই। পদ্মিনীর প্রাসাদটি এখনও সম্পূর্ণ অভগ্ন এবং ব্যবহার-যোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে যখন আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, তখন চিতোরের সকল গৃহ এবং দেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন—কেবল পদ্মিনীর প্রাসাদ ভাঙ্গেন নাই (২)। পদ্মিনীর

(১) The shrine of Kalika Devi esteemed one of the most ancient of Chitor, existing since the time of the Mori, the dynasty prior to the Guhilot—(Tod's Rajasthan). Erskine সাহেবের মতে ইহা পূর্বে সূর্য্যের মন্দির ছিল।

(2) Alla remained in Chitor some days admiring the grandeur of his conquest; and having committed every act of barbarity and wanton dilapidation which a bigotted zeal could suggest, overthrowing the temples and other monuments of art, he delivered the city in charge to Maldeo, the chief of Jhalor whom he had conquered and enrolled amongst his vassals. The palace of Bheem and the fair Padmini alone appears to have escaped the wrath of Alla.—Tod's Rajasthan, p. 222.

সময় প্রাসাদের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার পর কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। চিতোরে উদয়পুরের রাণার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রাণারা চিতোরে আসিলে পদ্মিনীর প্রাসাদেই বাস করিতেন। এজন্য প্রাসাদটি সম্পূর্ণ বাসযোগ্য অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। এখানে কিছু কিছু আসবাবও আছে। প্রাসাদটি একতলা এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র মহলে বিভক্ত। প্রত্যেক মহল চারিধারে উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। এক একটি মহলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের পাশে কয়েকটি করিয়া ঘর। কোন মহলে বৈঠকখানা, কোনটিতে বসিবার ও শুইবার ঘর, বা পূজার ঘর। ঘরগুলি আকারে ছোট। একটি ঘরে একটি বৃহৎ আয়না একটি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার দেখিলাম। মনে পড়িল সেই আয়নার কথা, যাহার মধ্যে আল্লাউদ্দিনকে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখান হইয়াছিল। প্রাসাদের পার্শ্বেই জলাশয়। জলাশয় গভীর, বহু নিম্নে সামান্য জল রহিয়াছে দেখা গেল। জল ধরিয়া রাখিবার যখন বন্দোবস্ত ছিল, তখন জলাশয়টি প্রচুর জলে পূর্ণ থাকিত বোধ হইল (৩)। অদূরে জলাশয়ের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম (৪)। শুনিলাম, জলাশয় যখন জলপূর্ণ থাকিত, তখন উভয় প্রাসাদের মধ্যে নৌকা চলিত।

পদ্মিনীর প্রাসাদ চিতোরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পর আর বড় একটা ঘরবাড়ী বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। (৫) স্থানটি কতকটা সহরতলির (Suburb) এর মত। পদ্মিনীর প্রাসাদে দাঁড়াইয়া পদ্মিনীর কাহিনী মনে হইল। দীর্ঘ অবরোধের পরও চিতোর অধিকার করিতে না পারিয়া আলাউদ্দিন প্রথমে বলিলেন, পদ্মিনীকে পাইলেই তিনি চলিয়া যাইবেন; শেষে বলিলেন, পদ্মিনীকে একবার দেখিতে পাইলেও তিনি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত।

আল্লাকে বলা হইল, আয়নার মধ্যে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখান হইবে। আল্লা তাহাতেই রাজি হইলেন। চিতোর প্রবেশ করিয়া পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া আল্লা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, ভীমসিং ভদ্রতা করিয়া আল্লার সহিত পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গেলেন। কিন্তু তিনি যখন দুর্গের বাহিরে গেলেন, অমনি আল্লা ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন। আল্লা বলিয়া পাঠাইলেন পদ্মিনীকে পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পদ্মিনী তাঁহার পিতৃব্য গোরা এবং ভ্রাতা বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আল্লার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সহিত ৭০০ শিবিকায় সখীরা যাইবে। এই ৭০০ শিবিকা যখন মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইল, তখন প্রস্তাবমত ভীমসিং চিতোর অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আল্লা তাঁহাকেও ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই ৭০০ শিবিকা হইতে ৭০০ যোদ্ধা বাহির হইল। শিবিকার ২৮০০ বাহকেরাও যোদ্ধবেশ ধারণ করিল। বাদল ও গোরার নেতৃত্বে এই ৩৫০০ রাজপুত অলৌকিক বীরত্ব সহকারে অগণিত মুসলমান সেনার সহিত যুদ্ধ করিল। ভীমসিংহ এই অবসরে ক্ষিপ্র গতিতে অশ্বারোহণে চিতোর প্রবেশ করিলেন। রাশি রাশি মুসলমান নিহত করিয়া রাজপুতগণ প্রায় প্রত্যেকে প্রাণত্যাগ করিল। গোরা মারা গেল। রক্তাক্ত দেহে বাদল ফিরিয়া আসিল। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীর সকল মারা গেল। আল্লা বিফল-মনোরথ হইয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আল্লা চিতোরের সম্মুখে আবার দেখা দিলেন। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরগণ পূর্ব্বের যুদ্ধে মারা গিয়াছিল। এবার চিতোর রক্ষা করা দুর্ঘট হইল। পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের কিয়দংশ আল্লা অধিকার করিয়াছিলেন। রাত্রে দুশ্চিন্তায় রাণা লক্ষ্মণ সিংহের নিদ্রা হয় নাই। এমন সময় চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেখা দিলেন, বলিলেন, "ম্যাঁ, ভুখা হুঁ" (আমার ক্ষুধা পাইয়াছে)। রাণা বলিলেন, "রাক্ষসি, আমার ৮০০০ জ্ঞাতি

(৩) Todএর "রাজস্থানে" পদ্মিনীর প্রাসাদের যে চিত্র আছে তাহাতে দেখা যায়, সরোবর জলপূর্ণ রহিয়াছে।

(৪) আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, জলাশয়ের মধ্যের প্রাসাদও পদ্মিনীর প্রাসাদ। Tod সাহেবের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ইহা চিতোরের প্রাচীন পুয়ারবংশীয় রাজা চিত্রং মোরির প্রাসাদ।

(৫) Tod লিখিয়াছেন যে, পদ্মিনীর প্রাসাদের দক্ষিণে একটি পাথরের দেওয়াল-ঘেরা স্থান আছে। এখানে কুম্ভ মালবরাজকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চিতোর পাহাড়ের নিকটেই দক্ষিণে (১৫০ গজ দূরে) আর একটি পাহাড় আছে। তাহার নাম চিতোরী। এই পাহাড়ের উপর হইতে আল্লা চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, আল্লা যখন ১২ বৎসর ধরিয়া চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন মাটি ফেলিয়া এই পাহাড় বা ঢিপি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

খাইয়াছ, এখনও ক্ষুধা মিটে নাই ?". দেবী বলিলেন, "আমি রাজবলি চাই। মুকুটপট্টা, ১২ জন প্রাণ না দিলে চিতোর আর তোমাদের হাতে থাকিবে না।" রাণার ১২ জন পুত্র। সকলেই আগে প্রাণ দিতে উৎসুক হইল। একে একে ১১ জন গেল, প্রত্যেককে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল, রাজদণ্ড হাতে দেওয়া হইল, মাথায় ছত্র ধরা হইল, চামর দোলান হইল। তিন দিন সে রাজা রহিল। চতুর্থ দিনে দুর্গের বাহিরে গিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিল। যখন একে একে ১১ রাজপুত্র এইভাবে প্রাণ দিল তখন অবশিষ্ট পুত্রকে রাজা জোর করিয়া যাইতে দিলেন না,—তাহাকে সুড়ঙ্গ পথে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর জহর ব্রত হইল,—সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী একজনের পর একজন প্রজ্বলিত অনলে প্রাণ আহুতি দিলেন। সকলের শেষে পদ্মিনী। তাহার পর দুর্গের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। রাজপুতগণ শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল, রাণাও প্রাণ দিলেন। আল্লা চিতোর অধিকার করিলেন। এই প্রথম চিতোর ধ্বংস।

পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখিয়া পুত্তের প্রাসাদ দেখিলাম। আকবর যখন চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন, ভীরু রাণা উদয় সিং তখন কোন ছলে চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন চিতোর রক্ষা করিবার ভার প্রথমে লইলেন চন্দাবৎবংশীয় সহিদাস। সূর্য্যপোল নামক পূর্ব্ব দ্বারে যুদ্ধ করিতে করিতে ইনি প্রাণ দিলেন। তখন নেতা হইলেন পুত্ত। পুত্তের বয়স তখন ১৬। পুত্তের পিতা পূর্ব্বেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। পুত্ত মাতার একমাত্র তনয়। বীরমাতা পুত্রকে গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে অনুমতি করিলেন; নিজেও অস্ত্রধারণ করিয়া প্রস্তুত হইলেন। শুধু তাহাই নহে; পুত্তের বালিকা বধূর হস্তে বর্ষা দিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। রাজপুতগণ দেখিল পুত্ত, তাহার মাতা ও পত্নী সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ করিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়জনক ঘটনা আর না পাইয়া Tod লিখিয়াছেন—

Like the Spartan mother of old she commanded him to put on the 'sappron robe' and to die for Cheetore; but surpassing the Grecian dame she illustrated her precept by example and lest any soft compunctions visiting for one dearer than herself might dim the lustre of Kailwa she armed the young bride with a lance, with her descended the rock, and the dependants of Cheetore saw her fall, fighting by the side of her Amazonian mother (Annals of Mewar, p. 266.)

পুত্তের মৃত্যুর পর নেতা হইল রাঠের বীর জয়মল্ল। দুর্গ-প্রাচীরের উপর সেনা-সমাবেশ করিবার সময় জয়মল্লের গায়ে একটী গোলা লাগিল। দূর হইতে শত্রুর গোলার আঘাতে মরিতে হইবে এই চিন্তা জয়মল্লের অসহ্য হইল। আবার জহর ব্রত করিয়া রাজপুত রমণীগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট ৮০০০ রাজপুত দুর্গদ্বার খুলিয়া সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করিল (৬)। নয়টি রাণী, পাঁচটি রাজকন্যা, দুইটি শিশু এবং যাবতীয় সর্দ্দারদের পরিবারবর্গ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, নয় অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিল। মন্দির এবং প্রাসাদ ধ্বংস বিষয়ে আকবর আলাউদ্দিন, অপেক্ষা কম বর্ব্বরতার পরিচয় দেন নাই। Tod বলিয়াছেন, The third sack of Cheetore was marked by the most illiterate atrocity, for every monument spared by Alla or Bayazeed was defaced, which has left an indelible stain on Akbar's name as a lover of the arts, as well as of humanity.

চিতোরের রাজচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিবার জন্য আকবর অশোভন ব্যগ্রতা দেখাইলেন। রাণাদের চিতোর প্রবেশ বা চিতোর ত্যাগ করিবার সময় বৃহৎ নাকাড়া (drums) ধ্বনিত হইত, চারিদিকে কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত সে শব্দ শোনা যাইত,—আকবর সেগুলি লইয়া গেলেন। এগুলির ব্যাস ৮।১০ ফিট হইবে। দেবীর মন্দির হইতে ঝাড়লণ্ঠন লইয়া গেলেন; দরজা দুইটিও উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

(৬) চিতোর দুর্গে উঠিবার পথে হনুমানপোলের নিকট একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-বেদী আছে। এখানে জয়মল্ল মারা গিয়াছিলেন। নিকটে আর একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাহার উপর বর্ষাহস্তে একটি অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইখানে পুত্ত নিহত হন। নিকটে রঘুদেবেরও একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। রঘুদেব চণ্ডের ভ্রাতা। ইনি ঘাতকহস্তে নিহত হইয়াছিলেন; রাজপুতরা ইঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করে

পুত্তের প্রাসাদটি দুই তিনটি মহলে বিভক্ত। কোনটি বহির্ব্বাটী, কোনটি অন্তঃপুর। বাটীটি রাজপথ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। বাটীটি এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা ত্রিতল ছিল বলিয়া বোধ হইল। একটি কক্ষে একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পুত্তজির বিগ্রহরূপে পূজিত হয়। রাজপুতগণ সিন্দুর মাখাইয়া মূর্ত্তিটি রক্তবর্ণে পরিণত করিয়াছে। পাশে আর একটি কক্ষে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তিও পূজিত হয়। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, উহা কঙ্কালী মাতার মূর্ত্তি। আমার মনে হইল, উহা পুত্তজির মাতার মূর্ত্তি হইতে পারে। পুত্তজির প্রাসাদের নিকটে দুর্গ-প্রাচীরের পার্শ্বেই জয়মল্লের গৃহ। আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিল, পুত্তজি জয়মল্লের ভগিনীপতি ছিলেন। Tod লিখিয়াছেন—

The names of Jeimul and Putta are, as household words, inseparable in Mewar and will be honoured while the Rajpoot retains a shred of his irhertance or a spark of his ancient recollections.

জয়মল্লের বীরত্ব সম্বন্ধে Tod লিখিয়াছেন—

"Abul Fazl, Herbert, the Chaplain to Sir T. Roe, Bernier all honoured the name of Jeimul."

যে গুলিতে জয়মল্ল মারা যান, আকবর বলেন, তিনি নিজে সে গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন। আকবর সে বন্দুকের নাম দিয়াছিলেন 'সিংগ্রাম'। আকবর পুত্ত এবং জয়মল্লের বীরত্বের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাসাদের দ্বারদেশে হস্তীর উপর উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। Bernier ১০০ বৎসর পরে আসিয়া এই মূর্ত্তি দুইটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"These two great elephants, together with the two resolute men sitting on them do at the first entrance into this fortress make an impression of I know not what greatness and awful terror."

ইহা উদ্ধৃত করিয়া Tod বলিয়াছেন—

Such was the impression made on a Parisian, a century after the event; but far more powerful the charm to the author of these annals, as he pondered on the spot where Jeimul received the fatal shot from the Singram, or placed flowers on the cenotaph that marks the fall of the son of Chonda (সঁহিদাস) and the mansion of Putta whence issued the Seesodia matron and her daughteer. Every foot of ground is hallowed by ancient recollecetions.

যুদ্ধক্ষেত্রে যত রাজপুত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আকবর না কি তাহাদের যজ্ঞোপবীত একত্র করিয়া ওজন করিয়া দেখিয়াছিলেন ৭৪½ মান হইয়াছিল। চার সেরে এক মান হয়। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া চিঠির উপর ৭৪½ লিখিয়া দিলে এখনও লোকে তাহা খুলিতে ভয় পায়,—চিঠি খুলিলে চিতোর-ধ্বংসের সময় যত রাজপুত মারা গিয়াছিল, ততগুলি রাজপুত-হত্যার পাপ স্পর্শ করিবে।

আকবর চিতোর অধিকার করিয়া যে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সে ধ্বংসের আর কখনও পূরণ হয় নাই।

পুত্ত এবং জয়মল্লের বাড়ী দেখিয়া আমরা আবার গাড়ী করিয়া চলিলাম। বহু দূর পর্য্যন্ত পুত্তর প্রাসাদ এবং তাহার ঝরোকাগুলি আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে আমরা দুর্গের পূর্ব দ্বার দেখিতে গেলাম। রাণার নূতন প্রাসাদের পাশ দিয়া চলিলাম। নূতন প্রাসাদটি বেশ বড়; সমস্তটি চূণকাম করা। চিতোরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে অনেক শিকার পাওয়া যায়। রাণা শিকার খেলিবার জন্য প্রায়ই উদয়পুর হইতে আসেন এবং এই প্রাসাদে থাকেন। পূর্ব্বদ্বারের নিকট নীলকণ্ঠের মন্দির (৭) দেখিলাম। মন্দির মধ্যে সুবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ ও বেদী রহিয়াছে। পূজারী আমাদিগকে মিশ্রির প্রসাদ দিলেন। এই মন্দির দেখিয়া আমরা পূর্বদিকের দরজা দেখিতে গেলাম। আকবরের চিতোর আক্রমণের সময় এখানে সহিদাস দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। একটি প্রস্তরময় বেদী সেই ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। সূর্য্যপোলটিও খুব বড়। এখান হইতে একটি পথ পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন এখানে সংস্কার কার্য্য হইতেছিল।

সূর্য্যপোল দেখিয়া ফিরিবার সময় আমরা একটি জৈন মন্দির এবং স্তম্ভ দেখিলাম। মন্দির এবং স্তম্ভের চারিধারে বহুসংখ্যক পাথরের মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। স্তম্ভটি রাণা

(৭) এই মন্দিরটি Tod কুক্কুরেশ্বর মহাদেবের মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হইল। রাণা কুম্ভ ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কুম্ভের জয়স্তম্ভের অনুরূপ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট। এই স্তম্ভটির নাম খোয়াসিন স্তম্ভ। ইহা ৭৫ ফিট উচ্চ। Tod সাহেব এখানে ৮৯৬ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাইয়াছিলেন। এই মন্দির এবং স্তম্ভ জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গ হইয়াছিল।

এখান হইতে আমরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। ইহা লখ রাণার প্রাসাদ নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন রাণা রায়মল্ল ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদটি সুবিস্তৃত। ইহা দুই তিন তলা উচ্চ ছিল; এক্ষণে অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে কোন প্রাচীর বা প্রকোষ্ঠের অভগ্ন অংশ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাসাদের চারিদিকে প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের মধ্যে দেবজীর মন্দির। এই দেবজী ভোজ নামে একজন চৌহানবংশীয় রাজপুত যোদ্ধা ছিলেন। রাজপুতগণ ইহাকে অবতার বলিয়া মনে করেন। ইনি না কি রাণা সঙ্গকে একটি কবচ দিয়াছিলেন। ঐ কবচের প্রভাবে রাণা সঙ্গ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। একজন আধুনিক রাণা প্রাচীন প্রাসাদটি পুনঃ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংস্কার কার্য্য কিয়দ্দূর মাত্র করিয়াই উহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে এই প্রাসাদ হইতে গোমুখী গঙ্গা পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাড়ীর মেয়েরা সেই পথে স্নান করিতে যাইতেন। এই সুড়ঙ্গের মুখ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আলাউদ্দিন যখন চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, তখন পদ্মিনী এবং অন্য সকল রাজপুত রমণী এইখানে জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের পথ-প্রদর্শক আমাদিগকে বলিয়াছিল। কিন্তু Tod বলিয়াছেন যে, গোমুখী গঙ্গার নিকট সুড়ঙ্গের মধ্যে আল্লাউদ্দীনের সময় জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিল, আকবরের সময় যে জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা গোমুখী গঙ্গার নিকট অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিলাম, এখন সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাসাদের বাহিরে একটি ছাদযুক্ত বেদী আছে। এখানে না কি রাণাদের মেয়েদের বিবাহ হইত। ইহা পার হইয়া আমরা এক প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম নওলক্ষা ভাণ্ডার। নওলক্ষা ভাণ্ডারে রাজকোষ থাকিত এইরূপ অনুমান হয়। কেহ কেহ বলেন, বনবীর যখন চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন এখানে বাস করিতেন।

তাহার এক পার্শ্বে একটি গৃহে অনেক তোপ আছে। তাহার নাম তোপখানা। ইহার নিকটেই ভামশা মন্ত্রীর বাড়ী। রাণা প্রতাপসিংহ যখন নিরাশ হইয়া মেওয়ার পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন এই ভামশা তাঁহার পিতৃপুরুষ-সঞ্চিত বহু অর্থ প্রতাপের নিকট স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

নওলক্ষা ভাণ্ডারের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মন্দির আছে। তাহার নাম শিঙ্গারচৌরা। ইহা একটি জৈন মন্দির। ১৪৪৮ খৃঃ কুম্ভ রাণার কোষাধ্যক্ষের পুত্র ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বেলা অধিক হইয়াছিল। আমরা এখান হইতে গোমুখী গঙ্গার নিকট চলিলাম। সেখানে ঝর্ণার জলে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। আহার্য্যও প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা ভোজন সমাধা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।

আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন এই গোমুখী গঙ্গার ধারে জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে হইল, ইহা একটি পবিত্র তীর্থ। যে স্থানের সহিত কোন পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত আছে, যেখানে আসিলে মন পবিত্র হয়, তাহাই তীর্থ। আপনি একবার এখানে আসিয়া বসুন, সেই জহর-ব্রতের কথা স্মরণ করুন,—দেখুন, মন পবিত্র হয় কি না। একবার মানস-নেত্রে চাহিয়া দেখুন—ঐ সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী শ্রেণী বাঁধিয়া একটির পর একটি আসিতেছে, ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে একটির পর একটি প্রবেশ করিতেছে! কি সুন্দর সুললিত রূপ, মুখে কি পবিত্র ভাব। ঐ দেখুন, সুন্দর, কোমল দেহখানি ভস্মরাশিতে পরিণত হইল! একটি নয়, দশটি নয়, একশত নয়, সহস্রের পর সহস্র। ঐ মাটির যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই ভস্ম এখনও পাওয়া যাইত; মন্দিরের দেওয়ালে, দুর্গ-প্রাচীরের গাত্রে সেই ধূমকণা এখনও লগ্ন হইয়া আছে। একবার এখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করুন—সুখ বড়, না, ধর্ম্ম বড়? ভোগ বড়, না, ত্যাগ বড়? জীবন বড়, না, মৃত্যু বড়? জীবনের সুখভোগ সকলই ফুরাইয়া যাইবে, কিন্তু মহত্ত্বের কথা, ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গের কথা চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

আমরা এখানে বসিয়া সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার মধ্য দিয়া চিতোর হইতে উদয়পুরের রেলওয়ে লাইন প্রসারিত রহিয়াছে। ঐখানে আকবরের উর্দ্দু বা শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। গণ্ডোলি হইতে বুশি পর্য্যন্ত প্রায় দশ মাইল ইহা বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সৈন্যের বিরুদ্ধে কয়েক সহস্র মাত্র রাজপুত সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি মুখের কথা একবার মাত্র বলে—"আকবর, আমরা তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিতেছি" তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকে না, আকবর সৈন্য লইয়া দিল্লী ফিরিয়া যান, রাজপুতরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া জীবনের সকল সুখ ভোগ করিতে পারে। কিন্তু রাজপুতরা স্থির করিয়াছিল, কিছুতেই ঐ কয়টি কথা বলা হইবে না। জীবনের সকল সুখ চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়, তাও স্বীকার; প্রাণ যায়, তা'ও স্বীকার; প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্ত্রী ও কন্যারা স্তন্যপায়ী শিশু ক্রোড়ে করিয়া, আগুনে পুড়িয়া মরে, তা'ও স্বীকার। আকবর কিছুতেই ইহাদিগকে এই কয়টি কথা বলাইতে পারিলেন না। রাগ করিয়া তিনি ঘরবাড়ী মন্দির ভাঙ্গিয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। ইতিহাস লেখে, রাজপুতরা হারিয়া গেল; আকবর জিতিলেন। আমরা ত দেখি,—আকবর হারিলেন; রাজপুতরা জিতিল। আকবর চাহিয়াছিলেন, রাজপুতদিগকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করাইবেন। তিনি তাহা পারেন নাই। রাজপুতরা বলিয়াছিল, কিছুতেই আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিব না। একজন রাজপুতও বাঁচিয়া থাকিতে, মোগলকে চিতোরে ঢুকিতে দিব না; রাজপুতরা তাহাদের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিয়াছিল। তাহারা মরিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা ত প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, তাহারা চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। আকবরও ত এক দিন মরিয়াছিলেন।

তাই বলি, চিতোর হিন্দুর মহাতীর্থ। হিন্দু একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াও, অতীতের কথা স্মরণ কর। তাহার পর জিজ্ঞাসা কর, সংসারের সুখ-দুঃখকে তোমার ধর্ম্মের পথে, তোমার কর্ত্তব্যের পথে বাধা দিতে দিবে কি? তুমি দুর্ব্বল হইতে পার, তুমি দরিদ্র হইতে পার; কিন্তু তুমি যদি ধর্ম্মকে, কর্ত্তব্যকে সকলের উপর তুলিয়া ধর, তাহা হইলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পার।

চৈত্রের অপরাহ্ণের ঈষৎ তপ্ত বাতাস সম্মুখের আম্র-বৃক্ষের পত্র এবং পুষ্প কাঁপাইয়া, কুণ্ডের জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তুলিয়া অনবরত উদাস ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। মনের মধ্যে কেবল সেই গানের পদগুলি জাগিতেছিল—

দেখরে জগৎ মেলিয়ে নয়ন,
দেখরে চন্দ্রমা দেখরে গগন,
স্বর্গ হতে সবে দেখ দেবগণ,
জলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও দেখরে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে।

গোমুখ গঙ্গার পার্শ্বে একটি কক্ষে কয়েকটি মূর্ত্তি পূজিত হয়। দুইটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মধ্যে উপবিষ্ট ধ্যানী মূর্ত্তি। অপর একটি মূর্ত্তি একটি সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষের এক পার্শ্বে দেওয়ালের গায়ে একটি রমণী-মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিতে কেবল মুখ ও বক্ষ আছে। বাম হস্তে দর্পণ, দক্ষিণ হস্তের এক অঙ্গুলি ওষ্ঠের উপর, এক অঙ্গুলি চিবুকের উপর। সুগঠিত নাসা, আয়ত চক্ষু, চারু বঙ্কিম ওষ্ঠ। প্রসন্ন মুখশ্রী। গলায় হার, হাতে বালা, মাথায় মুকুট। মূর্ত্তিটি সুবৃহৎ—চিবুক হইতে কপাল পর্য্যন্ত এক হাতের চেয়ে বড়। মাথার মুকুট শুদ্ধ প্রায় দুই হাত। দর্পণের পশ্চাদ্ভাগের আকার মৃণালযুক্ত পদ্মের ন্যায়। ওষ্ঠের কিয়দংশ একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এজন্য মনে হইল মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইতে পারে। ইহা কি পদ্মিনীর মূর্ত্তি?

রৌদ্রের তেজ মৃদু হইলে আমরা জয়স্তম্ভ দেখিতে গেলাম। মালব ও গুজরের মিলিত সৈন্য পরাস্ত করিয়া রাণা কুম্ভ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণা কুম্ভ মালবরাজ মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু কোন রূপ নিষ্ক্রয়-মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, মামুদকে উপঢৌকন দিয়া কুম্ভ ছাড়িয়া দিলেন। জয়স্তম্ভটি একটী প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর নির্ম্মিত। ইহা ১২২ ফিট উচ্চ; অতএব মনুমেণ্ট বা তবের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু ইহার গঠন-নৈপুণ্য

অতি সুন্দর (৮)। ইহা চতুষ্কোণাকারে গঠিত এবং নয়টি তলাতে বিভক্ত। তলাগুলি বেশী উচ্চ নহে। স্তম্ভটিতে আরোহণ করিবার সময় ভিতরে কোথাও আলোক বা বাতাসের অভাব হয় না। বালক ও অনায়াসে ইহাতে আরোহণ করিতে পারে। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের অতিশয় মসৃণ প্রস্তরে স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি তলে চারি পার্শ্বে চারিটি বড় মূর্ত্তি এবং বহুসংখ্যক ছোট ছোট মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি অতিশয় সুগঠিত। এখানে একটি বিশেষত্ব দেখিলাম—প্রত্যেক মূর্ত্তির নীচে দেবনাগরী অক্ষরে মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া আছে (৯)। অধিকাংশ মূর্ত্তি দেবদেবীর,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি। বৈতালিক, সূত্রধার প্রভৃতির কয়েকটি মূর্ত্তিও দেখিলাম। সর্ব্বোচ্চ তলায় শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলীর ছবি এবং রাণাদের বংশাবলি লিখিত আছে। অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। Tod এখানে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

স্তম্ভটির উপরে উঠিলে চারিদিকের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখায়। এই জয়-স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করিতে না কি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এখান হইতে আসিয়া আমরা মীরা বাঈয়ের মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রাচীর-বেষ্টিত উচ্চ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির মধ্যে তিনটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি ও দুইটি পুরুষ-মূর্ত্তি। একটি বালিকা আমাদিগকে মন্দির দেখাইতেছিল। সে বলিল, বিগ্রহ তিনটি কৃষ্ণ, মীরা বাঈ এবং লক্ষ্মণের। ইহা যথার্থ বলিয়া বোধ হইল না। সে সময় পূজারী উপস্থিত ছিল না বলিয়া সঠিক জানা গেল না। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরটিও বেশ বড়। এই মন্দিরের পাশে আর একটি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। তাহা রাণা কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চিতোর হইতে তিন ক্রোশ দূরে নাগরী নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে উপাদান আনিয়া এই মন্দির দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মীরা বাঈয়ের ভক্তিপূর্ণ জীবন-কাহিনী এবং তাঁহার ভজন-সঙ্গীতের সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। মীরা বাঈ মাড়বার-রাজের কন্যা এবং রাণা কুম্ভের রাণী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া তিনি সকল সুখ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পদব্রজে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মীরা বাঈ মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বেদী হইতে নামিয়া মীরা বাঈকে আলিঙ্গন করেন। সেই ক্ষণেই মীরা বাঈয়ের প্রাণ বাহির হইয়া যায়, এইরূপ গল্প আছে। তাঁহার সঙ্গীত পুস্তকের নাম রাগগোবিন্দ। জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও তিনি একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এই মন্দির দুইটির নিকটে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ জলাধার (Reservoir) আছে। এগুলি ১২৫ ফিট দীর্ঘ, ৫০ ফিট প্রস্থ, ৫০ ফিট গভীর। কথিত আছে, রাণা কুম্ভের কন্যার বিবাহের সময় এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি ঘৃতে পূর্ণ করা হইয়াছিল, একটি তৈলে পূর্ণ করা হইয়াছিল। কুম্ভ রাণার কন্যা অসাধারণ রূপবতী ছিলেন; তিনি এজন্য "লাল মেওয়ারী" ("Ruby of Mewar"—Tod) নামে পরিচিত ছিলেন। জৈসলমীরের ভট্টি-বংশীয় রাজা জেঠের সহিত ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু জেঠ চিতোরের নিকট আসিয়া, দুইবার অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়া, ইঁহাকে বিবাহ না করিয়া, অপর একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। তখন রাণা কুম্ভ গগরাঁয়ের খিচিবংশীয় বিখ্যাত রাজপুত্র অচলদাসের সহিত খুব ধুমধাম করিয়া ইঁহার বিবাহ দেন।

ইহা ব্যতীত চিতোরে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং আরও অনেক মন্দির আছে। অপরাহ্ণে আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এই প্রান্তরে কতবার যুদ্ধ হইয়াছে, কত সহস্র রাজপুত প্রাণ দিয়াছে, রাজপুত রমণীর বক্ষের রক্তে এখানকার মৃত্তিকা সিক্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই

(৮) Tod বলিয়াছেন, The only thing in India to compare with this is the Kutab Minar at Delhi; but though much higher it is of a very inferior character.

(৯) Vincent Smith তাঁহার History of Fine arts in India and Ceylon গ্রন্থে ইহাকে বলিয়াছেন an illustrated dictionary of Hindu mythology.

Tod বলিয়াছেন, It is one mass of sculpture; of which a better idea cannot be conveyed than in the remark of those who dwell about it that it contains every object known to their mythology.

সহস্র সহস্র বীরপুরুষ এবং বীররমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক বারের বীরত্বের কীর্ত্তি যেন পূর্ব্ববারের বীরত্বকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কথাটি যদিও একটু অদ্ভুত শোনায় তথাপি প্রকৃতপক্ষে যে কয়বার চিতোর শত্রু কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, সেই কয়বারের কাহিনীই চিতোরের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কাহিনী।

চারণ কবিরা বলেন, সাড়ে তিনবার চিতোর ধ্বংস হইয়াছিল। একবার আলাউদ্দিন ধ্বংস করেন, দ্বিতীয়বার গুর্জ্জরের সুলতান বাহাদুর, তৃতীয়বার আকবর। আলাউদ্দিন যেবার ভীমসিংহকে বন্দী করেন এবং ৩,৫০০ শ্রেষ্ঠ রাজপুত ভীমসিংহকে রক্ষা করিতে প্রাণ দেয়, তাহাকে অর্দ্ধেক চিতোর-ধ্বংস বলা হয়; কারণ সেবার শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরগণ মারা যায়। আলাউদ্দিন এবং আকবরের আক্রমণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাহাদুর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন রাণা ছিলেন বিক্রমজিৎ। তিনি তখন চিতোরে ছিলেন না। রাঠোরবংশীয় রাণী জওআহির বাই স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করেন এবং বর্ম্ম পরিয়া একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজ-বলি না হইলে চিতোর রক্ষা হইবে না—চিতোরে এইরূপ একটি ধারণা ছিল। দেওলার রাজা বাগ্‌জি বলিলেন—রাণাবংশের রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত,—তাঁহাকে বলি দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাকে সিংহাসনে বসান হইল, মাথার উপর রাজছত্র ধরা হইল। আবার জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছিল, চিতা রচনা করিবারও সময় ছিল না, জলাধার এবং বারুদখানার মধ্যে বারুদের স্তূপ করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। রাণী কর্ণবতী সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। ১৩০০ রাজপুত রমণী স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিল। তাহার পর দুর্গদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট রাজপুত সৈন্য লইয়া বাগ্‌জি শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। এইবার ৩২০০০ রাজপুত চিতোরের জন্য প্রাণ দিয়াছিল।

যে সমতল ভূমির উপর চিতোর পাহাড় অবস্থিত, তাহার উচ্চতা ১৩০০ ফিট। ইহার উপর পাহাড়ের উচ্চতা আরও ৪০০।৫০০ ফিট। চিতোরের প্রাচীন নাম চিত্রকূট। 'খুমান রাসা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এখানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্র বাস করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। এলাহাবাদ হইতে ঝাঁসি যাইবার পথে চিত্রকূট নামে একটী ষ্টেশন আছে,—ইহাই প্রাচীন চিত্রকূট বলিয়া পরিচিত। গিলোটবংশের পূর্ব্বে চিতোরে প্রমারবংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। বাপ্পা প্রামারদের নিকট হইতে চিতোর কাড়িয়া লইয়া এখানে গিলোটবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রামার-রাজ বাপ্পাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে চিতোর কাড়িয়া লওয়া বাপ্পার অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছিল। সেই পাপে কি তাঁহার বংশধরগণকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল?

অপরাহ্ণে রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার চিতোরের পাহাড় এবং চারিদিকের বিশাল প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। একটা সুগভীর বিষাদের ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। এত সহস্র সহস্র রাজপুত বীর এবং রাজপুত রমণী দেশের জন্য প্রাণ দিল, কিন্তু তথাপি দেশ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন মনে হইল, তাহারা দেশ রক্ষা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু দেশের চেয়েও বড় ধর্ম—রক্ষা করিয়াছিল, আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, জগতে তাহার তুলনা নাই। তাহারা আমাদের জন্য হিন্দুরাজ্য রাখিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু যাহা রাখিয়া গিয়াছে তাহা চিরস্থায়ী।

বিভ্রাট

শ্রীসত্যভূষণ সেন

১

এক একটি লোক থাকে, যাহারা যেখানেই যায়, সেখানেই সকলের ভালবাসার পাত্র হইয়া ওঠে। দীনেশ ছেলেবেলা হইতেই পিসিমার বাড়ীর সংস্রবে থাকার দরুণ, সে-বাড়ীর সকলের সহিতই তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল। পিসিমার শ্বাশুড়ী ছিলেন তাহার দিদিমা। পিসিমার ছেলেরা সম্পর্কে তাহার ভাই হইলেও নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সহিত বন্ধুর মত ব্যবহারই চলিত। পিসিমা দীনেশকে শুধু ভালই বাসিতেন না—তাঁহার চরিত্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল যথেষ্ট। ছেলেবেলায়ও দীনেশের কোন অপরাধ পিসিমার চোখে পড়িত না। পড়াশুনার কথা উঠিলে পিসিমা দীনেশকে দেখাইয়া বাড়ীর সব ছেলেকে জব্দ করিয়া রাখিতেন। এক দিন বাড়ীর ছেলেরা বলিয়া বসিল, কালকে ছুটির দিনে আমরা পড়ব না। পিসিমা বলিলেন, কেন রে, ছুটীর দিন পড়া বন্ধ করতে হবে কে বলেছে? ছেলেরা বলিল, দীনেশও ত বলেছে কাল পড়বে না। পিসিমা অমনই বলিয়া বসিলেন, দীনেশের সঙ্গে তোদের তুলনা কিসে—দীনেশের মত ছেলে এক দিন না পড়লে কিছু এসে যায় না। তাই বলে' কি সবারই ঐ কথা বলা সাজে।

সে অনেক দিনের কথা। পড়াশুনার কাল চলিয়া গিয়াছে। এখন পিসিমার ছেলেরা সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত,—কেহ উকীল, কেহ ডাক্তার, কেহ কেরাণী। আর একজন দারোগা—তাহার নাম ধনেশ। ইহারা সংসারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই যে ইহার মধ্যে অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল চলিয়া গিয়াছে এমন নয়। বিলাতে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে সকলেই সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার অবকাশ উপভোগ করিবার অবসর পায়। ডাক্তার ডাক্তারী করিবার পূর্ব্বে, উকীল কোর্টে যাইবার আগে, কেরাণী কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইবার অবকাশে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া একবার দুনিয়াটা দেখিয়া আসে। আমাদের দেশটা বিলাত হইতে এখনও অনেক বাকী; কাজেই ও রকম সখের প্রোগ্রাম এখানে চলে না। এখানে পড়া শুনা শেষ করিয়া অবকাশ উপভোগ করা দূরে থাক্, লেখা পড়া শেষ করাই অনেকের অদৃষ্টে ঘটিয়া ওঠে না। যে কয়জন সৌভাগ্যবান লেখা পড়া শেষ করিতে পায়, তাহাদের মধ্যেও এরূপ অতি-সৌভাগ্যবান খুব কমই থাকে, যাহার উপার্জ্জনের প্রতীক্ষায় দুই চার দশ জন বসিয়া নাই।

দীনেশ ছিল এইরূপ একজন অতি-সৌভাগ্যবান। পিসিমার ছেলেরা যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, দীনেশ ছিল সেইরূপ কৃতবিদ্য। কলেজের পড়া শেষ করিয়া তাহাকে ঘরে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সে হুজুগে মাতিয়াছে এবং দামোদরের বন্যায় লোকের সেবায় দেশের কাজ করিয়াছে।

২

দীনেশ অবসর খুঁজিয়া অনেক দিন পরে পিসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। অনেক দিন পরে দীনেশ আসাতে পিসিমার বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। পিসিমা এতদিন পরে দীনেশকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন। দুই মাস পূর্ব্বে ধনেশের বিবাহের সময় দীনেশ না আসিতে পারায় পিসিমা যে কতটা নিরাশ হইয়াছিলেন, এখন বর্ত্তমানের আনন্দে তাহাও ভুলিয়া গেলেন। ছেলেরা আসিয়া সব আড্ডা জমাইয়া বসিল। দিদিমা আসিয়া বলিলেন—

ওরে দীনু, ধনেশের বউ দেখেছিস্?

দীনেশ। কি করে দেখব, দিদিমা, আমি যে সম্পর্কে ভাসুর।

দিদি-মা। তা আছিস ভাসুর, ভাসুরের মতই দেখ্‌বি—আমি এনে দেখাচ্ছি।

দীনেশ। কি করে দেখাবেন—বউ এসে দাঁড়াবে,

আপনি ঘোমটা তুলে ধরবেন, আর সে বেচারী চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকবে, এই ত?

দিদিমা। তা নয় ত কি তোর সাম্‌নে বউ এসে নাচ্‌তে থাকবে?

উকীল-ভায়া। দিদিমার ত বড় একরোখা কথা দেখ্‌ছি। একজন লোক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকবে না বলেই একেবারে নাচ্‌তে থাক্‌বে এমন কি কথা।

দিদি-মা। আচ্ছা বেশ, তোরা এখন বড় হয়েছিস্, যা খুসী তাই কর। আমি বাপু ওসব খৃষ্টানীপনা করতে পারব না।

দিদিমা চলিয়া গেলেন।

ধনেশ। দিদিমা খুব চটে গেছেন।

ডাক্তার-ভায়া। তুমিও তো কম একরোখা নও হে দীনু! না হয় তুমিই দিদিমার কথায় সায় দিয়ে যেতে।

দীনেশ। সায় দিয়ে যাওয়া যেত অবশ্যই। কিন্তু প্রতিপদে সমাজকে এরূপ সায় দিতে দিতেই এখন এমনই দশা হয়েছে যে সমাজ এখন বৃথা আচার-নিয়মের বন্ধনে জর্জ্জরিত। প্রথম প্রথম এ-সব দেখে হাসি পেত, এখন কান্না পায়।

ডাক্তার ভায়া। এর মধ্যে এমন জর্জ্জরিতের কথা কি এল। আচার-নিয়ম সব সমাজেই আছে।

দীনেশ। তা থাক্। কিন্তু ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ দেখি। ভাসুর এবং ভাদ্রবউদের মধ্যে এতটা অনাবশ্যক ব্যবধান থাকাতে গৃহকর্ম্মের যে কত প্রকার অসুবিধা হয়, তা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু একজন লোক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, আর একজন এসে তার ঘোমটা তুলে ধরলে তবে আমি তাকে দেখ্‌ব—এটা একজন মানুষের স্বাধীন সত্তার প্রতি কত বড় একটা আঘাত—একবার ভেবে দেখেছ কি?

ধনেশ। যেন লাট-সাহেবের Statue unveil করা!

দীনেশ। Statue ত একবার unveil করলে সবাই দেখ্‌তে পায়। একটি বউ দেখাতে হলে তাকে প্রতি বার unveil করে আবার তাকে ঘোমটা পরিয়ে রাখ্‌তে হয়। যেন সোনা-রূপার বাসনপত্র—পাড়া-পড়সীরা যতবার দেখতে চাইবেন, তত বারই সিন্দুক খুলে দেখাতে হবে, আবার সিন্দুক বন্ধ করতে হবে।

ধনেশ। আমার পকেট-ঘড়িটার মত—যতবার সময় দেখা দরকার, ততবারই ডালা খুলতে হবে।

উকীল-ভায়া। বাস্তবিক এ-সব ভেবে দেখলে হাসিই পায়।

দীনেশ। আমারও প্রথম প্রথম হাসি পেত,—এখন কান্না পায়।

ইহার পরে আর কথা চলে না।

৩

বিকাল বেলা বাড়ীতেই চায়ের আড্ডায় বসিয়া গল্প হইতেছিল। দিদিমা বসিয়া সকলকে খাওয়াইতেছিলেন—পিসিমা খাবার আনিয়া দিতেছেন।

দিদিমা বলিলেন—কিরে দীনু, তুই না কি এই শনিবারেই চলে যাবি?

দীনেশ। হ্যাঁ, দিদিমা, স্নান উপলক্ষে গঙ্গাসাগর মেলাতে যেতে হবে—সেখানে কাজ আছে।

দিদিমা। মেলাতে আবার তোর কি চাক্‌রী জুট্‌ল?

চাক্‌রীর কথা শুনিয়া ভায়ারা সকলে হাসিয়া উঠিল।

দীনেশ। না, দিদিমা, চাক্‌রী নয়—

দিদিমা। তা বেশ ত, না হয় স্নান করতেই যাবি। আর আমরাও সব যাচ্ছি যখন—সবাই এক-সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আমাদেরও ত তুই-ই নিয়ে যেতে পারিস!

উকীল। না দিদিমা, তোমাদের এত সব লটবহর নিয়ে যাওয়া ওর মত সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নয়।

কেরাণী। না—না, ও-সব কিছু নয়; তোমাদের ধনেশের সঙ্গে যাওয়াই ঠিক।

ধনেশ। তা ঠিকই আছে। আমার বজরা ত রয়েছেই। কনেষ্টবলদের জন্য একটা বড় নৌকাও যাচ্ছে। তাতে আমাদের মালপত্র অনেক দেওয়া যাবে। কনেষ্টবলও যাচ্ছে সঙ্গে দশজন।

কেরাণী। দশজন! বা, তবে ত গ্র্যাণ্ড। এবার আর কিছু ভারতেই হবে না। দশজন কনেষ্টবল সহায় থাকলে ত যা খুসী তাই করা যায়। আর যাই বল—পুলিশ ফোর্সের কাছে কেউ নয়—ওসব ভলান্টিয়ার-ফলান্টিয়ারের কর্ম্ম নয়।

উকীল। না হে, ভলান্টিয়াররা এবার দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা আর তুচ্ছ নয়—ওরা বেশ কাজ করে।

কেরাণী। তা করুক, কিন্তু—আমারও তাই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আমি এক-দিন আমাদের বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে ওসব কিছু নয়। সাহেব যখন বলেছেন, তখন তার উপরে ত আর কথা নাই—ওদের চেয়ে ত আর আমরা কিছু বেশী বুঝতে পারি না।

এমন সময় অদূরে সাহেবের বেয়ারাকে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, কেরাণীবাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। বেয়ারা নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে খবর কি?

বেয়ারা। খবর আর বেশী কুছু নেই আছে বাবুজি।

কেরাণী। সাহেব চা-টা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন টেনিস্ খেল্‌তে?

বেয়ারা। হাঁ বাবু, গেয়েছেন। যাবার সময় হামাকে বলে গেল বেবীর জন্মদিনের কোথা। এহি সোমবারে হোবে কি দোস্‌রা সোমবারে—হামি ঠিক বুঝতে পারল না।

কেরাণী। তা এ-সব তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর না কেন—আমি তোমাকে বলে দেব। আমার ডায়েরীতে সব লেখা আছে।

বেয়ারা। লিখা আছে বাবুজী?

কেরাণী। হাঁ সব আছে। বেবীর কবে জন্ম হল, কোন্ তারিখে সাহেবের বিয়ে হল, বিয়ের পরে মেমসাহেব কবে এসে এ বাড়ীতে উঠলেন—সব লেখা আছে।

৪

দীনেশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইয়া সাগরসঙ্গমের মেলাতে আসিয়া ভলান্টিয়ারের দলে যোগ দিল। এদিকে ভায়ারা কেহই ছুটী পাইল না,—কাজেই ধনেশকে একাই পরিবারের সমস্ত বাহিনী লইয়া বাহির হইতে হইল। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের বজরা ছাড়িল—সঙ্গে এক-নৌকা কনেষ্টবল। দুই নৌকাতেই সরকারের নিশান সগর্ব্বে উড়িতেছিল। তীর হইতে যাহারা দেখিল, তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এ নিশ্চয়ই কোন দারোগার নৌকা। অন্যান্য নৌকার যাত্রীরা একবার বলিয়া লইল যে, ইহারা কেমন নিরাপদে নির্ভাবনায় চলিয়াছে—যদিও এ-পথে কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। সরকারী নিশানের উপরে যখন ভলান্টিয়ারদের দৃষ্টি পড়িল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, সরকারের মান-মর্য্যাদার ত আর সে দিন নাই; এখন এ-সব বাহ্যাড়ম্বর কি সরকারের পক্ষ হইতে আশ্রিত-বাৎসল্যের পরিচয়, অথবা আশ্রিতদের পক্ষ হইতে সরকারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন? জেলে-নৌকারা একবার সরকারী নিশান দেখিয়া আর ভরসা করিয়া সেদিকে ফিরিয়া চায় না। ইহাদের মধ্যে সত্যসত্যই যাহাদের ডাক পড়ে, তাহারা মাছ লইয়া যায় সশঙ্কচিত্তে, এবং ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে মনে করে, মাছের দাম লইয়া ফিরিয়া আসিলে পর।

এইরূপে তাঁহারা বেশ একটু সম্ভ্রম এবং অনেকটা সমালোচনার প্রসঙ্গ হইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে চলিয়াছেন। হঠাৎ একটা জাহাজের বাঁশীর শব্দে সমস্ত নিশ্চিন্ততার তাল কাটিয়া গেল।

জেলার পুলিশ সাহেব তাঁহার নিজের জাহাজে সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছিলেন। তিনি ধনেশের অনুচরদের মধ্য হইতে পাঁচজন কনেষ্টবল লইয়া চলিয়া গেলেন। ধনেশের সঙ্গে রহিল বাকী পাঁচজন। যথাসময়ে সকলে আসিয়া সাগর-সঙ্গমে পৌঁছিল। ধনেশ যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের সহিত থাকিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার অনুচরের সংখ্যা অর্দ্ধ পথে দ্বিখণ্ডিত হওয়াতে, সে অপেক্ষাকৃত অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে পাঁচজন মাত্র কনেষ্টবল; তাহাদের নির্দ্ধারিত কাজ ভাগ করিয়া দিলে দেখা গেল যে, ধনেশের পরিবারের জন্য কাজ করিবার অবসর তাহাদের অতি সামান্যই থাকে। তবু ইহারই মধ্যে তাহারা যথাসাধ্য ধনেশের সাহায্য করিতে লাগিল।

কিন্তু দীনেশের আর এ পর্য্যন্ত দেখা পাওয়া যায় নাই। পাইবার কথাও না, কারণ দীনেশের কার্য্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল একটু দূরে। সমস্ত ভলান্টিয়ার-সঙ্ঘ দলে দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের কাজ ছিল স্নানের ঘাটে তদারক করা। তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেওয়া, অথবা আত্মীয়-স্বজনদের অভিভাবকত্বে থাকিলে তাহাদের সুবিধা সৌকর্য্যের জন্য সাহায্য করা; নির্দ্দিষ্ট সময়মত মূল হাসপাতালে গিয়া সেবা শুশ্রূষার কার্য্যে যোগদান করা এবং অবসরমত মাঝে মাঝে তদন্ত অফিসে গিয়া খোঁজখবর

লওয়া। এই তদন্ত অফিসও ইহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। তদন্ত অফিস সমস্ত দিন এবং রাত্রিরও অনেকটা সময় পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। কয়েকজন ভলান্টিয়ার নিরবচ্ছিন্নভাবে এখানকার কাজের জন্যই নিযুক্ত ছিল। তাহারা সকল প্রকার খবরাখবরের আদান-প্রদানে যাত্রীদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছিল। অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া অভিভাবকদের সঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া পড়িত। তখন ভলান্টিয়ারদের কাজ ইহাদের কুড়াইয়া আনিয়া তদন্ত অফিসের জিম্মা করিয়া দেওয়া। তদন্ত অফিসে ইহাদিগকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রদানেরও বন্দোবস্ত ছিল।

দীনেশ ৩নং কেন্দ্রে কাজ করিতেছিল। পিসিমাদের নিয়া ধনেশের যে স্থানে আসিয়া থাকিবার কথা, সেটা ছিল ২নং কেন্দ্রের অন্তর্গত। দীনেশ উহাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভের একমাত্র উপায়ের নির্দ্দেশ পাইয়া দলপতির নিকট আসিয়া হাজির হইল। দলপতির নিকট নিবেদন করিল, আমাকে ২নং কেন্দ্রে বদলী করিতে আজ্ঞা হয়, সেখানে একজন পুলিশের দারোগা বিপন্ন। তাহাদের একজন সহযোগী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দীনেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দলপতি দীনেশের দিকে চাহিয়া স্বজাতিসুলভ সহানুভূতিতে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা রহস্য আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—দারোগাটি কে?

দীনেশ। আমার পিসতুতো ভাই, নাম ধনেশ।

দলপতি। তাঁর বিপন্ন অবস্থাটা কি রকম?

দীনেশ। অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁর সঙ্গী, অভিভাবক তিনি একা।

দলপতি। তাঁর অভিভাবক সমস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি,—তার জন্য ভাবনা কি!

দীনেশ। ভাবনা নাই?

দলপতি। ভাবনা আছে বই কি। এসব ক্ষেত্রে রাজশক্তির কর্ম্ম নয়। আচ্ছা তা' হলে তুমি ২নং কেন্দ্রে যাও। সেখানকার দলপতিকে আমার নাম করে ব'লো—তিনি যেন তাঁর একজন লোককে এখানে বদলী করে দেন।

এইরূপে অনুমতি পাইয়া দীনেশ অবিলম্বে ২নং কেন্দ্রের জন্য রওনা হইল। ২নং কেন্দ্রের সীমার মধ্যে আসিয়া দেখিল, এক স্থানে প্রকাণ্ড একটি ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ভিড়ের ভিতরে দেখিল—একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক—তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই ভিড় জমিয়াছে! খবর লইয়া জানিল যে, যুবতীটি ভদ্র ঘরের স্ত্রী, পথ চলিতে চলিতে ভিড়ের মধ্যে সঙ্গীহারা হইয়া পড়িয়াছে। দীনেশ পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া খবর পাইল যে, স্ত্রীলোকটি এখানকার ভলান্টিয়ারদের হাতে পড়িয়াছে—তাহারা উহাকে তদন্ত আফিসে লইয়া যাইবে।

দীনেশ ভলান্টিয়ারের দলে থাকিয়া কার্য্যতৎপরতা শিক্ষা পাইয়াছিল। যখন দেখিল যে স্ত্রীলোকটি ভলান্টিয়ারদের হাতে পড়িয়াছে, তখন সে বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান ছাড়িয়া নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যাইতে পারিল। যাইবার সময় স্ত্রীলোকটির চেহারার একটা মোটামুটি বিবরণ মনে মনে টুকিয়া লইল—বয়স বিশ বৎসরের নীচে, রং ফরসা, চেহারা লম্বা, শরীরে কৃশাঙ্গী। নাক চোখা, চোখের গড়ন সাধারণ, চোখের প্রায় এক ইঞ্চি নীচে একটা আঁচিল, মুখের ছাঁদ লম্বা। এসবও দীনেশের ভলান্টিয়ারের দলে শিক্ষার ফল।

দীনেশ ২নং কেন্দ্রের দলপতির নিকট হাজিরা দিয়া যথাসময়ে পিসিমার পর্দাবাসে আসিয়া পৌঁছিল। আসিয়াই দেখে এক বিভ্রাট। স্নান হইতে আসিবার পথে ধনেশের বউ যূথভ্রষ্ট হইয়া কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। কথাটা শুনিয়াই দীনেশের মনে পড়িল—পথে-দেখা সেই সঙ্গীহারা যুবতীর কথা। সেই যুবতীর চেহারার যে বিবরণ দীনেশ দাখিল করিল, বাম চক্ষুর নীচে আঁচিলটি পর্য্যন্ত—তাহাতে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইল যে, এই যুবতীটিই ধনেশের বউ। দিদিমা বলিলেন—তুই যখন দেখলি, তখন বউকে নিয়ে এলি না কেন একেবারে?

দীনেশ। আমি কি করে জান্‌ব যে আপনারা এত লোক থাক্‌তে—আর সঙ্গে পুলিশ দারোগার প্রহরা—তার মাঝখান থেকে বউ হারিয়ে যাবে। আর জান্‌লেই বা কি হত, আমি কি ওকে কোন দিন দেখেছি যে পথে দেখা হলেই চিন্‌তে পারব?

দিদিমা। তুই না হয় চিন্‌তে নাই পেরেছিস,—বউও কি তোকে দেখ্‌তে পেলে না?

দীনেশ। কি করে দেখ্‌বে এত লোকের মধ্যে।

দিদিমা। বাঃ, তুই কি করে দেখ্‌লি এত লোকের মধ্যে?

দীনেশ। আমি দেখ্‌ব না?—তখন সমস্ত লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ওর উপরে। আর আমি ছিলাম হাজার লোকের মধ্যে একজন—আমাকে বউ কি করে দেখবে। আর আমাকে দেখ্‌লেই বা কি হত—বউ কি আমাকে বলতে পারত যে আমি ধনেশের বউ—আপনি আমার ভাসুর—আমাকে নিয়ে যান।

দিদিমা। তোরা কি দাঁড়িয়ে তর্কই করবি শুধু—বউকে আনতে যাবি না।

দিদিমার নিকট অগত্যা পরাজিত হইয়া দীনেশ ও ধনেশ তদন্ত অফিসের দিকে রওনা হইল।

শোক-সংবাদ

৺কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

বাঙ্গালার একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অক্লান্তকর্ম্মী, স্বদেশবৎসল, দানবীর কবিরাজ

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

যামিনীভূষণ রায় আর ইহজগতে নাই। গত ২৬শে শ্রাবণ তিনি কর্ম্মময় জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে না করিতেই সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে যামিনীভূষণকে চিনিতেন না, এমন লোক বিরল। তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা একদিনও আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার পক্ষপাতি হইয়াছেন। যামিনীভূষণ সংস্কৃতে এম-এ ছিলেন, ডাক্তারীতে এম-বি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়' 'কুমারতন্ত্র' 'প্রসূতিতন্ত্র' 'শালক্যতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কলেজের জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার জন্য যামিনীভূষণ একাকী সত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি যে সকল সম্পত্তি এই কলেজের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাহারও মূল্য হইবে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। কবিরাজ যামিনীভূষণের অকাল মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার সহজে পূরণ হইবে না। আমরা প্রস্তাব করি, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ একত্র মিলিত করিয়া কবিরাজ শ্যামাদাস ও কবিরাজ গণনাথ যদি এই সম্মিলিত কলেজের পরিচালন ভার গ্রহন করেন, তাহা হইলেই 'পরলোকগত' যামিনীভূষণের প্রকৃত স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হইবে, তাঁহার নাম বাঙ্গালা দেশে স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

পুস্তক-পরিচয়

দাদার কথা।—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। 'দাদার কথা' পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের জীবন-কথা; লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সার রাসবিহারীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পুস্তকখানির নামকরণ অতি সুন্দর হইয়াছে, কারণ সুরেশবাবু এই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া নিজে, বলিতে গেলে, কোন কথাই বলেন নাই; পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তাঁহার এই প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যখন যে কথা বলিয়াছিলেন, সুরেশবাবু তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কথাগুলি একত্র সংঘবদ্ধ করিয়া এই 'দাদার কথা' লিখিয়াছেন; সুতরাং এই বইখানি আদ্যোপান্ত দাদারই মুখের কথা। অথচ, এই 'দাদার কথা'তে সার রাসবিহারীর জীবন-কথা যেমন সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, অন্য কোনভাবে লিখিলে তাহা কিছুতেই হইত না। বইখানি এমনই সুন্দর যে পড়িতে বসিলে ক্রমেই আরও জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে। সার রাসবিহারী ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সুরেশবাবু বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ জীবন-চরিত-লেখকের জন্য অনেক অমূল্য উপকরণ একত্র রাখিয়াছেন। আমরা শতমুখে এই বইখানির প্রশংসা করিতেছি। ইহা যে বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই মনোরঞ্জন করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

দম্পতি।—ডাক্তার শ্রীশশিকুমার সেন বি, এ এল্ এম্ এস্, প্রণীত। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা বলিয়াছেন "সংক্ষেপ তো ক্রিয়া যোগো নিদান পরিবর্জ্জনং।" রোগ-কারণ দূর করাই সংক্ষেপ চিকিৎসা।" যে রোগের বিষে বাঙ্গালার অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত, বাঙ্গালী ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার কারণ দূর করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। যুবকগণ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, যুবতীগণ স্ত্রীরোগে আক্রান্ত, বাঙ্গালার শিশু সন্তানগণের অকালমৃত্যু,—এই সকলের কারণ ও প্রতীকার সম্বন্ধে, গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া দাম্পত্য জীবনের পক্ষে গ্রন্থখানি অতি উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য গ্রন্থের নাম-নির্দ্দেশও সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি, বিবাহিত জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় পাঠ্য, বিশেষতঃ নববিবাহিত যুবক-যুবতীগণের পক্ষে। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন মানুষের স্বভাবজাত সংস্কারের বিষয় উপদেশের প্রয়োজন কি? তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিলেই ইহার সমাধান হইবে। গ্রন্থকার তাঁহার উপক্রমণিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন,.....শিক্ষা না পাইলেই (সুশিক্ষাই হউক কুশিক্ষাই হউক) যৌনতত্ত্ব তাহার নিকট প্রায় সমস্তই অপরিজ্ঞাত থাকে। আবার এমন চিকিৎসকও আছেন যাঁহারা দাম্পত্য ব্যবহার সম্বন্ধে আংশিক অনভিজ্ঞ। "শেষ জীবনে যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহা যদি দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে লাভ হইত, তবে অত্যন্ত সুখের ও মঙ্গলের হইত, এইরূপ খেদও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।" আমাদের মনে হয় এইরূপ খেদ কেহ কেহ কেন অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। বিবাহিত জীবনকে সংযমের মধ্যে নেওয়া, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনকে শৃঙ্খলিত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া যুবক যুবতীগণ সেইরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দাম্পত্য জীবন মঙ্গলময় শান্তিময় সুখময় হইয়া উঠিবে।

দেশবন্ধু স্মৃতি।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত; মূল্য তিন টাকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পবিত্র জীবন-কথা যিনি যেমন করিয়াই লিখুন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই আদরে বরণ করিয়া লইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যিনি এই স্মৃতির লেখক তিনি দেশবন্ধুর শেষ জীবনে অথবা রাজনৈতিক জীবনে ছায়ার ন্যায় সহচর ছিলেন, ভক্তের ন্যায় অনুগত ছিলেন; সুতরাং হেমেন্দ্র বাবু যে এই জীবন-স্মৃতি লিখিবার সর্ব্বতো ভাবে উপযুক্ত, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লেখকের চিত্তরঞ্জনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকট হইয়াছে এবং ইহারই জন্য এই জীবন-স্মৃতি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে; এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী মাত্রেরই ভাল লাগিবে।

যুগমানব।—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল্; মূল্য তিন টাকা। এখানি ডায়েরী বা রোজনামচা। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রবাবু যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর এই ডায়েরি; বন্ধুর পরলোকের পর তিনি ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু, এ কথায় নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না; তাই এই 'পরিচয়ে' পুস্তকখানি তাঁহার 'প্রণীত' কি 'সম্পাদিত' তাহা বলিলাম না। কথা এই, বীরেন্দ্রবাবু নিজেই গ্রন্থকর্ত্তা হউন, বা তাঁহার পরলোকগত বন্ধুই প্রণেতা হউন, এই ডায়েরিতে পড়িবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে। অবশ্য, ডায়েরির মন্তব্যের আগাগোড়া সামঞ্জস্য নাই, থাকিবার কথাও নহে; লেখকের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, যে পুস্তক বা যে লেখকের সম্বন্ধে তাৎকালিক যে মনোভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই অকপটে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সেগুলি বিচারসহ কি না, সমীচীন কি না, তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজনই তখন অনুভূত হয় নাই। আমরাও সেই জন্য লেখকের কোন মন্তব্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। তবে, এইমাত্র বলিতে পারি, এই ডায়েরীখানি পাঠ করিলে অনেকেরই চিন্তার খোরাক জুটিবে। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

আলো।—রায়-সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত; মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব সরল ও সহজ ভাষায়

ছাত্রগণের নিকট বিবৃত করিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার 'বৈজ্ঞানিকী' 'প্রাকৃতিকী' 'গ্রহনক্ষত্র' 'বিজ্ঞানের গল্প' 'পোকামাকড়' 'গাছপালা' 'পাখী' 'শব্দ' প্রভৃতি পুস্তক শিক্ষার্থীমহলে যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে; বর্ত্তমান পুস্তকখানিও তেমনই সমাদরে গৃহীত হইবে। আলো সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এমন সুন্দর পুস্তক পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না; বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিতই হয় নাই। রায় মহাশয় ছেলেদের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন; কিন্তু আমরা, বুড়োরাও এই পুস্তকখানি পড়িয়া লাভবান হইলাম। এই সকল পুস্তকের দিকে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি কতদিনে আকৃষ্ট হইবে?

জহান্-আরা।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য বার আনা। জহান্-আরা সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় কন্যা; জগৎ-বিখ্যাত তাজমহল যাঁহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিয়াছে, সেই মুমতাজ-মহল জহান্-আরার জননী! এই মহীয়সী, গরিয়সী মহিলার জীবন-কাহিনী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয় ঢালিয়া দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি ঐতিহাসিক; তিনি নির্ম্মমভাবে সত্য বাছিয়া লইয়া এই জীবন-চরিত্র লিপিবদ্ধ করিরাছেন সত্য; কিন্তু সেই নির্ম্মম সত্যকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। ভাষার ঝঙ্কারে, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অনেক নাটক নভেল অপেক্ষাও সুপাঠ্য হইয়াছে, অথচ তাঁহার হৃদয়াবেগ কখন কঠোর সত্য হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ইহাই গ্রন্থকারের প্রতিভার পরিচয়, ইহাই তাঁহার পুস্তকখানিকে এমন সুষমামণ্ডিত করিয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীবিজয়-মঙ্গল।—শ্রীবরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যার বি-এল্ সঙ্কলিত, মূল্য ১৷৷৵০। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একাধিক জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক ভক্ত শিষ্য এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তবুও আমরা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল পরম আগ্রহে, পরম ভক্তিভরে পাঠ করিয়াছি এবং পরম শান্তি পাইয়াছি। এখানি ঠিক জীবন-চরিত নহে; গোস্বামী মহাশয় যখন যে সকল অমূল্য কথা বলিয়াছেন, যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং ইহা জীবন-কথা অপেক্ষাও উপাদেয় হইয়াছে; কারণ ইহাই ত তাঁহার প্রকৃত জীবন-কথা। তাঁহার ভক্ত শিষ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তত্ত্ব-পিপাসু ভক্তমাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থের আদর হইবে।

মানব-গীতা।—কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ বিরচিত; মূল্য ১।০ আনা। এখানি পারমার্থিক কাব্য। 'নিবেদনে' সুলেখক, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই এই 'মানব গীতা'র পরিচয় পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "আর্থিক তত্ত্বের আলোচনায় পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে লোকের ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে। সংসারে অর্থ ও পরমার্থ উভয়েরই প্রয়োজন আছে, ইহা বুঝাইবায় জন্যই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।" কবিভূষণ মহাশয়ের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই; তিনি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বিশেষ প্রণিধান-পূর্ব্বকই দ্বাদশ অধ্যায়ে এই গীতা সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এই মানব-গীতা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বিবি বউ।—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত; মূল্য সাতসিকা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও গল্প-লেখক। এই 'বিব বউ' তাঁহার কয়েকটী ছোট গল্পের সংগ্রহ। ইহাতে বিবি বউ, কলঙ্কিণী, ঝি, শুকতারা, মন্দের ভালো, নন্-কো-অপারেটার, পথি নারী বিবর্জ্জিতা ও ভক্তের ভগবান, এই আটটী ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি সবই সুন্দর; যেমন আখ্যান-ভাগ, তেমনই বর্ণনা-কৌশল; আর সরস কৌতুক—তাহাতে ত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। গল্প কয়টী বেশ ঝরঝরে। পূজার বাজারে এই বিবি বউ বিকাইবে, এ আশা আমাদের আছে।

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট যে মহাত্মার প্রতিকৃতি-শোভিত হইল, তিনি স্বনামখ্যাত দানবীর সার তারকনাথ পালিত মহাশয়। সার তারকনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধানতম বারিষ্টার ছিলেন। স্বর্গীয় বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের ন্যায় ইনিও অনেক বিপন্ন ব্যক্তির মামলা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। বারিষ্টারী ব্যবসায়ে ইনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের যে কি ভাবে সদ্ব্যয় করিতে হয়, সার তারকনাথ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি এ দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তাঁহার দীর্ঘ জীবনের উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পনর লক্ষ টাকা ও পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষের প্রদত্ত অর্থে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সারকুলার রোডে যে বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপনা

করিয়াছেন, তাহাই দানবীর সার তারকনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইঁহার এই দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯১৩ অব্দের ১লা জানুয়ারী ইঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। আমরা এই দানবীরের প্রতিকৃতি 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

এবার সাময়িকীর প্রথম কথা হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ। কি কুক্ষণেই যে এ বিরোধ এমন তীব্র হইয়া উঠিল, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছিনা। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান সুদীর্ঘকাল সম্প্রীতে পরস্পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি ও সাহায্য করিয়া বসবাস করিতেছিল; হঠাৎ কি এমন হইল, যাহার জন্য এই প্রীতির শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া গেল, মিত্রতার স্থানে ঘোর শত্রুতা দেখা দিল। কারণ যাহাই হউক, এই অসদ্ভাব যে উভয় পক্ষেরই অহিতকর, তাহা কি কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না? হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমান এ দেশে বাস করিতে পারেন না, আবার মুসলমানকে বাদ দিয়াও হিন্দুর চলে না। এ অবস্থায় এমন ভাব কতদিন চলিবে, বা চলিতে পারে? আমরা কোন পক্ষের দোষক্রটীর বিচার করিব না; যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অতীতের অপ্রীতিকর স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, হিন্দু-মুসলমানের যিনি পরম দেবতা তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া সকলে আবার একত্র-বদ্ধ হউন, এই আমাদের প্রার্থনা। ঢাকায় কি হইয়াছে, পাবনায় কি হইয়াছে, খিদিরপুরে কি হইল, সে সকল আলোচনার প্রয়োজন নাই—তাহাতে মিলন হয় না।

এবার দেশের বড়ই দুর্দ্দিন! কলিকাতা সহরে ত ঘরে-ঘরে বেরি-বেরি; চিকিৎসকেরা বলিতেছেন এ রোগের কারণ এখনও অবিসম্বাদিত ভাবে নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং ঔষধও তেমন স্থির হইতেছে না। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, যত দোষ পুরাতন চাউলের। পুরাতন চাউল খাইয়াই এই রোগ হইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৈলের ক্রটী ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, চাউল ও তৈল বদ্‌লাইয়াও ত এ রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতেছে না। প্রথমে এই রোগ তেমন সাংঘাতিক হয় নাই; দু'দশদিন ভুগিয়াই লোকে ঝাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন মধ্যে মধ্যে উক্ত রোগে মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

তাহার পর বন্যা! সেদিনের জলপ্লাবনে মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমা ব্যতীত আর সমস্ত স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে! লোকের কষ্ট বর্ণনাতীত। বাড়ী ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, গরু বাছুর কোথায় চলিয়া গিয়াছে; চারিদিকে শুধু জল; লোকের আশ্রয়-স্থান মিলিতেছে না, দিনান্নের ব্যবস্থা হইতেছে না। সারা জেলারই এই অবস্থা। অসংখ্য নরনারীর হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। আমাদের দেশের আর্ত্তসেবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারা সকলেই মেদিনীপুরের এই বিপদ সময়ে অগ্রসর হইয়াছেন, নানা স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দেশ-সেবকগণ অক্লান্ত ভাবে আর্ত্তের সেবা করিতেছেন; কিন্তু, এ দুর্দ্দশা ত এক আধখানি গ্রামের লোকের নহে, বলিতে গেলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার লোকে বিপন্ন। ইহাদের উপযুক্ত সাহায্য করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সর্ব্বত্র চাঁদা তোলা হইতেছে। আমরা আশা করি দেশবাসীগণ মুক্ত হস্তে এই পীড়িত নরনারীদিগের সেবার জন্য দান করিবেন। মহামায়া অন্নপূর্ণা আসিতেছেন বড় দুর্দ্দিনে; এ সময় যেন তাঁহার নিরন্ন সন্তানগণের সেবা করিয়া তাঁহার পূজা সম্পন্ন করা হয়।

এবার আশ্বিন মাসের শেষেই দুর্গোৎসব হইবে। সেই জন্য আমরা কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বেই প্রকাশিত করিব। যাহাতে পূজার অবকাশের পূর্ব্বেই গ্রাহকগণ কার্ত্তিকের সংখ্যা কাগজ পান, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।

বোধন-বেদন

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শরতের শ্বেত-শিশুগুলি
গগনের আলিসায় বসি
নাড়ে যবে কনক-কেতন
ব্যথা মোর বুকে উঠে খসি।

সুধাস্নে তোরা মিছে আর
সে করুণ কাহিনী আমার,
পূজা এলে ভয়ে মরি পাছে
ফেলি কা'রে হারায়ে আবার।

শেফালীর দীপালী-উষায়
বোধনের বাজিলে সানাই,
আঁখিজল বাধা নাহি মানে
বুকে মোর বড় ব্যথা পাই ;

মনে পড়ে বাজায়ে বাজনা
সবাই আসিল ঘট ভরি'—
আমি একা এসেছিনু ফিরি
ভরা-ঘট মোর খালি করি।

কলা-বৌ ফিরে এল নেয়ে,
রাঙা-পাড় আঁচল উড়ায়ে ;
আমি এনু শাদা থান পরি'
শ্মশানের বিভূতি কুড়ায়ে।

গৃহতলে পড়িনু লুটায়ে
ব্যথানত কথাহীন মুখে,
প্রতিবাসী পতিহীনা কেহ
শিশু মোর তুলে দিলে বুকে।

তার পর একে একে ঘুরে
কত পূজা এল গেল ফিরে,
শিশু মোর বুঝে ব্যথা যত
আমি তত ভাসি আঁখি-নীরে।

কতদূর—গ্যাছে তার পিতা
কত খোঁজ করে মোর কাছে ;
লিখে দিতে করে অনুরোধ
আমাদের ভুলে কেন আছে ?

বাছা মোর মনে হয় আজ
কা'রো কাছে শুনি' দুখ-বাণী
আভাষে বুঝেছে এতদিনে
কত একা মোরা দুটী প্রাণী।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

দুর্গাচরণ রায় প্রণীত সচিত্র 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন', অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ—৩৲।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, পথের দাবী—৩৲।

শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, হাইফেন—২৲।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত নূতন উপন্যাস, হিমাদ্রি—২৲।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস, কাগজের ফুল—১৲।

শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী সঙ্কলিত, বঙ্গনারীর ব্রতকথা—৸০।

শ্রীমৎ কুমারানন্দ সরস্বতী প্রণীত জ্ঞান বল্লরী—২৲।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত শান্তির পথে ১।০।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, নারীরাজ্যে—॥০।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত ঢেউয়ের যাত্রী—১৲।

শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, সুখের স্বপন—১।০।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটী বৈজ্ঞানিক কারণ—২৲।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

ভগ্ন মন্দির

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.